সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক ও লেখিকা
অন্বেষণ	২৬২	শ্রীমতী কিরণবালা দেবী
অষ্টাধ্যায়ীরামায়ণ	১৩।৩৭ ৪১।৪৯।৫৩।৫৭	সম্পাদক
অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্মফল ত্যাগ	৭১	সম্পাদক
অপেক্ষা—শুভদৃষ্টি (পদ্য)	১০০	শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী
অপরোক্ষানুভূতি	১০৬	সম্পাদক
অহল্যা	১১৭	
অর্থ চিন্তা ও ভাবস্মরণ	১৩৭	
অশান্তি	২৫১	,,
আগমনী	১৬১	শ্রীস
আমারে ক'রোনা উদাসী	২০৭	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
আস্তিক ও নাস্তিক	২২০	সম্পাদক
উঠিবার ও বসিবার মুখে অভ্যাস	২৫২	
উৎসবের উন্নতি কল্পনা	২২৮	
উপাসনা-তত্ত্ব	২১৭	,,
উষা (পদ্য)	২১৬	শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী
ঋগ্বেদসংহিতা	৩৭।৪১।৭৫	শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ সহঃ সম্পাদক
এস দীনদয়াময়	৭৫	শ্রীমতী রাজবালা দাসী
কবে প্রস্তুত হইবে	৩	সম্পাদক
কোন সম্পদে জন্ম	৫	
কপালে যা আছে	২১	
কত রকম	১২৭	
কতদূর হইল পরীক্ষা	১৪৩	,,
কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম		ব্রাহ্মানন্দ স্বামী
গাধি ব্রাহ্মণ	৬১	সম্পাদক
গীতা পরিচয়	১০৯	
গায়ত্রী	১৭৫	
চিত্রকূট	৪৬	

	চিতারোহণকালে-শেষ দর্শনে	২২৯	শ্রীমতীভবতারিণী দেবী
ত।	তুমি আমি	৯৮	সম্পাদক
	তুমি ও সে	১২৫	,,
জ।	জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী	২৮০	৺ প্রবোধচন্দ্র মজুমদার
দ।	দয়া (পদ্য)	৩৩	শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী
	দাস ভাব	১০৪	সম্পাদক
	দেখিবার ব্যাকুলতা	১৮৩	,,
ধ।	ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা	৭৪	,,
	ধ্যান—স্থূলে ও সূক্ষ্মে	৮৮	,,
	ধর্ম্মভাবের শিথিলতা ও শাস্ত্রপ্রয়োজন	১১৯	,,
ন।	নূতন বৎসরে (১) নূতন করিয়া	১১	,,
	,, ,, (২) জাগ্রত হওয়া	১৩	,,
	নিত্য অভ্যাস ও শুভকথা	১৮৬	,,
	নাম নামী অভেদ	২০৫	শ্রীনিতাই চাঁদশীল
	পথভ্রান্ত	২৬২	শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী
প।	প্রভাতে ভাব	২৩	জনৈক দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক।
	প্রহ্লাদকৃত স্তব	১,৩৩	শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র।
	প্রার্থনা	৩৬,২৭২	ঐ ও সম্পাদক।
	পথহারা শ্বাসে লক্ষ্য	৯০	শ্রীপ্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় বি এ,
	পূজা	১৩৫	শ্রীমতী রাজবালা দাসী
	পূর্ব্বস্মৃতি	২৭৫	শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী
	পাওয়া	২১১	সম্পাদক
	প্রবোধের স্মৃতি	১৩২,২৫৮,২৮০	,,
	,, স্বর্গারোহণ	২৪১	শ্রীমতী সরোজিনী দেবী
	প্রীতিভিক্ষা	২৭১	শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী
ব।	বিজ্ঞান ও শ্রুতি	২৬	শ্রীশশধর রায় এম এ, বি এল,
	ব্রজলীলাগান	১১৪	সম্পাদক
	বিবিধ	১৬২,১২০৮,২০৯	শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ সহঃ সম্পাদক
	বিশ্বনর্ত্তকী	১৬৫	সম্পাদক
	বৃহদারণ্যকের অশ্বলব্রাহ্মণ	১৮২,২৩৫,২৬৩	শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ
	বৎসর সূচী		শ্রীতোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
ভ।	ভয় অভয়	৮৪।৮৭	সম্পাদক

ভুলিয়া যাওয়া ভাল না নিত্যস্মরণ ভাল	২২৪	,,
ম। মনের সহিত যুদ্ধ জয়লাভের উপায়	৩৯	,,
মনুষ্য জন্মে পরম লাভ	১৮৯	,,
মজুমদার বংশের তালিকা	২৮৬	শ্রীহারাণচন্দ্র মজুমদার
মাতৃভাবে তত্ত্ব করা	২৭৬	সম্পাদক
য। যোগবাশিষ্ঠ	৭৩।৭৭।৮৫।৮৯।৯৩	,,
যোগকা বারমাসা	১৯৮	ঋষিজী বা শ্রীগৌরেন্দ্র ব্রহ্মর্ষি
শ। শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদকৃত স্তোত্র	১।৩৪	শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র
শরণাপন্ন হওয়া কাহার নাম ?	১৬	সম্পাদক
শ্লোক ও শব্দ নির্ঘণ্ট	৬৫,৭৩,৮১,	শ্রী আঃ
শ্রীচরণ (পদ্য)	৪৫	শ্রীমতী রাজবালা দাসী
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে (পদ্য)	৭২	শ্রীমতী রাজবালা দাসী
শ্রীগুরু	১০৩,১৬০	শ্রীমতী রাজবালা দাসী
শ্রীমতির প্রণয়	১১৫	শ্রীক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ বি এল্
শুভ কথা	১৫৩,১৮৫,২৪৭	সম্পাদক
শেষ খেলা	২৮৮	শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী
শ্যামা	১৬৯	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীমদ্ভবতগীতা	৬২২।৬২৯।৬৩৭	সম্পাদক
শ্রীভাগবত	১।৯	,,
স। সান্ত্বনা	৪	,,
স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ	২১	শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র
সৃষ্টিরহস্য	২৮।৫৯	সম্পাদক
সংসার মায়া গাধি ব্রাহ্মণ	৬১	,,
সংসার চক্র নিবৃত্তি বা মোহ নিবৃত্তি	৮০	,,
স্বর্গদ্বারে গীত (পদ্য)	৮৫	,,
সমুদ্র	৮৮	শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র
সুখের অন্তরায়	১৫৯	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সন্ধ্যা	১৬৯	শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র
সমালোচনা	১৮০।২৪২	সম্পাদক
সর্ব্বস্ব সাধনা	১৯৫	,,
সত্যং পরং ধীমহি	২০৯	,,
সাধ	২৭৯	শ্রীমতী কিরণবালা দেবী
হ। হিন্দুশাস্ত্রে তন্ত্রমত	২১৪	শ্রীমতী—
কাশীধাম	৭৮	সম্পাদক
পুরীতে তুমি এস ইহার অভ্যাস	১০১	,,

কন্‌খল রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম।

একাদশবর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী।

কন্‌খল রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, যাঁহারা উক্ত সেবাশ্রমের নিঃস্বার্থ পরসেবা ব্রতের বিবরণ এখনও শুনেন নাই, অথবা যাঁহাদের নানা কারণে উহার বিস্তারিত কার্য্যবিবরণ পড়িবার সুযোগ বা সাবকাশ নাই, তাঁহাদের গোচরার্থ অদ্য আমরা সংবাদ-পত্রের সাহায্যে উহার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট "দরিদ্র নারায়ণ" সেবার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বারংবার শ্রবণ করিয়া তাঁহার কয়েকজন শিষ্য হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কন্‌খলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একটী ভাড়াটে বাটীতে এই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে ও সর্ব্ব সাধারণের সহযোগিতায় আমরা উহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছি। বিগত দশবর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে। সাধুসন্ন্যাসী দরিদ্র তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় অধিবাসীগণকে রোগের সময় সহানুভূতি ও যত্নের সহিত ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্ত করিবার চেষ্টাই ইহার কার্য্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন অর্থাৎ আশ্রম স্থাপনার সময় হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬৯৭৪ জনের চিকিৎসা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৪৫ জনকে আশ্রমের হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছিল, প্রথম দেড় বর্ষে রোগীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০৫৪ হইয়াছিল, আলোচ্য একাদশবর্ষে উক্ত সংখ্যা ৯১২০ হইয়াছে অর্থাৎ প্রায় ৯ গুণ বাড়িয়াছে. ইহার মধ্যে কঠিন ও সংক্রামক রোগীর সংখ্যাও বড় কম নহে। যথা প্লেগ ১৯৭, ক্ষয় ১৮৩, কলেরা ২২০ ইত্যাদি, সাধারণের নিকট এপর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৯২২/১৫ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৩০৩৭৩/১০ খরচ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে হস্তে উদ্বৃত্ত ছিল ৫৮৪৮৫।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১৫০০ টাকায় ৫ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া কুটীর করিয়া কার্য্য চলিতে থাকে, পরে সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে ক্রমশঃ উহার মধ্যে বাটী নির্ম্মিত হইতে থাকে, বিভিন্ন বাটী নির্ম্মাণার্থ কি ২ খরচ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

উৎসব।

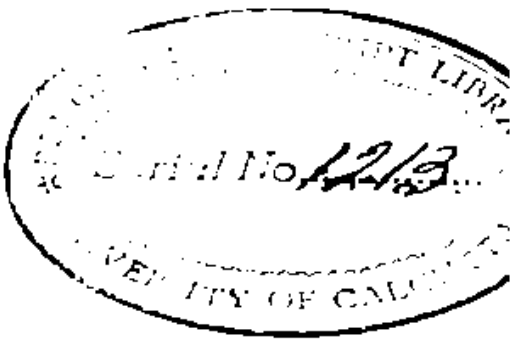

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

শ্রীনরসিংহায় নমঃ।

শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদ-কৃত স্তোত্র।

(শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক অনূদিত)

প্রশান্ত মননশীল দীপ্ত জ্ঞানালোকে
পরাস্ত দেবতা ঋষি স্তুতিপরায়ণ।
পারি কি তুষিতে আমি অসুর জনম ?
অ-শব্দগোচর তুমি প্রভু নারায়ণ ১

ধন, অভিজন, রূপ, তপ, বিদ্যা, তেজ,
প্রভাব, পৌরুষ, বল, বুদ্ধি, চতুরতা ;
পূজিতে পুরুষবরে নাহি প্রয়োজন
এ সকল ; ভকতির শুধু সার্থকতা ॥২

পদ্মনাভ পদরজে একান্ত বিমুখ
বহু-গুণান্বিত বিপ্র হইলেও হায় !
মনপ্রাণ সঁপিয়াছে চণ্ডাল অধম
শ্রেষ্ঠ হয়ে পুণ্যবলে সবংশে তরায় ॥৩

করুণাপ্রবণ তাই লহ পূজা তুমি :
হে পূর্ণ! পূজক তরে পূজা-আয়োজন।
প্রতিবিম্বে শোভে যথা তিলকরচনা
সুরঞ্জিত কর যদি স্বকীয় আনন ॥৪

যাঁর গুণগানে ছিন্ন অবিদ্যাবন্ধন,
তাঁহারি মহিমাগানে কি ভয় আমার!
অবিরাম ভক্তিফুলে পূজিব গো দেব!
সংসার-জলধি সুখে তরিব দুর্ব্বার ॥৫

সংহর সংহর কোপ রূপ ভয়ানক,
উদ্বেজিত হেরি সব ভক্তের অন্তর।
ভক্তিভাবে ভজে এরা ; নাহি বৈরিভাব,
নিজসুখ তরে লীলা, লোক ক্ষেমঙ্কর ॥৬

ভয় নিবারিতে স্মরে শিবরূপ তব,
সংহরি বিকট রূপ দাওহে অভয়।
অসুর হয়েছে হত বিক্রমে তোমার,
উপদ্রবনাশে হৃষ্ট সাধুর হৃদয় ॥৭

করালাস্য, জিহ্বা, নেত্র দীপ্ত-দিবাকর,
আস্রস্রজ, রুধিরাক্ত পিঙ্গল কেশর।
হুঙ্কারে স্তম্ভিত দিক্, সিংহরবে কার ;
হে অজিত! নাহি ডরি হেরিয়া নখর ॥৮

স্বকর্ম্মরজ্জুতে বদ্ধ, গ্রাসিছে সংসার
হিংস্রজন্তু ; ত্রস্ত বহি গুরু দুঃখভার।
হে দীনবৎসল! কবে দিবে হে শরণ
অভিমূলে ; ডাকি লবে নিকটে তোমার ॥৯

ক্রমশঃ—

কবে প্রস্তুত হইবে ?

আর কবে প্রস্তুত হ'বে দিন ত ফুরায়। অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ঃ। যাহা শ্রেয় ভাবিয়াছ তাহা অদ্যই কর।

আর কিছুদিন সময় দাও—এখনও যে প্রস্তুত হইতে পারি নাই।

প্রস্তুত হইবার জন্য কি করিতেছ? এই কি তোমার প্রস্তুত হওয়া? সকল কাজে বেশ উদ্যম থাকে, কেবল উদ্যম থাকে না আদত কাজে। আজ শরীরটার যুত নাই, আজ মনটা ঠিক নাই, আজ বাড়ীতে গোলযোগ—দিনের পর দিন কাটে, ইহার অন্ত কি হইল? ইহার অন্ত কি হইবে? এভাবে চলিলে আর তোমার হইবে না।

শরীর মন বাড়ী যেমন থাক্ তবুও প্রস্তুত হওয়া যায়। করিলেই করা যায়। সময় নাই, সুবিধা নাই—এ মূঢ়ের কথা। যতটুকু সময় পাও, যতটুকু সুবিধা করিতে পার—তাহা লইয়াই আরম্ভ কর। ইহাই মূলধন হউক। আরম্ভ করিলেই শক্তি বাড়িবে। শক্তি বাড়িলেই সদ্গুণ জাগিবে। ক্রমে সব পারিবে।

কিছু জাগাইয়া কিছু অভ্যাস কর। আর হাহা হুহু ছাড়। বেশ বসিতে পারিবে।

শুধু বসা এই না? তিন বেলা। কিছু ছাড়। কিছু ধর।

শ্মশানের ভাব জাগাও—তবে হাহা হুহু ছাড়িবে। এই জাগান ভাব কি?

শ্রীভগবানের আহ্বান না শুনিলে তাঁহার কাছে কি যাওয়া যায়? শ্রীভগবানের আহ্বান শুনিলেই, মানুষ সব ছাড়িয়া ব্রজগোপিকাদের মত তাঁহার কাছে যাইতে পারে। কথা সত্য? ব্রজগোপিকার ভাগ্য যদি তোমার না থাকে? সুখের আহ্বান যদি তুমি না পাও? দুঃখের আহ্বানও তাঁর আহ্বান।

এই ত সে দিন ছেলে গেল? মেয়ে গেল? স্ত্রী গেল? পিতা গিয়াছেন, মাতা গিয়াছেন, স্বামী গিয়াছে, ভাই গিয়াছে, বন্ধু গিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখ—কিছু যায় নাই এমন কি কেহ আছে? লোকের যায়, তোমার এখনও আছে—যেতেও পারে! এ ভাবিয়াও ত প্রস্তুত হইতে হয়।

এক পরামর্শ শ্রবণ কর। হাহা হহ হিহি ছাড়িবার কৌশল, মনকে ভগবানের দিকে ফিরাইবার কৌশল—এই শ্মশান ভাবনা।

শ্মশানে চিতা জ্বলিতে কে না দেখিয়াছে? মণিকর্ণিকা, হরিশ্চন্দ্র; নিমতলা, শ্মশানেশ্বর অথবা পল্লীগ্রামের শ্মশান কে না দেখিয়াছে? বাহিরের শ্মশানে গেলে কিছুই হয় না। ভিতরের শ্মশানে একবার প্রবেশ কর। যাহার যাহা গিয়াছে, তাহার চিতাই একবার করিয়া হৃদয়ে জ্বাল। সেই মৃত্যুকালের কাতর ভাব, সেই নিঃশব্দে চক্ষের জল, সেই শয্যাকণ্টকী, তাহার পরে ঊর্দ্ধ-চক্ষু, তাহার পর চিতায় দেহ সমর্পণ।

বসিয়াই প্রথমে হৃদয়ে চিতা চিন্তা কর। বৈরাগ্য আসিবেই।

মন! কিছুতেই ত হাহা হহ হিহি তোমায় যায় না। তোমাকে শ্রীরাম প্রসাদ ভূলোমামা বলিতেন। হৃদিশ্মশানে প্রিয়জনের চিতাধূমই তোমার অসম্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়াইতে পারে; তোমার হাহা হহ হিহি ছাড়াইতে পারে। প্রত্যহ বৈরাগ্য আনিয়া তোমাকে অভ্যাসের বস্তু দিতে হয়; তবে কাজ হয়।

মনকে বিরাগী কর। করিয়া অভ্যাস কর। তার পরে মুমুক্ষুর অবস্থা ভাব। পুরুষার্থ এই ভাবে জাগিবে। যদি দেখ দিবাতে ইহা হয় না—রাত্রিতে ইহা অভ্যাস কর; অনেক সময় পাইবে। অল্পে অল্পে অভ্যাস করিতে হয়। একবারে বেশী করিতে গেলে বিপর্য্যয়।

বৈরাগ্য, মুমুক্ষু ইত্যাদি চিন্তা করিয়া উৎপত্তি, স্থিতি, উপশমের পর নির্ব্বাণ হইতেই হইবে।

সান্ত্বনা।

প্রেমময়!

দে'ছ শোক তার সাথে দে'ছ এ'সান্ত্বনা;
শোক নহে হৃদি ভরে মত্ত হাহাকার!
শোকশান্ত! স্মৃতিপূজা! হৃদয়নিলয়ে
প্রেমময়ে উপাসনা ভক্তি উপহার।

সেথা নাই কাম-গন্ধ প্রতিদানে আশা,
আত্মদানে জাগে প্রেম, ভক্তি ভালবাসা ;
পূজাগৃহে ধূপসম ধীর আয়োজন—
নীরবে দেবতাপদে নিঃশেষ অর্পণ।

সংসারের কোলাহল সেথা নাহি পশে,
দৃশ্যপট যায় মুছি নয়নের আগে ;
তোমারি পূজার ফুল বিকশে মানসে,
চিত্ত সেথা রহে স্থির প্রেমে অনুরাগে।

শোক শান্তি প্রদানিয়া আতুরে আশ্বাসি,—
হে অনন্ত ! সান্ত্বরূপে ধরা দাও আসি।

মৃ—

কোন্ সম্পদে জন্ম ?

জন্মের দোষ দিবার উপায় নাই। জন্ম যেরূপ ভাবেই হউক না কেন, উন্নতির উপায় শাস্ত্র সর্ব্বত্রই দেখাইয়াছেন। কাঁটা গাছ হইতে আম্র ফলান যায় না। ইহা বৃক্ষের সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এ নিয়ম আদৌ খাটে না। গাছের ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয় না। এজন্য বৃক্ষ আপনি আপনার উন্নতি করিতে পারে না। মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে। এই ইচ্ছা-শক্তিকে সাধুপথে চালাইলে, মানুষ যতই অধম অবস্থায় আসুক না কেন, অবশ্যই উন্নতিলাভ করিতে পারে। ঋষিগণের সিদ্ধান্ত ইহা। শ্রীগীতা বলেন অতি দুরাচার মনুষ্যও সাধু হইতে পারে। শাস্ত্রে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। রত্নাকর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দস্যু হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি আবার জগদ্বিখ্যাত বাল্মীকি হইয়াছেন। অহল্যা সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিয়াও শেষে আবার এমন কার্য্য করিলেন, যাহাতে তিনি আজও প্রাতঃস্মরণীয়া। প্রহ্লাদ, বলি, বিরোচন ইঁহারা দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। সেদিনের কথা জগাই মাধাই নিতান্ত দুর্জ্জন হইয়াও, আজ বহু পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

আমরা বলিতে চাই মানুষের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। মানুষ, সকল অবস্থা হইতেই উন্নতিলাভ করিতে পারে।

হতাশ হইও না। শোক করিও না। যথাসাধ্য শাস্ত্রপথ অবলম্বন কর। তোমার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। লোকে তোমাকে ভাল বলুক বা মন্দ বলুক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিও না। শ্রীভগবান্ মানুষের হৃদয় দেখেন। তিনি তোমার সহায়। শাস্ত্রীয় উদ্যম কখন ত্যাগ করিও না। শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার সহায়।

আর তুমি? শাস্ত্রীয় উদ্যম করিতেছ ভাবিয়া বেশ থাক। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা ইত্যাদি কর—এই তোমার দম্ভ। কিন্তু বাহিরে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের ভান করিলেও, ভিতরে তোমার চরিত্রের দোষ তুমি বিলক্ষণ জান। লোকে তোমায় সাধু বলিলেও, তুমি বেশ জান তুমি কি।

কপটাচার করিও না। বেশ করিয়া আত্মপরীক্ষা কর। করিয়া নিজের মধ্যে অসুরের লক্ষণ যাহা দেখ, তাহা সংশোধন কর। করিয়া দেবতা হইয়া যাও। এই জীবনেই পারিবে। উদ্যম কর।

কিরূপে বুঝিবে তোমার মধ্যে দোষ কি? শ্রবণ কর। ভগবান্ দৈবী-সম্পদ্ কি এবং আসুরসম্পদ্ কি তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। তুমি বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখ—কোন্ সম্পদে তোমার জন্ম? যদি দেখ আসুর ভাব তোমার বিলক্ষণ আছে, আর যদি বুঝিয়া থাক অসুর থাকা নিতান্ত মন্দ তবে আত্মপরীক্ষা দ্বারা দোষগুলি ধরিয়া শাস্ত্রমত তাহার চিকিৎসা কর—ভাল হইয়া যাইবে।

দৈবীসম্পদে মানুষের যে সমস্ত গুণ থাকে, অগ্রে তাহারই উল্লেখ করা যাউক। পরে আসুরসম্পদের দোষ কি তাহা বলা যাইবে।

দৈবীসম্পদের গুণগুলি উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে স্থূলভাবে দৈবীসম্পদ্, আসুরীসম্পদ্ এবং রাক্ষসীসম্পদ্ কি শ্রীগীতা তাহা দেখাইতেছেন।

(১) শাস্ত্রজ্ঞানজনিত ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মজনিত যে ভাল হইবার বাসনা, তাহার নাম শুভবাসনা। ইহা সাত্ত্বিকী। ইহা নিবৃত্তিমার্গে তোমাকে লইয়া যায়। যে সমস্ত গুণ তোমাকে নিবৃত্তিমার্গে বা মোক্ষপথে লইয়া যায়, তাহাই দৈবীসম্পদ্।

(২) লৌকিকজ্ঞান ও লৌকিককর্ম্মজনিত যে বিষয়বাসনা,—যে বিষয়-

বাসনা তোমার আসক্তিকে প্রবল করে এবং তোমাকে নিরন্তর প্রবৃত্তিপথে ছুটাইতে থাকে, তাহাই আসুরীসম্পদ্।

(৩) রাক্ষসীসম্পদ্ যাহা, তাহা দ্বারা মানুষ প্রবলভাবে হিংসাদ্বেষের কার্য্য করে—করিয়া রাক্ষসভাবে বিহার করে।

দৈবীসম্পদজাত গুণ—

(১) অভয়—ঠিক শাস্ত্রমত চলা, আর কিছুতেই ভয় না রাখা। নিতান্ত অপরিচিত স্থানে কে খাইতে দিবে ?—আদৌ ভাবনা নাই ! অরণ্যে সর্ব্ব-প্রতিগ্রহশূন্য হইয়াও ভয় নাই। মৃত্যুকেও ভয় নাই। শত্রুমধ্যেও ভয় নাই। সে আমার আছে, ভয় করিব কাহাকে ? সে যে হৃদয়ে থাকিয়াও অন্য সর্ব্বত্রে ভয় কাহাকে হইবে ?

(২) সত্বসংশুদ্ধি—চিত্তে রাগ ও দ্বেষরূপ মলা না থাকা। পরবঞ্চনা নাই। হৃদয়ে এক, বাহিরে আর রূপ মায়া নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাকে অন্যরূপ করিয়া বলা রূপ অনৃত নাই। এই অবস্থায় চিত্তে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয়।

(৩) জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা। সাংখ্যই জ্ঞান। অষ্টাঙ্গ-যোগই যোগ। শাস্ত্র ও আচার্য্যমুখে আত্মা কি, অনাত্মা কি জানিয়া অনাত্মা হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া জানাই জ্ঞান। শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থায়ী করিবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহাররূপ বহিরঙ্গ সাধন করিয়া, ধারণা-ধ্যান সমাধিরূপ অন্তরঙ্গসাধনের অনুষ্ঠানই যোগ।

(৪) দান—ন্যায়ার্জ্জিত অন্নাদি যথাযোগ্য সৎপাত্রে বিতরণ।

(৫) দম—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার সর্ব্বদা।

(৬) যজ্ঞ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), ভূতযজ্ঞ (প্রাণি-দিগকে অন্নদান), মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথি-সেবা), দেবযজ্ঞ (দেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রাদি, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, মনে মনে শাস্ত্রীয় যুক্তির আলোচনাকে "ঋষিযজ্ঞ বলে"। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১২।

(৭) স্বাধ্যায়—বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠ করিয়া গূঢ় অর্থ ধারণা করা।

(৮) তপ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা।

(৯) আর্জ্জব—সরল হওয়া, কপট না হওয়া। যতটুকু জ্ঞান হইয়াছে, শ্রদ্ধাবান্‌কে তাহা গোপন না করা।

(১০) অহিংসা—কোন প্রাণীর জীবিকার উচ্ছেদ না করা। কোন প্রাণীকে কোনরূপ পীড়া না দেওয়া।

(১১) সত্য—যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে এরূপ বাক্য, অপ্রিয় ও মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া, যেটি যেরূপ সেইরূপ বলা।

(১২) অক্রোধ—অপরে তিরস্কার বা প্রহার করিলে যে ক্রোধ হয়, তাহার নিরোধ।

(১৩) ত্যাগ—সর্ব্ব কর্ম্মফল ঈশ্বরের অর্পণ। তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা।

(১৪) শান্তি মনের নিবৃত্তি; সঙ্কল্পশূন্য হওয়া।

(১৫) অপৈশুন—পরোক্ষে পরের দোষ না প্রকাশ করা।

(১৬) ভূতে দয়া—সর্ব্বভূতকে আপনার ভাবা। দুঃখী-জীবে করুণা।

(১৭) অলোলুপতা—ভোগের বস্তু সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়-বিকার না হওয়া।

(১৮) মৃদুতা—কোমল বাক্য সকলকে প্রয়োগ করা।

(১৯) লজ্জা—অকর্ম্ম করণে লোকলজ্জা।

(২০) অচাপলা—বিনা প্রয়োজনে বাক্-পাণিপাদ ব্যবহার না করা।

(২১) তেজ—স্ত্রী, বালক, দুর্জ্জনের খাতিরে অভিভূত না হওয়া।

(২২) ক্ষমা—সামর্থ্য সত্ত্বেও পরকৃত অপমান সহ্য করা। তাড়না করিলেও শান্ত থাকা।

(২৩) ধৃতি—দেহ ও ইন্দ্রিয় আসন্ন হইলেও স্থির রাখিবার শক্তি। সুখ ও দুঃখে মন চঞ্চল হইতে না দেওয়া।

(২৪) শৌচ—অন্তর ও বাহ্যকে প্রাণায়াম ও মৃজ্জলাদি দ্বারা শুদ্ধি।

(২৫) অদ্রোহ—অন্যকে হিংসা করিবার জন্য অস্ত্রাদি গ্রহণ না করা।

(২৬) অভিমানিতা—কাহারও কাছে মান্য না চাওয়া।

আসুরী সম্পদ্ কি?

(১) দম্ভ—আমি ভারী ধার্ম্মিক—ইহা লোককে জানাইবার জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহাই ধর্ম্মধ্বজিত্ব।

(২) দর্প—বিদ্যা, ধন, জনের গর্ব্ব। সেই গর্ব্বহেতু মহদাদির অবমাননার প্রবৃত্তি।

(৫) অতিমান—সকলে আমার সম্মান করুক, আমি সকলের পূজ্য—আপনাতে এই শ্রেষ্ঠত্বের আরোপ।

(৬) ক্রোধ—পরের অপকার জন্য অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষ বৃত্তি।

(৭) পারুষ্য—রুক্ষভাষা কহা। কাণাকে পদ্মলোচন বলা, কুরূপকে রূপবান্ বলা। হীনকুলকে উত্তম কুল বলা।

(৮) অজ্ঞানতা—কর্ত্তব্যবুদ্ধি-হীন হওয়া। আপনার করণীয় কিছুই নাই। সময় হইলে হইবে এই বুদ্ধি।

যাহারা অসুর-স্বভাবে জন্মিয়াছে, তাহারা কোন্ কোন্ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত তাহাও জানে না; কোন্ কোন্ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত তাহাও জানে না। এরূপ লোক বাহিরের বা ভিতরের শুচির কোন ধার ধারে না। ইহাদের আবার সদাচার কিরূপে থাকিবে? আর প্রিয়-হিত-যথার্থ ভাষণই বা কিরূপে হইবে?

আসুরী-যোনিতে যাহাদের জন্ম তাহারা এই জগৎ সম্বন্ধে কি বলে?

অসুরস্বভাব জনগণ এই জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর বলে। কামই এই জগতের কারণ ইহাও বলে।

জগতের মূলে যে কোন সত্য বস্তু আছে তাহা ইহারা মানে না। বেদ পুরাণাদি প্রমাণশূন্য এই জগৎ। ইহারা বলে ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচর ইহারাই শাস্ত্রকর্ত্তা।

এই জগতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করে—ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আবার কি? এই জগতের আবার সৃষ্টিকর্ত্তা কে থাকিবে? অণু পরমাণুতে যে আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ দুই শক্তি আছে, তাহা হইতেই এই জগৎ উঠিয়াছে। যাহাকে লোকে আত্মা বলে—তাহাও অণুপুঞ্জের একত্র-অবস্থান হেতু জন্মে। ইহাতে কর্ম্মফলবিধাতা কেহ নাই। এই জগতের কোন কর্ত্তাও নাই, কেহ ব্যবস্থাপকও নাই। তবে ইহাতে এই সমস্ত বিচিত্র সৃষ্টি কিরূপে হইল? ইহা অপরাপর সম্ভূত। বিষয়ভোগাভিলাষী স্ত্রীপুরুষ সংযোগ হইতেই জগৎ হইয়াছে ইহারা ইহা বলে। কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই।

দুঃখের বিষয় হেকেল-প্রমুখ অনেক আধুনিক বিজ্ঞানবিদের এই মত।

এখন সুধীগণ বিচার করুন, এই মত ঠিক—না গীতা ঠিক ? আমরা অধিক আর বলিব না। এইমাত্র বলি, জগৎ যাহাই হউক—এই জগতে প্রচুর দুঃখ আছে। আসুরী সম্পদে জগতের দুঃখ আরও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু দৈবীসম্পদ ধরিয়া ঐ গুণগুলি উপার্জ্জন করিতে পারিলে জগতের দুঃখ দূর হইবে। আসুরী সম্পদের ফল অতি ভীষণ। ইহা জানিয়া মানুষ আপনাদের দেবপ্রকৃতি বৃদ্ধি করিতে যত্ন করুক, তবেই জগতের কল্যাণ হইবে।

প্রবন্ধ শেষে আর একটি বলিয়া উপসংহার করিতেছি। অসুর সম্পদে জন্ম যাঁহাদের, তাঁহারা ত বেদপুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ধূর্ত্ত, ভণ্ড, নিশাচর কৃত বলিয়া থাকেন। কিন্তু আর এক সম্প্রদায়ের লোক উঠিয়াছেন, তাঁহারা বেদ বা উপনিষদের কতক কতক মানেন, কিন্তু পুরাণাদি মানেন না। এইরূপ লোক যে জন্মিবে তাহা পুরাণকর্ত্তা জানিতেন। তাই আমরা বায়ু পুরাণে ১ম অধ্যায়ে পাই :—

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ। ১৯৯
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥ ২০০

যিনি সাঙ্গোপনিষদ্ চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ জানেন না তিনি বিচক্ষণ নহেন। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা পুরাণ না জানিয়া (না মানার ত কথাই নাই) উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন—শ্রুতি সেই অল্পজ্ঞানীর বা মূর্খের নিকটে এই বলিয়া ভীত হয়েন যে, "মাময়ং প্রহরিষ্যতি" এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। যাঁহারা বেদ বা উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে যান, তাঁহাদের কি এই পুরাণবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে ?

নূতন বৎসরে—(১) নূতন করিয়া।

যেমন করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিলে, তেমন করিয়া চলিতে পারিলে না। জীবনে কত বোষ হইয়া গেল, এখনও হইতেছে; কারণ, এখনও ঠিক ঠিক চলিতে পারিতেছ না। এখন চেষ্টা কর, এখনও নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। হতাশ হইয়া কি লাভ?

রে চিত্ত! হতাশ ছাড়। আশা রাখ। পথ বলিয়া দিতেছি। আগে কর্ম্মটি ঠিক করিয়া লও। যে সে লোকের উপদেশ মত কর্ম্ম করিলে চলিবে না। কত ত দেখিয়াছ, কত শুনিয়াছ, কত পড়িয়াছ। তোমার মত হইয়াও কি কেহ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন? রত্নাকর ব্রাহ্মণ-দস্যু, তিনিই জগৎপূজ্য বাল্মীকি। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়-রাজা কিন্তু যথেচ্ছাচারী, তিনিই জগদ্বিখ্যাত সাধুব্রাহ্মণ; অহল্যা কুপথগামিনী ভ্রষ্টা, তিনিও প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা। জগাই মাধাই মাতাল-দস্যু, তাঁহারাও ভক্তশ্রেষ্ঠ। নিতান্ত কুপথে গিয়াও ফিরা যায়, আবার নূতন করিয়া বাঁচা যায়। তুমি পারিবে না কেন? পারিবে।

এস এস আবার পুরাতন কার্য্য নূতন করিয়া করি এস। হইবেই। যদি অল্প সময়ও থাকে, তবু কর; উন্নতি বুঝিতে পারিবেই।

যে-সে লোকের কথা মত কার্য্য করিলে চলিবে না। তুমি যে কার্য্য করিবে, সে কার্য্য সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা পুণ্যশ্লোক আর কেহ করিয়া গিয়াছেন কি না দেখ। ঋষিগণ সেই কার্য্য করিতে বলেন কি না দেখ। আজকালকার ঋষিনামধারী হইলে চলিবে না। কারণ আজকালকার ঋষি, আজ যাহা বলেন কাল তাহা সংশোধন করেন। আজকালকার একজন ঋষি যাহা বলেন, আজ-কালকার অন্য ঋষি তাহা খণ্ডন করেন। এ সব ঋষিদের কথা মত কর্ম্ম করিতে গেলে, বৃথা-পরিশ্রম সার হইবে। এজন্য গুরুবাক্য ও সৎশাস্ত্রবাক্য যখন মিলিয়া যায়, তখনই তোমার ঠিক হয়। নতুবা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য গরমিল হইলে, গুরুও থাকিবেন না, শাস্ত্রও অধিগত হইবেন না। এই জন্য শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্মটি বুঝিয়া লও। যেমন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা গায়ত্রী—অন্য সকলের প্রাণায়াম-জপ-ধ্যান। এই কর্ম্মগুলি শাস্ত্রীয়কর্ম্ম। ইহা ধরিলে ঠকিবার সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মটি লইয়া পরে একটি দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে। কর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহাদের গোল নাই, তাঁহারাও যে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারেন না, তাহার মূল কারণ তাঁহারা প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন না।

আগে প্রাণকে জাগাও। দেখ দেখি এই চিন্তায় প্রাণ জাগে কি না? কর্ম্ম করিতে উৎসাহ পাও কি না?

দেহ ত ছাড়িতেই হইবে—সকলেই ত মরে। কিন্তু কুকুর শৃগালের মত মরিব না। মরি ত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়াই মরিব। "জপই জপই শ্যামনাম ছার তনু করব বিনাশ"।

ব্রাহ্মণ হও—সন্ধ্যার কর্ম্মগুলি জানিয়া লও। প্রাণায়ামটি জানিয়া লও। জানিয়া প্রতিদিন তিন বেলায়, প্রতিবেলায় ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস করিয়া সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণ হও। সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাং। ভাল ব্রাহ্মণ হইতেও ইচ্ছা অথচ কার্য্য করিব না কিছুই। উত্তম ব্রাহ্মণ সহস্র জপ করিবেন, মধ্যম করিবেন শত, আর অধমের জন্য দশ। যাঁহারা এ পাঠ রাখেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন; শত উপাধি থাকিলেও নহেন। "সময়ে কুলায় না" যদি এই বলা হয়, তাহার উত্তর শূদ্রত্ব আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলেরই কি সময়ে কুলায় না? তাহা নহে। বেশ ত কাশীতে গিয়াছ! অন্য কার্য্য ত নাই। ব্রাহ্মণ বলাইতে চাও, তবে প্রতিদিন তিন বেলায় সহস্রবার করিয়া তিনসহস্র কর না। করিয়া দেখ না তুমি কেমন দাঁড়াও। প্রাণায়ামের সাহায্যে, কুম্ভকের সাহায্যে, হাজার করিয়া কর অথবা শুধু জপই কর।

যে চিত্ত! মরিবেই ত। যতদিন না জ্ঞানলাভ হয় ততদিন কর্ম্ম ছাড়িও না। মরণ হয় হউক; কর্ম্ম করিতে করিতে মরিব এই সঙ্কল্প দৃঢ় কর। আলস্য অনিচ্ছায় দিন কাটাইয়া মরিবে কেন? শাস্ত্র মানিয়া শাস্ত্র মত তিন বেলা কর্ম্ম করিব। ইহাতে মৃত্যু হয় হউক। একটা বলিবার থাকিবে, ঋষিগণের কথামত চলিতে প্রাণপণ করিয়াছি। ইহাতে সন্তোষ থাকিবে—ইহাতে নিশ্চয়ই সদ্গতি হইবে। ফলে যদি ঋষিদিগের কথামত সহস্র জপ সহ ত্রিসন্ধ্যা কর, তবে সাধারণ লোকের মত মরিবেই না। ইহাতে পশুর মত মৃত্যু হইতেই পারে না। যদি পূর্ব্বকৃত সুকৃতি থাকে, যদি কর্ম্মের সহিত স্বাধ্যায় থাকে, তবে এই জন্মেই জ্ঞানও হইয়া যাইতে পারে। আর যদি দুষ্কৃতি থাকে তবে

ঐরূপ কর্ম্মের চেষ্টাতেও, তুমি তোমার অবস্থা উন্নত করিয়া শান্তমনে দেহ ছাড়িতে পারিবে।

মৃত্যু পণ করিয়া কর্ম্ম কর; যতই পতিত হইয়া যাও না কেন, শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিতে পারিলেই বুঝিবে উন্নত অবস্থা আসিতেছে। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে পারাই পাপক্ষয়ের চিহ্ন। এইরূপ কর্ম্ম ও সাধনায় লইয়া জীবন কাটানকেই বলিতেছিলাম নূতন করিয়া।

এই কর্ম্মের বিঘ্ন যাহাতে হয় তাহাই মৃত্যু ভাবিয়া, উহা দূরে বর্জ্জন কর। "আয়েস" করিতে যিনি বলেন, তিনিই মৃত্যুর দূত ইহা জান। যত প্রকার সাধনা জানিয়াছ, ইহাদের মধ্যে প্রধান কর্ম্ম যেটি—যেটি করিতে তোমার স্বভাবতঃ কিছু ভাল লাগে, তাহাকে মুখ্য করিয়া অন্যগুলিকে গৌণভাবে অবলম্বন কর। করিয়া সকল কর্ম্মে এক কর্ম্মই কর। সব সাধিয়া একই সাধ। দেখনা সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা, এত স্তব জল, সূর্য্য, অগ্নি সব আছে; সব সাধনার এককেই ডাকা হয়। মরিবই ত —এই কর্ম্ম করিয়া মরিব এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া চল; দেখদেখি কে তোমায় সহায় হয়?

আর এক কথা। যদি অর্থ বুঝিতে নাও পার, তবে "তুমি প্রসন্ন হও" এই কথার দৃঢ়স্মরণে লৌকিক-বৈদিক যাহা করিবে তাহা করিয়া চল। জপকালে চক্ষুকে সূর্য্যমণ্ডলে ও কণ্ঠকে মনে জপ-উচ্চারণের শব্দে একাগ্র কর, হইবেই হইবে। আর কি বলা যাইবে—যদি ইহা না রুচি হয়, তবে যা করিতেছ করিয়া যেখানে যাইতেছ সেইখানেই যাইবে, আর কি হইবে? তাই বলি জ্ঞান যতদিন না হইতেছে, ততদিন কর্ম্ম কর; শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর আয়ু ধারণ কর। শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"॥

নূতন বৎসরে (২) জাগ্রত হওয়া।

এতদিন ত গেল—তুমি যাহারই কেন উপাসনা কর—কয়দিন তোমার উপাস্য দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিলে—ঠাকুর তুমি আছ তাহা বিশ্বাস করি; কিন্তু চিরদিনই কি বিশ্বাস লইয়াই থাকিব? তোমার

প্রত্যক্ষ করিতে চাই। স্থূলনেত্রে তোমায় যা দেখা যায়, তাহা দেখিতে চাই; আবার তৃতীয় নেত্রে যাহা দেখা যায় তাহাও দেখিতে চাই।

কয় দিন বলিতে পারিলে তুমি কি সত্য সত্যই আছ? বিশ্বাসে ত আছ বলি - না বলিলে চলেনা তাই বলি। যাহাদের চলে, তাহারা বলে না। আমার ত চলে না। বিশ্বাসে বলিলেও সত্য সত্য তুমি আছ, ঠিক ঠিক তুমি যেমন—শাস্ত্র যেমন বলিয়াছেন, ঋষিগণ যেমন বলিয়াছেন—তেমন করিয়া কৈ তোমায় দেখিলাম? কৈ তোমায় অনুভব করিলাম?

তোমায় দেখিলে পাপ ছুটিয়া যায়, অসম্বদ্ধ প্রলাপ দূর হয়, জড়তা তিরোভূত হয় শুনি। তোমায় দেখিলে মন আর অন্য কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না; তোমায় দেখিলে মানুষ আর অসত্যের সেবা করিতে পারে না; তোমায় দেখিলে স্বার্থের বন্ধন হয় না; তোমায় দেখিলে মোহ আর থাকে না। তোমায় যেখানেই দেখি না কেন—ভিতরেই দেখি বা বাহিরেই দেখি—তোমায় দেখিলে—সর্ব্বত্র তুমি—তোমায় প্রণাম করিতে ভুল হয় না। কিন্তু এ সব হইল কৈ? মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ইহার কোনটি সাধনা হইল? কোনটি প্রবাহক্রমে চলিল? কোনটি ল'য়া অনুক্ষণ থাকা গেল?

"মাং নমস্কুরু" তুমি বলিয়াছ সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই সহজ। যাহার সঙ্গে মতে মিলিল না, যে আমার অতি প্রিয় বস্তুকেও মিথ্যা প্রমাণ করিতে চায়, যাহার উপর চিত্তের অপ্রসন্ন ভাব হওয়া প্রায় দেখা যায়—কিন্তু তুমি ত তাহার মধ্যে আছ—তবে সেইটি স্মরণ করিয়া কৈ "মাং নমস্কুরু" সাধনা হইল? কৈ তাহাকেও তুমি ভাবিয়া, মনে মনে প্রণাম করিয়া, অতি শান্তভাবে কথা কহিতে পারিলাম? যদি সর্ব্বদা 'মাং নমস্কুরু" মনে না রহিল, তবে আর উহার সাধনা কি হইল? যদি সর্ব্ববস্তু মধ্যে মায়িক ইন্দ্রজাল বাদ দিয়া তোমায় দেখিতে না পারিলাম, তবে সাধনায় অগ্রসর হইলাম কৈ?

নিত্যক্রিয়া-কালে যখন মন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, যখন ইহাকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না, তখন সময়ে সময়ে তুমি স্মরণ করাইয়া দাও মাং নমস্কুরু। সেই সময়ে প্রতি মন্ত্র উচ্চারণে,—অর্থ বুঝিতে পারি বা না পারি, উচ্চারণে কেবলই নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে; কেবল নমস্কার করিতে

করিতে চক্ষে জল আসে, মন অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়ে, প্রাণে আশা জাগে। মনে হয় মাং নমস্কুরু সাধনা আর ছাড়িব না। কি নির্জ্জনে, কি লোকসঙ্গে সর্ব্বগত তোমাকে মনে মনে নমস্কার করিব; সকলকে তুমি ভাবিয়া আগে নমস্কার করিয়া সর্ব্বদা হাঁসিয়ারে থাকিব; মন্ত্রকেও তুমি ভাবিয়া নমস্কার করিব—কতবার ত ইহা করিব ভাবিলাম, কিন্তু কার্য্যে হইল কৈ?

সকলকে তুমি ভাবিয়া কথা কহিব—কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল কৈ? তবে কি ইহা এই ভাবে হয় না? কোন্ ভাবে তবে হয়?

তোমাকে আগে দেখিলে, তোমাকে আগে বুঝিলে, বুঝি ইহা সহজে হয়। তোমাকে দেখার সাধনা তবে কি প্রথমে করিতে হইবে? সর্ব্বদা তোমার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে? তুমি সত্য সত্যই যদি আছ, তবে তুমি একবার এস ইহাই কি প্রথম করা চাই?

তবে কি নিত্য কর্ম্ম বাদ দিয়া প্রথমে উহাই করিতে হইবে? হায়! তাহা ত ঠিক নহে। তোমার জন্য উৎকণ্ঠাক্ষুটিত চিত্ত হওয়া—এটা বহুকাল ধরিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করার ফল। তবে যাঁহাদের প্রথম বয়সেই ইহা হয়, তাঁহারা মহাপুরুষ! মহাপুরুষের আচরণ দেখিয়া প্রাণে উৎকণ্ঠা নাই কিন্তু উৎকণ্ঠার কথা কহিলে তাহাতে ত কোন কাজ হয় না। একটা প্রাণশূন্য অভ্যাস চলে মাত্র। কিন্তু অভ্যাসের সময়েও অসম্বন্ধ প্রলাপ চলে, প্রবল লয় উঠে।

শ্রীগৌরাঙ্গ, ভাবে নৃত্য করিতেন—সবাই কি ইহা পারিতেছে? লোককে নাচিয়া ভাব আনিতে হয়। ভাবে নৃত্য ও নাচিয়া ভাব আনার যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য মহাপুরুষের সহিত সাধারণ মানুষের। তবে কি হইবে?

তোমার আজ্ঞা পালন প্রথমে। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত তোমার আজ্ঞা। রস পাই না পাই, তোমার আজ্ঞা বলিয়া ইহা করিতেই হইবে। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করা চাই না; শুধু করা চাই তোমার আজ্ঞা বলিয়া; যাহাকে ভালবাসি তাহার আজ্ঞা পালন করাই প্রকৃত ভালবাসার চিহ্ন। নিত্যক্রিয়ার পর কথা কওয়া অভ্যাস করা চাই, মনে মনে পূজা অভ্যাস করা চাই, মাং নমস্কুরু অভ্যাস করা চাই। কখন বা নিত্যক্রিয়া-কালে মাং নমস্কুরু অভ্যাস রাখিয়া, প্রণাম প্রদক্ষিণ অভ্যাস করিতে করিতে নিত্য ক্রিয়া করা চাই। তার পরে একান্তে কৈ তোমায় পাইলাম? কৈ তোমার প্রসন্নতা

অনুভব করিলাম? কৈ তোমার আজ্ঞামত সাধনা করিতে পারিলাম? আহা! তুমি প্রসন্ন হও! তুমি কৃপা কর! সাধনার প্রথম স্তরে এইগুলি। যাঁহারা উপরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা ধারণা, ধ্যান, সমাধি অভ্যাস করিবেন। সকলেই চেষ্টা করিবেন। না পারিলে বুঝিতে হইবে নীচের সাধনা পাকা হয় নাই। এই ভাবে সমকালে সাধনাগুলি অভ্যাস করিলে হইবে—করিয়া চল। শাস্ত্রই ইহা বলিতেছেন। জপাৎ শ্রান্তপুনর্ধ্যানং ধ্যানাৎ শ্রান্ত পুনর্জপেৎ জপ ধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানাঞ্চ বিচারয়েৎ তোমারই আজ্ঞা।

শরণাপন্ন হওয়া কাহার নাম?

হে ভগবন! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—আমার আর কেহ নাই। তুমি আমায় রক্ষা কর। এইরূপ প্রার্থনা বিপন্নব্যক্তির মুখ হইতে যেন আপনা হইতে বাহির হয়। তবেই দেখা যায়, যেখানে শরণাপত্তি—সেখানেই যেন আমার আর কেহ নাই আমায় রক্ষা, কর এই ভাব আছে।

শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে আমরা সকলেই চাই। কিন্তু প্রকৃত শরণ লওয়া কয়জনের হয়? কেনই বা হয় না?

বিপদে না পড়িলে শরণ লওয়া হয় না। বিপদ সর্ব্বদাই জীবের লাগিয়া আছে। পশু, পক্ষী, বালক ইত্যাদি জীব নিজের বিপদ বুঝে না। ইহারা যতক্ষণ আহত না হয় ততক্ষণ ক্লেশ বোধ করে না; অথবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের সম্মুখে ভয়ের বস্তু থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা ভয়ের ব্যথা অনুভব করে ও ভয় প্রকাশ করে। ইহারা ইহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে না বলিয়াই, শ্রীভগবানের শরণ লয় না। ইহারা অজ্ঞানে নিতান্ত আচ্ছন্ন বলিয়াই নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

যে সমস্ত নরনারী বালকের মত, যাহারা বালকের মত নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝে না, যাহারা বালকদিগের মত এত অধিক বস্তু প্রার্থনা করে যাহাতে বুঝা যায় তাহারা তাহাদের মন বুঝে না, এক কথায় যাহারা বালকের মত বিচারশূন্য অথবা বয়স্কবালকের মত শীঘ্র শীঘ্র একটা ধারণা করিয়া ফেলে, এইরূপ প্রকৃতির বৃদ্ধ বালক বা বৃদ্ধা বালিকা বিপদে পড়িয়া

ভগবানের নাম লইলেও ইহারা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে না। শরণাপন্ন হইতে হইলে যতটুকু স্থির মতির আবশ্যক, যতটুকু বিচার-বুদ্ধির আবশ্যক, যতটুকু বৈরাগ্য আবশ্যক, ততটুকু বিচারবুদ্ধি-প্রসূত বৈরাগ্য ইহাদের নাই। বিপদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া ডাকিতে ভুলিয়া যায়। বিপদে একবারে বুদ্ধিলোপ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ডাকে; আবার সামান্য আশার আলোকে হর্ষে আত্মহারা হইয়া ডাকা ছাড়িয়া দেয়। ইহাদের অব্যবস্থিত চিত্ত ক্ষণে আশা, ক্ষণে হতাশ অর্থাৎ অল্প সুখে অল্প দুঃখে ইহারা বেহুঁস হইয়া পড়ে। ইহারা অতি অল্প সময়ের জন্যও এক ভাবে থাকিতে পারে না; আশা ও হতাশের দোলায় নিরন্তর দোদুল্যমান হয় বলিয়া ঠিক শরণাপন্ন হইতে পারে না।

পশু, পক্ষী, বালক, বালকের মত যুবক বা বৃদ্ধ—ইহারা যে শরণাপত্তির বাহিরে আমরা তাহাই প্রথমে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে যাঁহারা যথার্থ শরণাপন্ন তাঁহাদের অবস্থা আলোচনা করিব। মৌখিক শরণাপন্ন না হইয়া যদ্দ্বারা মনেপ্রাণে শরণাপন্ন হওয়া যায়, তাহার আলোচনাই প্রয়োজন। বিপদ-নিবৃত্তির এমন সার্ব্বজনীন উপায় অথবা সার্ব্বভৌমিক উপায় আর কি দ্বিতীয় আছে?

"মামেকং শরণং ব্রজ"—সমস্ত গীতার উপদেশের পরে শ্রীভগবান্ এই "শরণাপত্তি"তে গীতার উপসংহার করিয়াছেন। সমস্ত উপদেশ দিয়া, শেষে বলিতেছেন আমার শরণাপন্ন হও?

যথার্থ শরণাপন্ন কে হইতে পারে?

যিনি এই মৃত্যু সংসারসাগরের তীরে একবারও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ইহার ভীষণ তরঙ্গাস্ফালন দেখিয়াছেন, যিনি ইহার পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ-আস্ফালনে কিরূপে তরঙ্গপতিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত হইতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, যিনি সেই মৃত্যুসংসারসাগর-তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলরাশি মধ্যে ভয়ানক সর্প, হাঙ্গর, কুম্ভীরাদি সদ্যপ্রাণহারী জীবজন্তুর ভীষণ অবয়ব একবারও নিরীক্ষণ করিয়াছেন তিনিই যথার্থভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন।

যিনি সংসারের সর্ব্বত্র মৃত্যুর নিষ্ঠুর ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছেন, যিনি সংসারের সর্ব্বজীবে মৃত্যুর প্রধান সহচর পাপের দুর্লক্ষ্য বিচরণ অনুভব করিতেছেন—

তিনি এখানে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া থাকিলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

হায়! এ সংসারে মৃত্যু ও পাপের মর্ম্মন্তুদ যাতনা কে না দেখিয়াছে? কে না নিত্য দেখিতেছে? তথাপি যাহারা পশুপক্ষীর মত স্বভাব বিশিষ্ট অথবা যাহারা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, পাপও অবশ্যই হইয়া যাইবে—তবে ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও যতটুকু পারা যায় ভোগ করিয়া লওয়া যাউক, যতটুকু পারা যায় পাপ হইতে সতর্ক হওয়া যাউক—এইরূপ জ্ঞানের আভাযুক্ত অজ্ঞানী যাহারা, তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া জীবের নিতান্ত আবশ্যক। জ্ঞানাভাযুক্ত অজ্ঞানীগণ যে ঈশ্বরকে ডাকে, সেও তাহাদের ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিগুলির কার্য্যগুলি তিনি নিষ্পন্ন করিয়া দিবেন এই বিশ্বাসে? তাহাদের শরীর সুস্থ রাখিবেন বা তাহাদের স্বকপোলকল্পিত ইচ্ছার প্রসার তিনি করিয়া দিবেন সেইজন্য। কিন্তু যিনি সংসারের যথার্থ রূপ দেখিয়াছেন তিনি শরণাপন্ন হইবেন জরামরণ হইতে মুক্তিলাভ জন্য, তিনি শরণাপন্ন হইবেন মৃত্যুর নিদারুণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ জন্য, তিনি শরণাপন্ন হইবেন পাপের দুর্লক্ষ্য আক্রমণে নিতান্ত ভীত হইয়া।

আমি পাপী ইহা চিন্তা না করিয়া, আমি পবিত্রাত্মা সর্ব্বদা চিন্তা কর; এই উপদেশ অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু শুধু পবিত্রাত্মা পবিত্রাত্মা বলিয়া চিন্তায় কি হইবে—যদি কার্য্যে নানা প্রকার পাপ হইতে থাকে?

অন্যের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তাহাতে দোষারোপরূপ অসূয়া যতদিন আছে অন্যকে স্বমতের প্রতিবাদ করিতে শুনিয়া যতক্ষণ অসহিষ্ণুতাবৃত্তির উদয়ে প্রতিবাদকারীর প্রতি অবিনীতবাক্য প্রয়োগ আছে, বিষয়-মৃগতৃষ্ণায় দিক্‌-বিদিক্‌ শূন্য হইয়া যতক্ষণ নিজ স্বার্থ জন্য অন্যের মনঃপীড়া দেওয়া আছে, স্বার্থান্ধ হইয়া যতক্ষণ মিথ্যা কথা নিতান্ত দোষের জানিয়াও স্বার্থরক্ষার জন্য মিথ্যার সমর্থন আছে, জীবে-দয়া শাস্ত্রবাক্য জানিয়াও যতক্ষণ নিজের শরীরের জন্য অন্যজীবের প্রাণহানিরূপ হিংসাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া আছে, যতদিন আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র তোমার আছে—বল ততদিন তুমি পবিত্রাত্মা, তুমি পবিত্রাত্মা; এই চিন্তা তোমাকে কার্য্যে পবিত্র করিল কোথায়? ভগবান্‌ শঙ্কর এই সমস্ত কর্ম্মদোষ প্রক্ষালন জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয় মৃগতৃষ্ণাম্। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ" ॥ আমরা পবিত্রাত্মা হইয়া কি এই সমস্ত দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি ?

ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের গুণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

(১) তিনি কাহারও গুণ-উল্লেখের সময় দোষ দেখাইয়া দিতেন না।

(২) পরুষবাক্য বলিলে প্রত্যুত্তর করিতেন না।

(৩) শত অপকার করিলেও অপকার স্মরণ করিতেন না।

(৪) মিথ্যা কথা কহিতেন না।

(৫) শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেন না।

(৬) শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করিতেন না।

(৭) পরের দোষ যেমন জানিতে পারিতেন, নিজের দোষও সেইরূপ জানিতেন।

আরও কত আছে, কয়টি উল্লেখ করা যাইবে ? এক কথায় বলি, যত-দিন রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য করা আছে, ততদিন বুঝিয়া রাখা উচিত—মৃত্যু ও পাপ সর্ব্ব অঙ্গে বিচরণ করিতেছে। শুধু চিন্তা করিলে কি হইবে আমি পবিত্রাত্মা—ইহা উপলব্ধি জন্য সাধনা করিতে হইবে, তবে আমরা পাপ-ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব। আজকালকার কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম করিও না, কর্ম্ম ত্যাগ কর—শুধু "মেডিটেশন" কর। আমরা ইহার আর কি প্রতিবাদ করিব ? জার্ম্মনীর প্রধান চিন্তাশীল গ্রন্থকার গেটে এই সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ। গেটে বলেন—

How can a man learn to know himself ? Never by meditating but by doing" ইত্যাদি। যদিও ইহা সত্য যে গেটে "Know thyself" ইহার অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন, তথাপি উপরোক্ত বাক্য সম্পূর্ণ সত্য।

আর এক কথা যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম্ম কর্ম্মাধিকারীর অবশ্য করণীয়—শ্রীভগবান্ ইহা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিত্যকর্ম্ম-ত্যাগীর সংখ্যা আজকাল কত বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীগীতা বলেন যাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ তামসত্যাগী, কেহ রাজসত্যাগী। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া সাপের মন্ত্র আওড়াইয়া কি ফল—ইহাতে কোন উপকার নাই। এইরূপে যাহারা মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারা তামস।

যাঁহারা স্নান সন্ধ্যাদি এবং অতিথি-সেবারূপ কর্ম্মে বিশেষ ক্লেশ ভাবিয়া নিত্য-কর্ম্মাদি করেন না, তাঁহারা রাজসত্যাগী; কিন্তু যাঁহারা আমি কর্ত্তা—এই অভিমান না রাখিয়া এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করেন অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করেন, কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন—তাঁহারাই সাত্ত্বিকত্যাগী। তাঁহারাই ত্যাগের ফল যে জ্ঞান বা অমরত্ব তাহাই লাভ করিতে পারেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ত্যাগী আজ কাল কয়জন? তাই বলি পাপভয়ে ভীত হও, মৃত্যুভয়ে ভীত হও;—হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও।

আজকাল আর এক সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, যাঁহারা অন্য শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলেন না—একমাত্র বেদই শাস্ত্র। আমরা জানি আমাদের সমস্ত শাস্ত্র বেদ-প্রমুখ। বেদে যাহা নাই, তাহা কোন শাস্ত্রই সমর্থন করেন না। বেদ এই সম্বন্ধে কি বলেন; তাহাই না হয় দেখা যাউক।

বেদ বলিতেছেন :—

দেবাবৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্নদেভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।

দেবাবৈ মৃত্যোর্ম্মারকাদ্বিভ্যতঃ কিং কৃতবন্ত ইত্যুচ্যতে ত্রয়ীং বিদ্যাং ত্রয়ী-বিহিতং কর্ম্ম প্রাবিশন্ প্রবিষ্টবন্তো বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ। তন্মৃত্যো-স্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিন্তু তে কর্ম্মণ্যবিনিযুক্তৈঃ ছন্দোভির্যজ্ঞৈর্জ্জপ হোমাদি কুর্ব্বন্ত আত্মানং কর্ম্মান্তরেষচ্ছাদয়ন্ ছাদিতবন্তঃ। যৎ যস্মাদেভির্যজ্ঞৈরাচ্ছাদয়ন্ত-স্তস্মাচ্ছন্দসাং মন্ত্রাণাং ছাদনাচ্ছন্দস্ত্বং প্রসিদ্ধ মেব।

ছান্দোগ্য প্রথমঃ প্রপাঠকঃ চতুর্থ খণ্ডঃ ॥২॥

ভাবার্থ এই :—দেবগণও মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ জন্য বেদবিদ্যা আশ্রয় করিয়া বৈদিককর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। অসুরের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ অনেক সময় বৈদিক যজ্ঞাদি করিতেন। যখন যজ্ঞাদি শেষ হইয়া যাইত, তখনও ছন্দোগান, মন্ত্রজপ, হোমাদি ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মে আচ্ছন্ন থাকিতেন বলিয়া তাঁহাদের মৃত্যু-ভয় থাকিত না। যেহেতু ঐ সকল মন্ত্র দেবগণকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিত, সেই জন্য ঐ সকল মন্ত্রের নাম ছন্দ। ছন্দ=যাহা আচ্ছাদন করিয়া রাখে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—ঈশা বাস্য-

মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগতে গতিশীল যাহা আছে, তাহাকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেল ইত্যাদি।

আর কি বলা যাইবে? ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিলেই, পাপ বা মৃত্যু আক্রমণ করিবেই। শ্রুতি স্মৃতি এক বাক্যে ইহা দেখাইতেছেন। শ্রীগীতাও সেই জন্য বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

ধর্ম্মটি প্রকৃতির। পুরুষের ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া আমার (পুরুষের আত্মার) শরণাপন্ন হও। [আমার দ্বারা তোমার প্রকৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া ফেল, তবেই] আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।

এই সমস্ত কারণে বলা হয়, ত্রিসন্ধ্যার নিত্যকর্ম্ম ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া (অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে) কর; অন্য সময়ে সর্ব্বদা জপ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকে। যদি পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মবশে অন্য কর্ম্ম করিতে হয়, তবে সেই কর্ম্মের অবসানে অথবা তাহার স্বল্প বিরামকালেও জপ যজ্ঞ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন কর। কত সময় বৃথা গল্পে, বৃথা পরনিন্দায়, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নষ্ট হয়; তাহা করিও না। সময়ের সংব্যবহার কর—ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারিবে। তখন মৃত্যু-ভয় থাকিবে না। ইতি।

কপালে যা আছে।

কপালে যা আছে তাহা ত হইবেই—আমি আর চেষ্টা কি করিব—এই মত ধারণা যাঁহাদের, তাঁহারা পুরুষকার-বর্জ্জিত দৈব অবলম্বন করেন।

কপালে যা আছে তাহা ত হইবেই—আমি করিয়া যাই—এই মত ধারণা যাঁহাদের তাঁহারা পুরুষকার সংযুক্ত দৈব অবলম্বন করেন।

শাস্ত্রে যেখানে দৈবকে প্রবল করা হইয়াছে সেখানে পুরুষকারকে তুচ্ছ করা হয় নাই। দৈবে যাহা পারে করুক, আমি পুরুষকার মত কার্য্য করিবই। দৈব ত বাধা দিবে—তা বলিয়া আমি অলস হইয়া থাকিব

P 29276

না। আমি পুরুষকার লইয়া কার্য্য করিব—দৈব বাধা দিলেই শেষে পুরুষকার দ্বারা দৈব নিহত হইবে—অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্র এই মীমাংসা করিয়াছেন। যে দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার নাম মহানিয়তি। সৃষ্টিকালে মহাশক্তির স্পন্দনে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথ্বীর যে সমস্ত কার্য্য, অথবা ব্রহ্মাদি দেবতার সৃষ্টিচেষ্টা ইহাকে লঙ্ঘন করিতে কেহ পারেন না। কিন্তু দৈবকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে—দৈব শতবাধা দিলেও, পুরুষকার ছাড়িয়া কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে না—এই কথা শাস্ত্র শিক্ষা দেন।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হউক। মানুষ শ্রীভগবান্‌কে নিজের চেষ্টায় পাইতে পারে না। এ উক্তি শাস্ত্রের। কিন্তু তজ্জন্য মানুষ ঈশ্বরকে পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করিবে না—এ কথাও শাস্ত্র বলেন না। শাস্ত্র বলেন, মানুষ যতদিন অহঙ্কার করিয়া বলে শ্রীভগবান্‌কে গলায় গামছা দিয়া টানিয়া আনিব—ততদিন সেই দম্ভময় পুরুষকে শ্রীভগবান্ ত্যাগ করেন। কিন্তু যে পুরুষ শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য প্রাণপণ করেন, অর্থাৎ বিশ্বাস করেন শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না—যিনি এই ভাবে সমস্ত পুরুষার্থ করিয়াও, কার্য্যসিদ্ধি জন্য শ্রীভগবানের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন—তিনি শাস্ত্রমত কার্য্য করেন। তিনিই শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন। অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকিতে শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। প্রাণপণ চেষ্টা ত করিতে হইবে, তাহার উপর বলিতে হইবে—ভগবান্ আমি প্রাণপণ করিবই, কিন্তু আমার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারাও তোমাকে পাওয়া যায় না। আমি প্রাণপণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার শত চেষ্টাও অতি তুচ্ছ। তুমি আপনি কৃপা না করিলে, আমার চেষ্টাতে কিছুই হইবে না। আমি তোমার শরণে আসিলাম; আমি প্রাণপণ করিতে করিতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; এখন তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই করিও।

দেহ যায় যাক্, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিবই। এই ভাবে তাঁহার আজ্ঞাপালন জন্য যিনি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম করিতে পারেন—তিনিই শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

অলস ব্যক্তি কখনও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। অলসের

ভগবানও নাই, পার্থিব ধনসম্পত্তিও থাকিতে পারে না। তাই বলা হইল—কপালে যাহা আছে তাহা হউক বা না হউক, তাহাতে দৃষ্টি না রাখিয়া শাস্ত্রমত নিত্যকর্ম্ম করিয়া চল, শুভ হইবেই।

যতদিন না জ্ঞান লাভ হয়, ততদিন প্রাণপণে নিত্যকর্ম্ম কর। নিত্যকর্ম্ম দ্বারা শত বর্ষ জীবনধারণে ইচ্ছা কর। এই শতবর্ষ মধ্যে চাইকি জ্ঞানলাভ করিতেও পার। যদি তাহাও না হয়, তবে তুমি জীবন-সংগ্রামে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলে। পরজন্মে সহজেই তোমার হইয়া যাইবে।

প্রভাতে-ভাব।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিদ্রায় অচৈতন্য ছিলাম। সহসা কে যেন জাগাইয়া দিল। জাগিয়া দেখিলাম প্রকৃতিও জাগিয়াছে। প্রকৃতির হৃদয়-বীণা হইতে কি এক মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তামসিক নিদ্রার অবসানে, প্রকৃতির এই গম্ভীর শান্ত ছবি, আমারও হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দিল। অন্তঃকরণের আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম। বাহিরে আনন্দ, ভিতরে আনন্দ—আনন্দের উদ্বেল-স্পন্দনে আমার চিত্ত ধীরে ধীরে ডুবিল। দেখিলাম মহানন্দসাগরে জীব ও প্রকৃতির মহান্ ও ক্ষুদ্রাদপি সত্তা জাগিতেছে, আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে। ফুল আনন্দেই ফোটে, আনন্দেই শুকাইয়া যায়; শিশির আনন্দেই জন্মে, আনন্দেই ঝরিয়া পড়ে। মানুষ আনন্দেই হাসে, আনন্দেই কাঁদে। এক মহানন্দ, এই অনন্ত কোটি বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও হন্তা। এই আনন্দসাগরে কত সূর্য্য, কত নক্ষত্র, কত চন্দ্র বিকশিত হইতেছে এবং লয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিকাশ বা অভিব্যক্তি আনন্দই, বিনাশ বা লয়ও আনন্দ। যিনি আপনার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে আনন্দ ও চৈতন্যময় সত্তাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি জগতের সর্ব্বত্রই আনন্দের প্রকাশ দেখিতে পান। তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে স্ফুরিত হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়। এই আনন্দ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে জগৎ ভুলাইয়া, আপনাকে ভুলা-

ইয়া, এক মহান্ সত্যে আনিয়া ফেলে। যেখানে আনন্দ নিজেই আপনাতে আপনি বর্ত্তমান। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হয়, জগতের জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং যিনি আমাদের উপজীব্য, প্রাণের প্রাণ—তাঁহাকেই দেখিতে পান। তিনি "পরিপূর্ণমানন্দম্"। যেখানে শুধু আনন্দই আছে, ভয় নাই, শোক নাই, মোহ নাই, যেখানে "সকৃৎ বিভাতি হ্যেষঃ ব্রহ্মলোকঃ" তিনি সেখানেই উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন "আনন্দরূপমমৃতং যৎবিভাতি"।

এই ভাবিতে ভাবিতে জীব-চৈতন্য হারাইয়া, আনন্দের সত্তায় যেন ডুবিয়া গেলাম। আনন্দ খুঁজিতে গিয়া নিজেই আনন্দসাগরে সত্তা হারাইয়া ফেলিলাম।

জাগতিক জ্ঞান হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, সীমাশূন্য নীলাকাশের এক প্রান্তে সূর্য্যদেব নিজের কিরণ বিকীরণ করিয়া, শান্ত জ্যোতিতে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাণের আবেগে, প্রিয়তম বিরহের উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া বলিলাম—

ওঁ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম্।
তত্ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

এই প্রার্থনায় সূর্য্যে সেই আনন্দের ছায়া দেখিতে পাইলাম। আবার আনন্দে ডুবিলাম; দেখিলাম ঊর্দ্ধে আনন্দ, অধে আনন্দ, সর্ব্বত্র আনন্দ, সৃষ্টির ক্রমিক বিকাশে আনন্দ, অণুতে পরমাণুতে আনন্দ, সৃষ্টিরবিকাশে আনন্দ। পৃথ্বী জলে লয় পাইলে আনন্দ। জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মহান্ আকাশে, মহাকাশ পরমাত্মার আনন্দেই লয় পাইতেছে। ধ্যানযোগে মহাতপা যিনি তিনি তাঁহার মনবুদ্ধি প্রকৃতিতে, প্রকৃতি আত্মায় লয় করিবার চেষ্টায় আছেন—সে চেষ্টাও ত আনন্দ প্রসূত।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার সত্তা আনন্দে লীন হইল; ভাবিতে ছিলাম—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেনজাতানি
জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ।

সীমা শূন্য আমি একা
সীমামাঝে আমার প্রকাশ।
অনন্ত অসীম আমি
সীমা সৃষ্টি আমার বিলাস।
আমি এক অদ্বিতীয়
দুই সৃষ্টি খেলিবার ছলে।
আমি এক চিরন্তন
সান্ত সৃষ্টি আমার কৌশলে।
আমি, মায়া দোঁহে মিলি
গড়ি ভাঙ্গি বিচিত্র সংসার।
আমি মায়া ক্রীড়া-ছলে
রচি ছবি বিশ্ব চরাচর।
বিশ্বরূপ আমি ধরি
প্রলয়ের ছলে অবসান।
ইন্দ্রজাল আমি রচি
ভুক্তি মুক্তি করিবারে দান।
আমি নানারূপ ধরি
ধরামাঝে অবতীর্ণ হই।
বিচিত্র কৌশলবলে
নানাভাবে বিরাজিত রই।
জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপে
সর্ব্বময় জ্ঞানময় আমি।
কর্ত্তা হেতু ক্রিয়া ভেদে
নিখিলের কর্ম্মাশ্রয় আমি।
আমা ভিন্ন নাহি আর
বিরাজিত অদ্বিতীয় আমি।

শ্রী আঃ

বিজ্ঞান ও শ্রুতি।

১৩১৮ সালের মাঘ মাসের "উৎসবে" শ্রীপঞ্চমী শীর্ষক প্রবন্ধে ২৩৯।২৪০ পৃষ্ঠায় সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির যে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে উহা বিরোধ নহে। "শক্তি পরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন। * * * শক্তির সাম্যাবস্থাই যদি ব্রহ্ম হয়েন, তবে ব্রহ্মের পরম শান্ত ত্রিপদে থাকার কোন আবশ্যক নাই।" এই রূপ যুক্তি মূলে বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির বিরোধ কল্পনা করা হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে শক্তি পরিচ্ছিন্ন নহে, শক্তির বিকাশ পরিচ্ছিন্ন। শক্তির অব্যক্ত এবং ব্যক্ত অবস্থা আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর শক্তি পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং তদধিগত শক্তিও অনির্দ্দিষ্ট। এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে, অনির্দ্দিষ্ট হইলেই অপরিচ্ছিন্ন হয় না। স্বীকার। তথাপি ব্রহ্ম বস্তুই একাংশে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছেন। সেই এক অংশ অনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন নহে। ব্রহ্মাণ্ডকে যদি ব্যক্ত ব্রহ্ম বলি, তবে ব্যক্তাব্যক্ত ব্রহ্মকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Potential ও Kinetic অর্থাৎ গুপ্ত ও প্রকট বলা যাইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধেও দেখা যায় যে তদধিগত শক্তির সমস্ত ভাগ প্রকটিত করা যায় না: অর্থাৎ কর্ম্মে পরিণত করা যায় না। শক্তি গুপ্তাবস্থা হইতে প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; এবং ঐ কর্ম্মকেই শক্তির প্রকটাবস্থা বলা যায়। গণিতজ্ঞ জানেন যে কর্ম্মোৎপাদনে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়, কর্ম্ম তাহার ঠিক অনুরূপ উৎপন্ন হয়; কিন্তু সে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে, নাও হইতে পারে, সুতরাং শক্তিকে অপরিচ্ছিন্ন বিবেচনা করিয়া তাহার একাংশ প্রকট হয়, অর্থাৎ Kinetic অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কর্ম্মে পরিণত হয়; অপরাংশ গুপ্ত অর্থাৎ Potential অবস্থাতেই থাকিয়া যায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই যেমন শ্রুতি সম্মত, তেমনই বিজ্ঞান

---

* যদিও একথা ইথার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে তথাপি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, ইথার শক্তি-বিশেষের বিকার মাত্র। সকল শক্তিই এক, ইহাও এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতির সহিত বিজ্ঞানের মিলন করিবার নিমিত্ত আমি এই শক্তির পশ্চাতেই ব্রহ্মবস্তু কল্পনা করি।

সম্মতও হইবে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক লজ্ (Lodge) বলেন—
I have now endeavoured to introduce you to the simplest conception of the material universe which has yet occurred to man—the conception, that is, of one universal substance • • • extending to the furthest limits of space of which we have any knowledge • • • some portions either at rest or in simple irrotational motion • • • other portions in rotational motion • • • and differentiated permanently from the rest of the medium by reason of this motion.

এস্থানে দেখা যাইতেছে যে শক্তির অংশ বিশেষ সাম্যাবস্থ "at rest" অপরাংশ চক্রাবর্ত্ত গতি বিশিষ্ট। লজ্ দেখাইয়াছেন these whirling portions constitute what we call matter, অর্থাৎ এই চক্রাবর্ত্তই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত; যে অংশ সাম্যাবস্থ তাহা অব্যক্ত।

সুতরাং শ্রুতির সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ কোথায়? বিজ্ঞান শক্তিকে অপরিচ্ছিন্ন বলিতে ইতস্ততঃ করে না; ব্যক্তাব্যক্ত ভেদে শক্তি পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, এই মাত্র প্রভেদ করে। শ্রুতিও তাহাই প্রমাণ করেন। সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির বিরোধ কাল্পনিক। শ্রুতি ত্রিপাদ অব্যক্ত বলেন; বিজ্ঞান যে অংশ at rest বা সাম্যাবস্থ তাহাকেই অব্যক্ত বলে, কিন্তু ঐ অব্যক্তের পাদ সংখ্যা নির্ণয় করিতে অক্ষম।

একথা অন্যদিক হইতেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। অনন্তকে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কদ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল অনন্তই হয়। সুতরাং যে একাংশ ব্যক্ত তাহাকেও অনন্তের অংশ বিধায় অপরিচ্ছিন্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে। উপরে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অনির্দ্দিষ্ট বলিয়াছি, এবং তর্ক স্থলে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াও স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এই ভাবে কথাটী বিবেচনা করিলে তদ্রূপ স্বীকার করিবার কারণ ছিল না। সুতরাং শক্তিকে ব্যক্তাবস্থাতেও অপরিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। শক্তির পরিচ্ছিন্নতার শ্রুতি প্রমাণ কৈ? অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তাহার শ্রুতি প্রমাণ কৈ?

প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ২৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক, বিচার দ্বারা ইহা উপলব্ধি করা যায়, তখনই নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায়।" শ্রুতির মত উল্লেখ

করিতে এ কথা গ্রহনীয় নহে, কারণ ইহা শ্রুতি বিরুদ্ধ। ইহা সাঙ্খ্য দর্শনের মত হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতির মত নহে। যদি জগৎ ও ব্রহ্ম এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায়, তবে (শ্রুতি বলেন) জগৎ ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করাই মুক্তির হেতু। কিন্তু ব্রহ্মকে না জানিলেও মুক্তি নাই। সুতরাং এই একত্ব উপলব্ধি করিলেই ব্রহ্মকে জানা যাইবে এ অংশে শ্রুতির সহিত দর্শনের সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই।

শ্রীশশধর রায়।
এম, এ বি এল;

সৃষ্টি-রহস্য।

আপনাকে আপনি যতখানি জানিতে পারিবে তাহাতে অন্যের মনের অবস্থাও ততখানি জানিতে পারিবে। ইহা অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানের আদর্শ আর মানুষের পক্ষে হইতে পারে না।

আপনাকে আপনি পূর্ণভাবে জান তোমার জানার আর কিছুই বাকী রহিল না।

সৃষ্টি-রহস্য যে জানিতে চাও তাহার মূলে আত্ম-রহস্য জানার লালসা রহিয়াছে। "আমি কে" জানিবার লালসা স্বাভাবিক। "আমি কে" জানিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা মানবজীবনের শুভপ্রাপ্তি আর নাই।

---

† বেদাদি গ্রন্থে শক্তিকে মায়া বলা হইয়াছে। পরিমাণ করেন বলিয়া ইহা মায়া। কাজেই বেদাদি গ্রন্থের শক্তি বা মায়া বিজ্ঞানের অ্যাটম, কোরস, ইলেকট্রন ইত্যাদি কিনা চিন্তাশীল সাধক তাহা বিচার করিবেন। তাহার পর সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্র যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহা বুদ্ধির কার্য্য। অ্যাটমকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়াও বিজ্ঞান কি তাহার মধ্য হইতে বুদ্ধির কোন অংশ বাহির করিয়াছেন? যদি অ্যাটমের মধ্যে বুদ্ধির কিছু না থাকে তবে সৃষ্টিতে বুদ্ধির বিকাশ হইতেছে কিরূপ? সমালোচক মহাশয় পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ইহা বেদে নাই বলিতে চান। আমরা এই উৎসব পত্রিকার জন্ম হইতে এই সপ্তম বর্ষারম্ভ পর্য্যন্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্ত্যাদি হইতে তাহাই দেখাইয়া আসিতেছি। কাজেই প্রতিবাদ আর কি করিব। শেষে বলি

বড় দার্শনিক, বড় জ্ঞানী বা বড় কবি কে? না যিনি সৃষ্টি-রহস্য যত পরিষ্কার বুঝিয়াছেন বা বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টি-রহস্য বুঝিবার যে সুখ বা অপরকে বুঝাইবার যে সুখ তদপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই। কারণ সমষ্টিভাবে সৃষ্টি-রহস্য বুঝিলে ব্যষ্টিভাবে আত্ম-রহস্যও বুঝিতে পারা যায়। আমার যথার্থতঃ সৃষ্টি হইয়াছে কি না আমার যথার্থতঃ ধ্বংস আছে কি না ইহা জানাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান। আমরা সৃষ্টি-রহস্যের শেষ মীমাংসা এই শুনি যে ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আমার জন্মও নাই আমার মৃত্যুও নাই। স্থূলচক্ষে সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না—হয় জ্ঞানচক্ষে বা জ্ঞাননেত্রে। যে দার্শনিক বা যে জ্ঞানী বা যে কবি যত জ্ঞাননেত্র বিকাশ করিতে পারেন তিনি তত বড়। বাহিরের দৃষ্টি অপেক্ষা ভিতরের দৃষ্টি আরও পরিষ্কার আরও উজ্জ্বল। ভিতরে যাহা দেখা যায় তাহা বাহিরে প্রকাশ করা যায় ভাষা দ্বারা।

বাহিরের বস্তু আমাদের সম্মুখেই দণ্ডায়মান থাকে কিন্তু ভিতরে যাহা ভাবনা করা যায় তাহা বাহিরে প্রকাশ করা যায় কেবল ভাষার দ্বারা।

কাজেই সৃষ্টি-রহস্য অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে হইলে জীবন্ত ভাষারও বিশেষ আবশ্যক।

ভগবান বশিষ্ঠ, ভগবান বাল্মীকি, ভগবান ব্যাস ইত্যাদি অপেক্ষা বড় দার্শনিক, বড় জ্ঞানী বা বড় কবি আমাদের দেশে নাই; অন্য দেশে আছে কি না তাহা বলার আবশ্যকতা আমরা বুঝি না।

ভগবান বশিষ্ঠের যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, ভগবান বাল্মীকির রামায়ণ, ভগবান ব্যাসদেবের অধ্যাত্মরামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত এবং অন্যান্য

আলোচক ও সমালোচক উভয়েই "বনং ব্রজেৎ"এর অবস্থায় আসিয়াছেন। শক্তি সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের এত মতভেদ আছে যে, ২।৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। ইহা আবার প্রাচীন ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের সহিত এক করা যে কত কঠিন সমালোচক মহাশয় তাহা অবগত আছেন। শুধু তর্কের দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থ নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা না করিয়া সেই বিষয় Realize করিতে প্রয়াস পাইলেই নিজেরও যথার্থ উন্নতি হয়, এবং নিজের আচরণ দেখিয়া অন্যেরও উন্নতি হয়। নতুবা শুধুই তর্কে ফল কি? বনংব্রজেতের দিনে এই মত এইরূপ তর্ক হইতে বিরত থাকাই সঙ্গত। তবে যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইতে পারে।—সম্পাদক।

পুরাণ ইহা অপেক্ষা বেদ বিশদ করিবার অন্য গ্রন্থ আছে কি না আমরা জানি না।

ইহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ বলি এইজন্য যে ইহারা প্রসঙ্গক্রমে বহুকথা বলিলেও ইহাদের প্রধান লক্ষ্য মানব জীবনকে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত করা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত আধুনিক মানব জাতির সাহিত্যের বহু পুস্তকের উদ্দেশ্য তুলনা করিলে আমরা আধুনিক সাহিত্যের অধিকাংশ বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক ঐন্দ্রিয়ীক বা কাল্পনিক সুখ যাহাদের উদ্দেশ্য সে সমস্ত গ্রন্থ কিছু কালের মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ কত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে ও যাইবে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

এসব সাহিত্যে সত্য কথা থাকিতে পারে। কিন্তু সে সত্যে মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। মনে কর—কোন কবি লিখিলেন মানুষ সময়ের হস্তে ও ভয়ের হস্তে ক্রীড়ার পুতুল। কাল ধীরে ধীরে মানুষকে আক্রমণ করে, কাল ধীরে ধীরে মানুষের সমস্ত চুরি করে। তথাপি আমরা বাঁচিয়া থাকি—বাঁচিতে ঘৃণা করি কিন্তু মৃত্যুকে তথাপি ভয় করি। আমাদের ঘৃণিত জীবনের সমস্ত সময়টা একটা প্রবল সংগ্রাম ভিন্ন কিছুই নহে ইত্যাদি। কথা খুব সত্য কিন্তু ইহাতে মানুষের বিশেষ উপকার নাই। ক্ষণিক সুখ বা ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তি যে সাহিত্য লক্ষ করে সে সাহিত্য জীবকে প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। আমরা নিজের কল্পনায় নিতান্ত বিব্রত। কিন্তু যে সাহিত্য কেবল কল্পনা মাত্র প্রসব করে—যে সব কল্পনা আমাদিগকে দুঃখ নিবৃত্তির কোন স্থায়ী উপায় বলিয়া দিতে পারে না সে সমস্ত কাল্পনিক উপন্যাসের গল্পে জীবের বিশেষ কোন উন্নতি আশা করা যায় না।

তবে এ এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে মূল লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তৎসম্পাদন জন্য অন্য অন্য উপায় মত কার্য্যও আবশ্যক। যেমন পুষ্করিণী খনন জল প্রাপ্তি জন্য। কিন্তু জল প্রাপ্ত হইতেছে না অথচ বহুলোক মাটি কাটিতেছে—ইহাতে লোকের যে আংশিক ক্ষণিক সুখপ্রাপ্তির জন্য কিছু দৈনিক উপার্জ্জন তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকা যায় তবে সে উপকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিছু না হওয়া অপেক্ষা কিছু হওয়া উচিত সত্য কিন্তু কিছু

হওয়া উচিত হইলেও সেই কিছু দ্বারা মূল বিষয় প্রাপ্তির সুবিধা হইতেছে কি না তাহাতে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা মূল বিষয় হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে যাহার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা তাহারই অনুসরণ করা যাউক।

আদি কবির রামায়ণ ধরা যাউক।

ভগবান বাল্মীকি বহুস্থানে বলিতেছেন যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুণ্যতম বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আদিকাণ্ড প্রথম সর্গ। আবার চতুর্থ সর্গের প্রথমে বলিতেছেন—চরিত্রব্রত প্রভু বাল্মীকি সেই দুইজনকে (কুশী ও লবকে) বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণার্থ রাম ও সীতার সমস্ত চরিত সম্বলিত রাবণবধ নামক এক কাব্য শিক্ষা করাইলেন।

"বেদতুল্য রামচরিত" "রাম সীতার চরিত্র বুঝিলে বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করা হয়" এই সমস্ত উক্তির অর্থ কি? বেদে মানবজীবনের শ্রেয়োলাভ জন্য সহস্র সহস্র উপায় আছে। বেদ পাঠে বেদ মত কর্ম্ম করিয়া মানুষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া সংসারসাগর হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পায় তাহার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সীতারামের চরিত্রপাঠে মানুষের বেদপাঠ কিরূপে হইবে?

রাম সীতা কাব্যের চরিত্র। তাঁহারা রাজা রাণী। সাধারণ মনুষ্য তাহাদের মতনই বা কিরূপে হইবেন? তাঁহাদের জীবনের কার্য্য আলোচনায় মানুষের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হইবে?

রাম আমার কে? সীতাই বা আমার কে? তাঁহারা ত্রেতাযুগে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা আমার কি উপকার করিবেন? তাঁহারা আমাকে ভবসংসার পার করিয়া দিবেন কিরূপে?

সাধারণ পাঠকের মনে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। ভগবান্ বাল্মীকির সময়ে মানুষের বিশ্বাস যত প্রবল ছিল ভগবান ব্যাসদেবের সময়ে কালমাহাত্ম্যে মানুষের বিশ্বাস ততদূর ছিল না। সেই জন্য ভগবান ব্যাস রামায়ণ অবলম্বনে অধ্যাত্ম রামায়ণ রচনা করেন। এই অধ্যাত্ম রামায়ণে আমরা রামসীতারহস্যে সৃষ্টিরহস্য কি দেখিতে পাই। কাজেই রামসীতা রহস্যে আমরা

আত্মরহস্যও জানিতে পারি। সেইজন্য বুঝিতে পারি সীতারাম রহস্য বুঝিলে আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হয়?

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন—রামই পরংব্রহ্ম। তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনি অব্যয়। তিনি সত্তামাত্র। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি আনন্দ, নিষ্কল, শান্ত, নির্ব্বিকার এবং নিরঞ্জন (অঞ্জন, কালীশূন্য)। রামই সর্ব্বব্যাপী আত্মা। তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি অকল্মষ পাপশূন্য।

আর সীতা? সীতাই মূল প্রকৃতি। সীতা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী।

সীতা বা প্রকৃতি রাম বা পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই। পুরুষের নিকটে থাকিলে তবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন। আবার প্রকৃতি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা অবুধজনে পুরুষে আরোপ করে মাত্র।

জগতে যত কিছু হইতেছে সমস্তই প্রকৃতি করিতেছেন। আর অজ্ঞজনে তাহাই নির্ব্বিকার অখিল-আত্মা পরমপুরুষে আরোপ করিতেছে। রাম কিন্তু কিছুই করেন না, কোথাও গমন করেন না, কোন শোক করেন না, কোন আকাঙ্ক্ষা করেন না, কোন কিছু ত্যাগও করেন না, কোন কিছু গ্রহণও করেন না। তিনি আনন্দমূর্ত্তি, তিনি অচল, তিনি পরিণামহীন। কেবল মায়া আশ্রয় করিয়া মায়া মানুষরূপে তিনি ভাসিতেছেন।

ইহাই সীতারাম তত্ত্ব।

ইহাতে কি বুঝিলাম?

বুঝিলাম রামই পরংব্রহ্ম। সীতা, সেই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মকে খণ্ডমত করিয়া রূপ দিতেছেন।

সীতা কে? মূর্ত্তিবিশিষ্ট রামই সীতা। সীতা কে? সীতারামেরই পরিচ্ছিন্ন মায়া-মানুষমূর্ত্তি। রামের মূর্ত্তিতেই সীতা ফুরাইয়া গিয়াছেন। রামমূর্ত্তি ভিন্ন সীতা আর এক লবও বেশী নহেন। আর রাম? রাম, সমস্ত সীতা—সীতার সমস্ত হইয়াও তিনি আরও কিছু। তিনি সীমাশূন্য। সীতা তাঁহার এক অংশে উদয় হইয়া তাঁহাকে রূপবান্ মত করেন।

রাম পরমাত্মা। সীতা বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই সীতার শেষ কিন্তু সীতাই বা বিশ্বরূপই রামের শেষ নহে। রামের এক দেশে সীতাকর্ত্তৃক রামের মূর্ত্তি মত প্রকাশ। এইরূপ রাধাকৃষ্ণ, এইরূপ শিবশক্তি।

ক্রমশঃ

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

দয়া।

দয়াময়! তব দয়া বুঝা বড় দায়,
যাহা লভিবারে মন সদা ব্যস্ত হয়;
বাহিরে দেখায় বটে পীযূষ সমান,
তথাপি অন্তর জ্বালা না হয় নির্ব্বাণ।
নিতে চাও শুদ্ধ করি করিতে আপন;
মুক্ত করি দিতে চাও সকল বাঁধন;
জানাতে গভীর প্রেম মঙ্গল মধুর,
অশ্রুরূপে এস তাই বেদনা-বিধুর।
তোমার অগাধ প্রেম বিপুল জলধি,
ডাকিছে অনন্ত প্রেমে নিত্য নিরবধি।
মুগ্ধ-অভিমানে ভুলি, আপন ক্ষুদ্রতা,
তোমার অসীম প্রেম সীমা দিবে কোথা।
ক্ষুদ্র বিশ্ব কি বুঝিবে উদ্দেশ্য মহান্,
তব প্রেমে হয়েছিল তাই সন্নিধান;

আপনারে ভেবেছিল অসহায় হীন,
বোঝেনি তোমার প্রেম চির-বোধহীন।
বিন্দু অশ্রু, তাও মোর যায়নিকো বৃথা,
অনন্ত নির্ভর যেচে গাঢ় সরসতা;
আজ তাই ধারা-পরে ধারা নেমে আসে,
কণ্ঠ মোর ভাষাহীন ভাবে ভরে আসে॥

মৃঃ—

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

প্রহ্লাদ-কৃত স্তব।

যে যোনিতে ফিরি প্রভু যদে অনিবার
প্রিয়-বিরহজ শোক, অপ্রিয়-সংযোগ;
দুঃখের ঔষধ দুঃখ জেনেছি নিশ্চয়,
ব'লে দাও হে ভূমন্! তব দাস্যযোগ॥১০
প্রিয়তম! সুহৃত্তম! পরম দেবতা!
তব লীলা-গাথা গাহে ব্রহ্মা গঙ্গাধর;
সেবিত-পরমহংস পদযুগ সেবি,
তরি যাব ত্রিগুণের দুর্গম কান্তার॥ ১১
শিশুর শরণ বিভো! নহে পিতা মাতা,
ঔষধ আর্ত্তের, মজ্জমানের তরণী;
উপেক্ষি তোমারে মূঢ় সেবে এই সব,
বিফল প্রয়াস, তারে ক্ষণস্থায়ী মানি॥ ১২
তুমি কর্ত্তা, তুমি কর্ম্ম, তুমি সম্প্রদান,
তুমি হে করণ দেব! সকলি তোমার;
তোমাতে সকল বিশ্ব, ভিন্ন সত্তা কোথা?
যে যা করে ভাল মন্দ প্রেরণা তোমার॥ ১৩

তোমারি আশ্রয়ে দেব! ক্ষুব্ধা মায়া দেবী,
সৃজিল দুর্জ্জয় মন কর্ম্ম ছন্দোময়;
অবিদ্যা আঁধার, ভুজে ষোড়শ বিকার,
এ হেন সংসার চক্রে কে উত্তীর্ণ হয়॥ ১৪
তুমিই ক'রেছ জয় চিৎশক্তি বলে
বুদ্ধি গুণ—প্রভু তুমি কার্য্য-কারণের;
ইক্ষুদণ্ড-সম চক্রে নিপীড়িত আমি,
হে কাল! রক্ষহ তুমি ত্রাতা বিপন্নের॥ ১৫
দেখিনু অতুল বিভো! আয়ুশ্রী বিভব,
যাহা তরে লোক সব হাহাকার করে;
পিতাকে করেছ জয় ভ্রূকুটী-বহ্নিতে,
দহিয়াছ তৃণ-সম তাঁহারে ফুৎকারে॥ ১৬
দেহিদের সুখতত্ত্ব বুঝিনু বিশেষ,
অনিত্য জীবন লক্ষ্মী বিভব সম্পদ;
চাহিনা চাহিনা নাথ! সিদ্ধির গরিমা,
নিজভৃত্য পার্শ্বে দাও শান্তিময় পদ॥ ১৭
কোথা সুখ প্রতি সুখ মৃগতৃষ্ণিকল্প,
কোথা এই কলেবর ব্যাধির ভাণ্ডার!
নির্ব্বাপিতে কামানল মধুবিন্দু দিয়া
ব্যস্ত সদা: মনে নাহি বৈরাগ্য সঞ্চার॥ ১৮
রজো গুণ বিগঠিত তামস ভূয়িষ্ঠ,
কোথা এ অমর দেহ, কোথা কৃপা তব!
ব্রহ্মা ত্রিপুরারি পদ্মা যে হস্ত না পায়
দিয়াছ মস্তকে মম হে ঈশ! মাধব!॥ ১৯
জগতের আত্মা তুমি পরম সুহৃদ্
ছোট বড় জ্ঞান নাহি হে প্রভো! তোমার।
যথা সেবা তথা মাতা; কল্পতরু তুমি!
ফল ফুল ছায়া দানে করে কি বিচার॥ ২০

ক্রমশঃ—

প্রার্থনা।

আমার যে কিছুই হইল না। আমার যে কোন সাধই এখনও মিটে নাই। দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আমার সকল বাসনাই বুঝি হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হইয়া গেল। হে দীনবন্ধো! হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার নিকট আমার অনেক প্রার্থনা আছে, চাহিবার বস্তু অনেক আছে। প্রাণান্তক অন্তকের ক্রূরতা-সদৃশী বাসনা-বিষধরী, আমার চিত্ত-বিলে সদাই গরলোদ্গার করিতেছে। তাহাতে আমার দেহ মন জর্জ্জরিত। আমি কি বলিতে পারি আমার কিছুই প্রার্থনা নাই! কামনার শত হিল্লোল আমার মনকে তরঙ্গায়িত করিতেছে। সে তরঙ্গের শেষ নাই, একটীর পর একটী করিয়া প্রলয়কালীন জলদমুকুট মস্তকে ধরিয়া, আমার হৃদয়-বেলায় নিদারুণ আঘাত করিতেছে। সে আঘাতে আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রাণ সহস্রধা চূর্ণবিচূর্ণিত। মজ্জমান জীব কি বলিতে পারে আমার তরণীতে প্রয়োজন নাই? অতএব হে কামদ! আমার অনেক কামনা আছে। একে একে বলি, তুমি শ্রবণ কর। তোমার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই। প্রার্থীর প্রতি ধনদুর্ম্মদান্ধ ধনীর ভয়াল ভ্রূকুটী ভঙ্গি, কিম্বা অশ্মসারবৎ হৃদয়শূন্য নীরব উপেক্ষা, কিম্বা বিদ্রূপের মর্ম্মন্তুদ অট্টহাসের ভয় তোমার নিকট নাই। আমার সকল কথাগুলি মন দিয়া শোন।

আমার নয়ন সর্ব্বদাই রূপ-দর্শনে লালায়িত। জন্মাবধি কত রূপই ত দেখিয়াছি, আরও কত দেখিতে হইবে। কোনও রূপেই ত নয়নের তৃপ্তি সাধিত হইল না। তবে কি এ রূপ-দর্শন লালসার আর সীমা নাই? হে সুন্দর! আমি শুনিয়াছি তোমার রূপ দেখিলে, রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। শুনিয়াছি তুমি সূর্য্যকোটী-প্রতীকাশ, চন্দ্রকোটী-সুশীতল, কন্দর্পকোটী-কমনীয়।

কেহ তোমাকে দেখিয়াছিল :—

সমং প্রশস্তং সুমুখং দীর্ঘচারু চতুর্ভুজম্।
সুচারু সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥
সমান কর্ণবিন্যস্ত স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎস শ্রীনিকেতনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালা বিভূষিতম্।

নূপুরৈর্বিলসৎ পাদং কৌস্তভ প্রভয়ান্বিতম্।
ভ্রাজৎ কিরীট-কটক কটিসূত্রাঙ্গদান্বিতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদ সুমুখেক্ষণম্॥

কেহ তোমাকে বলিয়াছেন :—

কালাব্‌ভ্রাভাং কটাক্ষৈ রিপিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুলেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং॥

কেহ বা তোমাকে দেখিয়াছেন :—

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপিকরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুক সহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণি নিভং॥

হে স্বরূপ! তোমার কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই বলিয়াই বুঝি তোমাকে অরূপ বলে; অথবা তোমার রূপ আছে বলিয়াই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রূপবান্। হে দয়াময়! শোনা কথায় আর আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। অতএব তোমার রূপটী আমাকে একবার দেখাও। আমার রূপ-দর্শন স্পৃহা নিঃশেষে মিটিয়া যাউক।

হে জগন্নাথ! তুমি সর্ব্বরসের আধার। শ্রুতি তোমাকে "রসো-বৈ-সঃ" বলিয়াছেন। প্রবরোদকা তোমার শৌচনিঃসৃত সরিদ্বরা রসময়ী সুরধুনী ত্রিজগৎ রসাল করিয়া তুলিয়াছেন। অজস্রস্রাবী তোমার রসধারার এক বিন্দু মাত্র বিষয়সুখে নিপতিত হইয়াছে বলিয়াই, ভ্রান্ত জীব উন্মত্ত হইয়া, রসের উৎসকে ভুলিয়া, ক্ষুরধার বিষয়-কুশপত্রিকা লেহন করিতে করিতে নাগকুলের ন্যায় ছিন্নজিহ্ব হইতেছে; অমৃত-ভাণ্ডে বঞ্চিত হইয়া আছে। আমার জিহ্বা কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না। আমি তোমাকে পূর্ণভাবে, আস্বাদন করিতে চাই। নহিলে আমার রসনা অবিতৃপ্তই রহিয়া গেল।

কত সুরভি গন্ধই ত আঘ্রাণ করিলাম। কুসুমবর্ণগত বন উপবনের অঙ্কে আশ্রয় লইলাম। প্রসূন-নির্গাস অঙ্গে মাখিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিলাম। কই, পরিণামে ত দেখিলাম—কোথায় সুখ, কোথায় বা সৌরভ আর কোথায় বা আমি। পুষ্প একটু আমোদ বিস্তার করিয়া ম্লান হইয়া গেল। স্বেদ-ক্লেদ-

প্রেমাপূরিত শরীরের পূতিগন্ধে স্নিগ্ধবাণ হইলাম। হে প্রভো! তুমিই পৃথিবীতলে গন্ধ বিস্তার করিয়াছ। তোমার পদসরোজের মকরন্দ-গন্ধে আকুল হইয়া ভক্তভৃঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে অভিসার করিতেছে। শ্রীমতী ব্রজবিলাসিনীরাও এ গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলিয়া ছিলেন :—

কাস্তাঙ্গ সঙ্গ কুচকুঙ্কুম বন্ধি তায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতিগন্ধঃ॥

আমাকে একবার সেই গন্ধ আঘ্রাণ করাও। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সফল হউক।

পুত্র-মুখকমল চুম্বনে যে সুখ সে বুঝি তোমারই; কান্তা-কণ্ঠালিঙ্গনে যে সুখ তাহাও বুঝি তোমা হইতে; মলয়জ মর্দ্দনে, স্নিগ্ধতোয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া যে সুখ, তাহাও বুঝি তোমার। নতুবা তাহারা এ সুখ পাইল কোথায়? তোমার স্পর্শ বড় শীতল। সেই জন্যই :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি-অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি-অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

হে স্পর্শ-মণি! আমি তোমাকে একবার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই। নহিলে আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সার্থকতা কোথায়?

শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শুনিবার জন্য কতই ব্যাকুল। মৃদঙ্গ মন্দিরা সংযোগে বারবিলাসিনীর মদিরা-মত্ত নির্লজ্জ বিলাস-গীতি শুনিয়াছি। ব্রীড়াবিহ্বলা পতিব্রতা কুলললনার অর্দ্ধস্ফুট প্রণয়-সম্ভাষণও শুনিয়াছি। কিন্তু মনও ভিজিল না। কোকিলের কলরব, মধুকরের গুঞ্জন, নৈশ বায়ুর মর্ম্মর গাথা, নির্ঝরিণীর কুলুধ্বনি সবই শুনিয়াছি - শুনিয়া একটু সুখও পাইয়াছি। কিন্তু তাহার পর—হে মধুর ভাষি!

কান্তাঙ্গ তে কলপদায়ত মূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্॥

তুমি আমায় একবার আহ্বান কর। তোমার প্রিয় সম্ভাষণ যেন আমি শুনিতে পাই। যেন বলিতে পারি :—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

নচেৎ কর্ণ-বিবর বৃথাই উত্তমাঙ্গকে বিকৃত করিয়া রচিল॥

হে দীননাথ! আমার আরও কত কথা বলিবার আছে। আমি কিন্তু আর বলিতে পারি না। তুমি মনের কথা বুঝিয়া লও ও আমার প্রাণ যাহা চায় তাহাই দাও। আমার প্রার্থনার কি শেষ আছে? শেষ হইবে তখন—যখন তোমাকে দেখিব, তোমাকে শুনিব, তোমাকে আস্বাদন করিব, তোমাকে আলিঙ্গন করিব, ও তোমাকে আঘ্রাণ করিব। নচেৎ জীবন উদ্দেশশূন্য, বিফল ও শুষ্ক মরুপ্রায়॥

মনের সহিত যুদ্ধ-জয়লাভের উপায়।

শ্রীভগবান এতই সুখময়, এতই মধুময়, এতই মনপ্রাণ-জুড়ান বস্তু যে, তুমি স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও, যা যাই হও তাঁহার কথা একবার শ্রবণ কর, তাঁহার রাজ্যের শান্তির কথা একবার ধারণা কর, সে আনন্দ-রাজ্যের আনন্দ একবার ভাবনা কর; তুমি আপনা হইতেই বলিবে আমি ঐ রাজ্যে যাইব, আমি তাঁহার কাছে থাকিব, আমি তাঁহাকে দেখিব, আমি তাঁহার কথা শুনিব, আমি তাঁহার সেবা করিব।

উত্তম বস্তু আস্বাদন করিলে অধম বস্তু গ্রহণে রুচি হয় না, আবার সর্ব্বোত্তম বস্তু পাইলে আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা হয় না—সব পাওয়া ফুরাইয়া যায়, সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সকল কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ঐ রাজ্যে যাইতে পারিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সকল বিবাদ মিটিয়া যায়।

বলিতেছিলাম ঐ রাজ্যের কথা শ্রবণ কর—শ্রবণ করিয়া ভাবনা কর সেই রাজ্যে যাইবার জন্য প্রাণ মন মাতিয়া উঠিবে। সেই রাজ্যের লোকের কথা শুন, সেই রাজ্যের লোকের সঙ্গ কর; তুমি এই ত্রিতাপতাপিত দেহ ও মনকে যেন এক অপূর্ব্ব-ভাবে পুলকিত হইতে দেখিবে। এই অশ্রু, এই পুলক, তুমি

ভুলিয়া যাইতে পার ; কিন্তু ইহা আবার না পাইলে, তুমি আর প্রকৃত সুস্থ হইতে পারিবে না ; তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার মন, তোমার যত সুখের আস্বাদন করাক না কেন, তোমার তাহাতেও হইবে না। তুমি সেই আত্মরাজ্যের আনন্দ না পাওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুতেই পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না।

এই রাজ্য তোমার আমার সকলের ঈপ্সিত রাজ্য। এ রাজ্যে সকলেরই অধিকার। কোনও অপরাধে, কোনও পাপে, কোনও ব্যভিচারে, কোনও স্বাধীনতার শক্তির অপব্যবহারে আমরা সেই রাজ্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছি ; আমাদের কোন প্রকৃত সুহৃদের কথার অবাধ্য হইয়া আমরা আপনাদিগকে এক কপটীর রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। এখানে আমরা আপনিই আপনাকে প্রহার করিতেছি আর কাঁদিতেছি ; আর আপনার নিকট হইতে আপনি পলায়ন করিতেছি।

বড় বিপদে পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি তবুও পলাইতে পারিতেছি না। কেবল গ্রাম্য কুকুরের ন্যায় এখানে ওখানে ছুটিতেছি আর চিৎকার করিতেছি।

যে আমাদিগকে এই বিপদে ফেলিয়াছে, যে আমাদিগকে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে সে আমাদের মন। যতদিন মনের অধীনে আমরা থাকিব, যতদিন মনো রাজ্যে বাস করিব ততদিন আমরা শত্রুকে মিত্র ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ যাতনা পাইব।

আবার যদি মনকে বশ করিতে পারি তবে ঐ মনই সুস্থ হইয়া আমাদিগকে সেই সুখময়ের নিকটে লইয়া যাইবে। কারণ মনের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারিলে মন সুস্থ হইয়া আপন সত্তার আনন্দ রাজ্য আপনি খুলিয়া দেয়, সুখময়কে দেখাইয়া দেয়—সেই অমৃত গঙ্গার জলে অবগাহন করায়।

তবে মনকে বশ করাই হইতেছে কর্ম্ম। মনোরাজ্য জয় কর—তবে আত্মরাজ্যে ঢুকিতে পারিবে। ইহা না করিতে যদি চাও তবে চিরদিন হাহা হুহু হিহির রাজ্যে বাস করিবে। কখন জুড়াইতে পারিবে না। এখুনি হিহি করিয়া হাঁসিতেছ এখুনি হুহু করিয়া কাঁদিতেছ আবার তৎক্ষণাৎ হাহা করিয়া চলিয়া পড়িতেছে। মনের সহিত যুদ্ধ না করিলে কখনও মন আপন রাজ্য ছাড়িয়া দিবে না—বিনা যুদ্ধে এক সূচাগ্র পরিমিত স্থানও এ ব্যক্তি অধিকার করিতে দিবে না—আর তোমারও ঐ পাগলের মত হাহা হুহু হিহি

করা ঘুচিবে না ; তোমারও মুখে সাধুর মত কথা আর ব্যবহারে শয়তানের মত কাজ করা কখনও ঘুচিবে না।

তবে এস একবার মনকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হই। ইহাই আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সুখময়কে পাইবে—এ যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও অনেক দূর অগ্রসর হইয়া রহিলে।

এই পর্য্যন্ত ভনিতা। ইহার পরে করিবার কার্য্য। জগতে যত সাধু আছেন—যাঁহারাই মনকে জয় করিয়া আনন্দময়কে পাইয়াছেন—তাঁহারাই বলেন মনকে স্থির করিবার জন্য জপ, পূজা, পাঠ, ঈশ্বর, প্রণিধান রূপ কার্য্য করা চাই আর ব্যবহারিক কার্য্যও তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য করা চাই। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া চাই, আবার ব্যবহারিক কার্য্যেও জীবসেবা দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছি নিত্য ভাবনা করা চাই। এই দুয়ের একটি বাদ দিয়া শুধু একটি লইয়া থাক তুমি সুখময়ের রাজ্যে যাইতে পারিবে না। শুধু সন্ধ্যাপূজা জপ তপ লইয়া থাক আর প্রথম অবস্থাতে জীবসেবা না করিয়া জীবকে অগ্রাহ্য কর—তোমার সে পূজা ভগবান্ গ্রহণ করিবেন না। শাস্ত্র বড় জোর করিয়া বলিতেছেন জীবের অবমাননাকারীর পূজা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না। আবার তুমি জীবসেবা কর অথচ যদি জীবসেবায় ঈশ্বরসেবা করিতেছি এই ভাব না আনিতে পার তবে তোমার সে কর্ম্মেও বন্ধন হইবে। তুমি আনন্দময়ের নিকটে কখন যাইতে পারিবে না। তবে তোমাকে দুই কর্ম্মই সমকালে করিতে হইবে। যখন দেখ যে নিত্যকর্ম্মাদি নিয়মিত তিন বেলায় না করিলে তুমি শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ রাখিয়া জীবসেবা করিতে পার না ; যখন দেখ সাত্ত্বিক আহার না করিয়া যথাভিলষিত আহারে তুমি মনকে নিত্যকর্ম্মে স্থির করিতে পার না, যখন দেখ সদাচার না করিলে তুমি মনকে অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়াইতে পার না— তখন অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে মনকে শান্ত করিবার জন্য তোমাকে আহারে সাত্ত্বিক হইতে হইবে, ব্যবহারেও সাত্ত্বিক হইতে হইবে।

তুমি যাহাকে মনস্থির বল তাহা প্রকৃতপক্ষে মনস্থির কি না একবার বিচার কর। তুমি কবিতা লিখিতে পার, প্রবন্ধ লিখিতে পার, বা মেডিটেশন করিতে পার ; কিন্তু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে একাগ্রতা বলে না। বিচারক রায় লেখেন, বক্তা বক্তৃতার কথা মনে মনে মক্স করেন,

ধর্ম্মপ্রচারক প্রচার করিবার কথা পূর্ব্বে আলোচনা করেন, গ্রন্থকার গ্রন্থ লেখেন, কবি কবিতা লেখেন—এই সব কার্য্যে যে একাগ্রতা আছে, তাহাও ঠিক একাগ্রতা নহে। এটাও খবরের কাগজ পড়ার একাগ্রতা। এটাও যতক্ষণ ততক্ষণ। এখানেও বহু বিষয় দিয়া মনটাকে একটু মজাইবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। রায় লেখা শেষ হইলে, কবিতা লেখা শেষ হইলে, ধর্ম্ম-প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে যখন তুমি ব্যবহারিক জগতে আইস, তখন যাহা ছিলে তুমি তাহাই। তখন তোমার আর একাগ্রতা নাই। এক আর তোমার অগ্রে স্ফুরিত হইল না। ভাবিয়া দেখ কত কবিতা লিখিলে, কত প্রবন্ধ লিখিলে, কত সমাজ-সংস্করণের বক্তৃতা করিলে; কিন্তু তোমার হইল কি? তুমি শান্ত কি হইয়াছ? তুমি রাগ দ্বেষ কি ছাড়িতে পারিলে? তাই বলি একাগ্রতা ইহা নহে। ধারণা, ধ্যান, সমাধি ভিন্ন সংযমী হইতেও পারিবে না, একাগ্রতাও আসিবে না। ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও আহারশুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি না হইলেও হইবে না,; নিত্যক্রিয়া ও সাত্ত্বিক আহারাদি সদাচার না করিলেও হইবে না। তবেই হইল সাত্ত্বিক আহার কর আর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া প্রতিদিন তিন বেলায় নিয়ম মত কর, তবে তুমি মনকে শান্ত করিতে পারিবে।

এখন দেখ সন্ধ্যা, পূজা, জপ যে পার না, নিত্যক্রিয়ায় রস যে পাও না—কেন তাহা পাওনা? কেন ভাল করিয়া করিতে পার না? কেন তুমি তিন বেলায় ভাল করিয়া বসিতে পার না?

যাহাতে বসাটা অভ্যাস করিতে পার প্রথমে তাহাই ভাল করিয়া দেখ।

বসিবে ত মন। মনটাই যদি অত্যন্ত অস্থির রহিল জপ করাইবে কাহাকে? অবশ্য জপ করিলে মন শান্ত হইবে সত্য কথা; কিন্তু যতক্ষণ জপ করিলে মন স্থির হয়, ততক্ষণ সময়ও তোমার নাই। সময় থাকিলেও সে সাধ্য তোমার নাই। এ ক্ষেত্রে কি করিবে?

কতকগুলি অনুপান আছে। যাহার যেটা সুবিধা হয়, যে দিন যেটা ভাল লাগে, সেই অনুপানটি আগে করিয়া, জপ পূজাদি করিও। হইবে।

(১) সৎসঙ্গ অনেক হইয়াছে। তাহাতে শুনিয়াছ জগৎ থাক বা না থাক,—অন্ততঃ জপের সময় তোমাকে সংসারের কথা, জগতের চিন্তা মন হইতে সরাইতে হইবে। যখন জপে বসিবে তখনই বেশ করিয়া ভাবিয়া লও—সংসার মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, মনের প্রলাপ মিথ্যা, মনও মিথ্যা। এক মাত্র শ্রীভগবান্

তুমি সত্য। তোমার নাম সত্য। আমি সত্য বস্তু লইয়াই থাকিব। মন তুমি প্রতারক। তোমার মিথ্যা কথায় আর ভুলিব না। মন তোমার জল্পনা কল্পনায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন শ্রীভগবানে; শ্রীভগবানের নামে। আমি তাহাই আশ্রয় করিয়াছি, তাহা লইয়াই থাকিব, তাহা লইয়াই মরিব—এই আমার পণ। জপই জপই শ্যাম নাম ছায় তনু করব বিনাশ—ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরম্বা পাতয়েৎ ইহা আমি করিবই।

প্রতিদিন আহ্নিককালে প্রথমেই ঠিক করিয়া লইব—এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা আমি বসিবই। ইহার পূর্ব্বে কিছুতেই আসন ত্যাগ করিব না। কেহ ডাকিলেও উঠিব না। মন তুমি যত আলস্যই দেখাও, যত অনিচ্ছাই প্রকাশ কর—আমি কিছুতেই ঐ সময়ের পূর্ব্বে আসন ছাড়িয়া উঠিব না। তুমি শত তুফান তুলিয়াও যদি আমায় কিছু করিতে না দাও, তথাপি আমি কিছুতেই আসন ছাড়িব না। এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া মনকে বসাইতে চেষ্টা কর। যাঁহারা প্রাণায়ামাদি করেন, বই দেখিয়া নহে গুরুর নিকট হইতে জানিয়া লইয়া যাঁহারা প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করেন, তাঁহারা নিতান্ত অশান্ত মন লইয়া, অত্যন্ত কষ্ট করিয়া যেন বায়ুর কোন ক্রিয়া না করেন। কারণ রোগের প্রবল অবস্থায় ঔষধ যেন কোন কার্য্য করে না, কিন্তু রোগের বিরামমুখে ঔষধ পড়িলেই যেন তাহা ফল উৎপাদন করে—সেইরূপ মনের নিতান্ত অস্থির অবস্থায় প্রাণায়ামাদি না করিয়া হয় জপ দ্বারা না হয় স্বাধ্যায় দ্বারা ইহাকে অবসন্ন প্রলাপ করক ছাড়াইয়া তবে শ্বাসের ক্রিয়া করিতে হইবে।

(২) অনেককেই সংসার লইয়া থাকিতে হয়। উপস্থিত কালধর্ম্মে অনেককে সংসারের কার্য্য এত করিতে হয় যে, অনেকের আলস্য অনিচ্ছাও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু নিত্যক্রিয়া ত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। সংসারকর্ম্ম যতই কেন থাক না, তথাপি নিত্যক্রিয়াকালে মনকে বসাইতে হইবে। যাঁহাদের ইচ্ছা আছে কিন্তু সময় হইয়া উঠে না, তাঁহারা অল্পসময়ও নিত্যক্রিয়ায় রাখিবেন। যাঁহারা রাঁধেন, তাঁহারা কি চুল বাঁধেন না? করিলেই করা যায়। পূর্ব্বদুষ্কৃতি জন্য আমাদের বাধা আসিবেই। তাহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। বসিতেই হইবে। আবার পুনঃ পুনঃ জিদ্দম মত চেষ্টা করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবেই।

এই অবস্থায় একটা কার্য্য করা উচিত। যাঁহারা পুস্তকপাঠে সুখ পান, তাঁহারা আফিস হইতে আসিয়াই যদি নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিয়া যান, তবে সে কর্ম্মে সুখ পাইবেন না। একটা মৌখিক অভ্যাস মাত্র করিয়া যাইবেন। কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল; কিন্তু একটু ভাল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে, সংসারের লোকের সঙ্গ হইতে আসিয়া, প্রথমেই যে শাস্ত্র-গ্রন্থে রুচি তাহা কিছুক্ষণ পাঠ করা উচিত। শুধু পড়িলে যদি মন কিছুই শান্ত না হয়, তবে যাহা পড়িতেছেন তাহাই লিখিতে চেষ্টা করিবেন। পড়িয়া মনে যে ভাব হইবে তাহাই নিজের মতন করিয়া লিখিবেন। ইহা মনকে ফিরাইবার এক অব্যর্থ উপায়।

(৩) যাঁহারা সঙ্গীত ভালবাসেন তাঁহারা একটা গান করিয়া, কখন বা একতারার সাহায্যে বা তানপুরার সাহায্যে বা সঙ্কীর্ত্তনের সাহায্যে মনকে বিষয় হইতে ঘুরাইয়া, নিত্যক্রিয়ায় বসিবেন।

(৪) যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারা বৈরাগ্য-চিন্তা করিয়া মনকে বসাইবেন। শুধু বৈরাগ্য-চিন্তায় যাঁহাদের হয় না, তাঁহারা প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুসময়ে যেরূপ কাতরভাব দেখিয়াছেন—মনে মনে তাহা আলোচনা করিয়া, প্রিয়জনের চিন্তাটা হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া, সেই চিতাধূম দেখিতে দেখিতে স্মরণ করিবেন—হায়! আমারও ত এইরূপ সময় আসিবে—হে ভগবন্! কোথায় তুমি—তুমি একবার এস। এই ভাবে মনকে কাতর করিয়া নিত্যক্রিয়া করিবেন।

(৫) যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা শ্রীভগবানের অবিজ্ঞাত স্বরূপ, তাঁহার বিশ্ব-মূর্ত্তি, তাঁহার মানুষ বা মায়ামানুষী অবতার আলোচনা করিয়া, সেই রসে মনকে ডুবাইয়া হরি হরি করিবেন। কখন বা শ্রীমন্দির মনে মনে স্বহস্তে মার্জ্জনা করিবেন। মনে মনে গঙ্গায় স্নান করিয়া, মনে মনে পুষ্প-চন্দন লইয়া দেবমন্দিরে গিয়া পূজা করিবেন।

আরও কত উপায় ঋষিরা দেখাইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে যাহার যেটি ভাল লাগে তিনি তাহাই অবলম্বন করুন। এক বা ততোধিক উপায়ে মনকে বৈরাগ্যযুক্ত করিয়া বা ভক্তিযুক্ত করিয়া নিত্যক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। নিত্যক্রিয়ার অবসানে জপ লইয়া থাকিতে হইবে। ব্যবহারিক কার্য্যকালে মনে জপ মাখিয়া, বাহিরে হাতে-পায়ে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতেই ভগবৎ-কৃপালাভ হইবেই। একবার রস লাগিয়া গেলে আর ভয় নাই।

এইভাবে মনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারাই মনকে জয় করিতে সমর্থ। শুধু গলাবাজীতে ধর্ম্মরাজ্যে যাওয়া যায় না, শুধু মেডিটেশনে ব্যবহারিক ভাব ঠিক থাকে না। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ ক্রিয়া যোগ না করিলে কখন সরলতা আসিবে না; কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যাইবে না।

তপস্যাই ভারতের সর্ব্বস্ব। বিনা তপস্যায় ভারতবাসী, ভারতবাসী থাকিবে না। তপস্যা কর, শ্রেয় হইবে নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

হে ভগবন্! হে প্রিয়! হে সর্ব্বজনের সুহৃৎ! আবার কবে ভারতবাসী তোমার আজ্ঞা-পালন রূপ তপস্যা-কার্য্যে মন দিবে! কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, আবার কি সদাচার-পূত হইয়া তপস্যা করিয়া, তোমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিবে? কবে করিবে প্রভু! কবে তুমি আমাদের তপস্যা-বুদ্ধি প্রবল করিয়া দিবে।

আমরা নিতান্ত মূঢ় হইয়া গিয়াছি; তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদিগকে তোমার নিজের করিয়া লও। অহরহঃ নিত্যক্রিয়া রূপ তোমার আজ্ঞা-পালনের শক্তি দিয়া, আমাদের চিত্তশুদ্ধি করিয়া দাও। আর কি বলিব, তুমি আমাদের উপর যে প্রসন্ন তাহা অনুভব করাইয়া দাও!

শ্রীচরণ।

চাহিব না আর মুখেরি পানে, কহিব না কোন কথা।
ত্রিলোক-পূজিত যুগল চরণে, নোওাইব শুধু মাথা॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি চিরকাল, এ মোর বাসনা মূলে।
(আমি) নোওাইলে মাথা দিও দয়াময়! শ্রীপদ-পঙ্কজ তুলে॥
ও রাঙ্গা চরণে চির অধিকার, বল হে দেবে ত তুমি।
(নহে) সহজ উপায়ে, ভুলায়ে তোমায়, নিশ্চয় লইব আমি॥
তর্ক যুক্তি দিয়া চিনিতে তোমারে, নাহিক আমার কাজ।
পণ্ডিতে সহজ সে সব প্রণালী, মূর্খের মাথায় বাজ॥
(আজি পুরাতন কথা কহিব তোমায়, ভকত বৎসল হরিণ
(তুমি) যুগে যুগে প্রভু! বাসনা পুরাও, কত মত রূপ ধরি॥

ব্রহ্মার নন্দিনী গৌতম-গৃহিণী, অহল্যা-সুন্দরী শিরে।
দিয়াছিলে পদ শ্রীরাম রাঘব, দেখ দেখি মনে ক'রে॥
আর একবার নীরদবরণ, অধরে মুরলি ধরি।
ঈষৎ হেলায়ে দাঁড়াইয়াছিলে, কালিয় দমন করি॥
পরম ভকত বিরোচন সুত, তাহার কারণে তুমি।
ছলনা করিয়া দীনবেশে প্রভু! মাগিলে ত্রিপাদ ভূমি॥
(আবার) গুরুরূপে তুমি নিত্য নারায়ণ, জীবের কল্যাণ তরে।
সাকার হইয়া নির্গুণ ঈশ্বর, ভ্রম প্রতি ঘরে ঘরে॥
শ্রীপদে আমার পূর্ণ অধিকার, তাই ত পরাণ চায়।
গুরুশিষ্য বড় নিকট সম্বন্ধ, ছাড়িলে ছাড়ান দায়॥
অপার করুণা লুকালে কি হয়, সারাটি জগৎময়।
(তবে) দাও দাও প্রভু! অলিত মাথায়, ও রাঙ্গা চরণ-দ্বয়!

রাঃ—

চিত্রকূট।

রেলের রাস্তা বর্ণনা সকলেই করেন। আমি আর তাহা নাই করিলাম। কলিকাতা হইতে ৺কাশীধাম—তথা হইতে প্রয়াগ—প্রয়াগ হইতে মাণিকপুর—মাণিকপুরে ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা—তথা হইতে করবি। এই রেলপথ। কোন্ তারিখে গমন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখিতে মানুষের স্বভাবতঃ ইচ্ছা থাকে। সন ১৩১৮ সালের দুর্গাপূজার আশ্বিন-পঞ্চমী তিথিতে ৺ কাশী-যাত্রা। সেখানে বিজয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া, বিজয়ার পরদিন বেলা ৫টার গাড়ীতে চিত্রকূট গমন।

করবি ষ্টেশন হইতে পদব্রজে চিত্রকূট যাওয়া ভাল। যাইবার কালে কালিদাসের যক্ষের সিদ্ধছায়াতরু কিরূপ তাহা দেখা যায়, গিরিকন্দর দেখা যায়, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং' কিরূপ ধারণা করা যায়, আর জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যোদকশালিনী মন্দাকিনীও পার হওয়া যায়। কেহ কেহ অসমর্থ না হইয়াও গো-যানে গমন করেন। ইহা না করাই ভাল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। রামগিরির সানুদেশে পর্ব্বত প্রমাণ মেঘ খেলা করিতেছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত। পর্ব্বতমালা মন্দাকিনীর পূর্ব্ব-

তট বিভাগে। পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। আশ্বিন মাস—তখনও কিন্তু দুই এক খানা কালমেঘে জল ছিল। তাহারা সূর্য্যদেবকে এক একবার অন্তর্ভূত করিতেছিল, আর কালমেঘের প্রান্তভাগ রজতমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছিল। ইহা দেখিতে দেখিতে আমরা মন্দাকিনী পার হইলাম। তখন মন্দাকিনীতে বেশী জল ছিল না। পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া গেল। আমাদের জিনিষপত্র গো-যানে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ পাণ্ডার বাড়ীর মুখের পথে চলিল। আমরা দেবনদী পার হইয়া নদীতটে একটি বিশ্রাম-স্থানের খোলা ছাদে বসিলাম। অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ মন যেন কোন মনোহর রাজ্যে যাইতেছিল। আমরা সেই ভাবনা-রাজ্যের কথা আগে বলিয়া চিত্রকূট-ভ্রমণ বর্ণনা করিব।

২

"সবই আমার রাম"

আমার কার?

"আমার"—"শক্তির" "সীতার"।

আমি শ্রীসীতার। শ্রীসীতা রামের।

আমি তবে সীতারামের।

সবই সীতারাম এ কিরূপ?

রাম ত কিছুই করেন না। তিনি কোথাও যান না—কোথাও স্থিত নহেন—শোকও করেন না—আকাঙ্খাও করেন না কিছুই করেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার চলনশূন্য—অচল। সীতাই অমূর্ত্তের মূর্ত্তি। স্বপ্রকাশের দ্বিতীয় প্রকাশ। রামং বিদ্ধি পরাত্মানং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ইত্যাদি। রামলীলার যাহা কিছু আচরণ তাহা সীতাই করিয়াছেন। অযোধ্যানগরে জন্ম হইতে রাবণ বিনাশ—পুনরায় অযোধ্যা আগমন পর্য্যন্ত শ্রীসীতাই সব করিয়াছেন। অবুধজনে সীতার কার্য্যগুলি শ্রীরামে আরোপ করে মাত্র এবং "আদীনি চাস্যানি মমৈব চরিতান্যপি আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারে খিলাত্মনি"।

শ্রীরামায়ণের সমস্ত ঘটনা না হয় সীতা করিলেন, কিন্তু এখনকার সবই সীতা করিলেন কিরূপে?

নিঃসন্দেহে বলা যায়,—মানুষ যাহা দেখে, শুনে, ভাবে, করে, বলে,—এ সমস্তই শক্তির কার্য্য, শক্তির বিকাশ। শক্তি ভিন্ন শক্তিমান্‌কে প্রকাশ করিতে আর কেহ নাই। স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ জন্যই এই শক্তি। শক্তির সাহায্য

ভিন্ন শক্তিমানে পৌঁছিতে কাহারও সাধ্য নাই। কোটিকল্প ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া চিৎকার করিলেও, তুমি যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম-শক্তি। যতদিন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের মধ্যে, ততদিন ব্রহ্ম আসেন না। আসেন শক্তি-আবৃত ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিতে পারেন এই শক্তি। শক্তি, পূর্ণমাত্রায় শক্তিমান্; আর শক্তিমান্ শক্তির পূর্ণাবস্থা হইয়াও আরও অনেক।

তাই বলিতেছি সীতাই চিরদিন সব করেন;—কিন্তু রাম না থাকিলে তিনিও জড়। আর রামকে পাইয়াই তিনি জড় হইয়াও চৈতন্য-দীপ্তা।

প্রকৃতি ও পুরুষের, রাম-সীতার, শিব-শক্তির, রাধাকৃষ্ণের, ব্রহ্ম-মায়ার তত্ত্ব ইহা।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" শ্রুতি ইহা বলেন। শ্রীগীতা সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্ট যাহা তাহাকেই বলেন বিশ্বরূপ। ব্রহ্ম আপনি আপনি অবস্থায় বা সমাধি দশায় অবিজ্ঞাতস্বরূপ। ব্যুত্থান দশায় বিশ্বরূপ। ব্রহ্মের ব্যুত্থান দশা প্রকৃতি অবলম্বনেই হয়। উৎকৃষ্ট যাহা তাহাই সৎ চিৎ আনন্দ। আর মিথ্যা যাহা, তাহাই নামরূপ। ইহাও শ্রুতি বাক্য। নাম রূপ যতই কেন সুন্দর হউক না তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র, তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র।

রামসীতার তত্ত্বে যাহা পাওয়া যায়, তাহা স্মরণ রাখিয়া চলিতে পারিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। সর্ব্বত্র সমভাবে সেই সর্ব্বভূতের সুহৃৎ আছেন; তোমার মধ্যেও তিনি আছেন, তোমাকে যে সংহার করিতে আসিতেছে তার মধ্যেও তিনি আছেন। জীবের মায়িক অংশটি বাদ দিয়া, সৃষ্টির মিথ্যা অংশটি বাদ দিয়া যিনি জগৎ দেখিতে শিখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" যাহা মিথ্যা মায়া তাহা থাকিয়াও নাই; এই জন্য ভগবতী শ্রুতি সত্যবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আছেন আর মিথ্যা মায়া যাহা তাহা তাহার আবরণ শক্তিদ্বারা মায়ার সহিত ব্রহ্মের যে ভেদ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে ভেদ, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার যে ভেদ, রজ্জুর সহিত সর্পের যে ভেদ তাহা ঢাকিয়া রাখে। সেই জন্য সৃষ্টিকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম হয়, দ্রষ্টাকে দৃশ্য বলিয়া ভ্রম হয়, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু সর্ব্বই ব্রহ্ম নহে। সর্ব্বের মায়া অংশটি মিথ্যা—এইটি বাদ দিলেই ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছুই নাই। তথাপি এই মায়ার সাহায্যেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বলিয়া, মায়াধিষ্ঠিত চৈতন্যের পূজা হয়। শত্রুমিত্র সমান হইয়া যায়—যদি ভিতরের

সচ্চিদানন্দকে কেহ স্মরণ করিতে শিক্ষা করে। শত্রুমিত্রকে, চণ্ডালকুক্কুরকে সমান ভাবে প্রণাম করা যায়—যদি কেহ সচ্চিদানন্দরূপী অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে বিশ্বাসে সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারে।

কাজেই "মাং নমস্কুরু" বড় সহজ সাধনা। কর না—মনে মনে সেই দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে সর্ব্বজীবকে, সর্ব্ব সৃষ্টবস্তুকে প্রথমেই প্রণাম করিতে অভ্যাস কর না। ঠিক হইবে।

কি হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর—উত্তরে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মনে কর তুমি সর্ব্বদা জপ অভ্যাস করিতেছ; কিন্তু অনেক সময়ে বল পাখীর বুলির মত নাম মুখস্থ করি, রস পাই না। ভাল তবুও ইহা করিয়া যাও। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বিশ্বাস কর। যে মন্ত্রটি জপ কর—তাহার অক্ষরগুলিকে কখন বর্ণাক্ষর মনে করিও না। ঐ অক্ষরগুলিও সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের রূপ মনে করিয়া লও। ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়ে যখন জ্যোতির ভিতরে ঐ অক্ষরগুলিও লিখিয়া দেখিতে অভ্যাস করিতেছ, তখনও মনে ভাবিও তাঁহারই রূপ দেখিতেছি। যদি মূর্ত্তি না আনিতে পার, তাহা হইলেও হতাশ হইও না। বিশ্বাস কর মন্ত্রের অক্ষরগুলিও জ্যোতি-জড়িত তাঁহার এক মূর্ত্তি। চক্ষে এই মন্ত্রের অক্ষর দেখ, আর কর্ণে মন্ত্রের উচ্চারণের শব্দ শ্রবণ কর। তুমি চিত্ত স্থির করিতে পারিবে। তাঁহার মন্ত্র ঐ ভাবে চক্ষু—কর্ণ সাহায্যে জপ করিতে করিতে যখন ঐ মন্ত্রেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিবে, তখন তোমার সবিকল্প সমাধি হইবে। শ্রুতি বলেন অন্তরে যে তিন প্রকার সমাধি লাভ হয়, তন্মধ্যে দৃশ্যটিতে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলে সবিকল্প সমাধি হয়। জপের মন্ত্রটী এখানে তোমার দৃশ্যবস্তু। শ্রুতি আরও বলেন যিনি জপের মন্ত্রটি দেখেন বা শব্দটি শ্রবণ করেন, তিনি দ্রষ্টা বা শ্রোতা। যদি দ্রষ্টাতে লক্ষ্য স্থির করিতে পার তবে যে সমাধি হয়, তাহাও সবিকল্প সমাধি। দ্রষ্টাতে লক্ষ্য স্থির করিলে আর কিছুই থাকে না; থাকে শুধু "আছি" এই ভাব। ইহাই অস্মিতা সমাধি। ইহাও সবিকল্প কিন্তু আছি এই ভাবে লক্ষ্য স্থির করিতে করিতে যখন ইহা আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়, তখন অস্তির সহিত ভাতি ও প্রিয় আসিয়া উদয় হয়েন; এই সময়ে যে সমাধি হয় তাহার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। জপের ভিতর দিয়াও এতগুলি হয়। কর—বুঝিবে।

তবে সমাধি অভ্যাস যাঁহারা করিবেন তাঁহাদিগকে স্থানকালে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ভ্রমজ্ঞানগুলি ছাড়িতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক।

কোন কর্ম্মে জীবের কর্তৃত্ব নাই। সাধারণে ইহা বিশ্বাস করে। আবার পণ্ডিত মানুষেও বলেন "জীবাত্মার যে কর্তৃত্ব তাহা পরমেশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষ"।

কথাটা কতদূর সত্য বিচার কর। পরমেশ্বর কি অনুমতি করেন? শাস্ত্র বলেন, জহি শত্রুং মহাবাহো: কামরূপং দুরাসদম্" ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা। আবার বলেন, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশ মাগচ্ছেৎ ইত্যাদি।

কাম-শত্রু জয় কর। রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। এই সমস্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞা। জীব যখন ইহা কার্য্যে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে, করিয়া কৃতকার্য্য হয়—ধরা গেল পরমেশ্বরের কৃপা দ্বারা তাহারা ঐ কার্য্য করিল। জীব এখানে তাহার কার্য্যের কর্ত্তা নহে; ইহা ধরা গেল। পরমেশ্বরই জীবকে ইহা যেন করাইলেন।

কিন্তু সকল সময়ে ত মানুষ কাম জয় করিতে পারে না, সকল সময়ে ত রাগদ্বেষ জয় করিতে পারে না। পরমেশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া সে প্রাণপণ করিতেছে তবুও যখন রাগদ্বেষের কার্য্য করিয়া ফেলিল, সে ক্ষেত্রে কর্ত্তা কে? সে ক্ষেত্রে ত পরমেশ্বর কর্ত্তা নহেন, কর্ত্তা মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে তাহাই। তবেই হইল পুণ্য যখন হইল তখন কর্ত্তা পরমেশ্বর, আর পাপ যখন হইল তখন কর্ত্রী প্রকৃতি। তবে জীবের কর্তৃত্ব শুধু পরমেশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষ কিরূপে? যদি বল প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এক। আমি বলি ঈশ্বর করান পুণ্য, আর প্রকৃতি করান পাপ; তথাপি কি বলিতে হইবে উভয়েই এক? যে পরমেশ্বর বলিতেছেন কাম জয় কর, রাগদ্বেষ জয় কর—প্রকৃতি হইয়া তিনিই বলিতেছেন কামের কার্য্য কর, রাগদ্বেষের কার্য্য কর ইহা কি হয়? তাই বলিতেছি এ জ্ঞান ভ্রম-জ্ঞান। পরমেশ্বর কিছুই করেন না, কিছুই করানও না; জীবও কিছুই করেন না, কিছুই করানও না; কারণ জীব ও শিব এক। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি পরমেশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করেন, কিন্তু এই প্রকৃতি জীবকে অধীন করিয়া কর্ম্ম করেন।

তাই অহঙ্কারবিমূঢ় আত্মাই কর্ম্মের এক কর্ত্তা। ইহা ভিন্ন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, চেষ্টা ও দেবতা এই চারিটিও কর্ম্মের কারণ। পরমেশ্বর জীবকে অহংকারবিমূঢ় করেন না, করেন প্রকৃতি। এইটি বিলক্ষণরূপে জানিয়া, তুমি দ্রষ্টা তুমি দৃশ্য নও জানিয়া, পূর্ব্বোক্ত সমাধির চেষ্টা কর, সকলই বুঝিতে পারিবে। যদি বল পরমেশ্বর যদি কিছু করেন না, কিছু করানও না, তবে কামশত্রু জয় কর ইহা বলে কে? ইহার উত্তর শুদ্ধ সত্ত্বই চৈতন্য-সন্নিধিতে পরমেশ্বর নামে অভিহিত। আর রজ ও তম ইহারাই অভিমান জন্মায়, পাপ করায় ইত্যাদি।

চিত্রকূটের কথা বলিতেছিলাম। বলিতেছিলাম এই সুন্দর তীর্থে, এই সীতারামের চরণধূলিতে পবিত্রীকৃত রমণীয় ক্ষেত্রে "সবই আমার রাম" আমার এই বলিতে ইচ্ছা করে। যদি তোমার এ ইচ্ছা না হয়, তবে তুমি রামকে কখন ভাল বাস নাই। যে যাহার প্রিয় সে কি তাহার কাছে শুধু পটের ছবি বা শিলাধাতুর মূর্ত্তি বা শুধু মন্ত্রের অক্ষর—এইরূপ ক্ষুদ্র থাকে? ভালবাসা বস্তুটি অনন্ত, ক্ষুদ্র সীমায় কি ইহা আবদ্ধ থাকে? যাহা প্রকৃত ভালবাসা তাহা অনন্ত সীমাশূন্য হইয়া সকল বস্তুকে, সকল জনকে, সকলকে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া রাখে।

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আবার সকলকে আমাতে দেখে, আমি তার কাছে অদৃশ্য হই না; সেও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না। শ্রীভগবান্ ভালবাসার এই শেষ কথা বলিয়াছেন—যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ইত্যাদি যখন তোমার এটা ওটা সেটা আছে, যতদিন তোমার চক্ষে আকাশ আছে, জল আছে, বায়ু আছে, আলোক আছে, পৃথিবী আছে, চিত্রকূট আছে, মন্দাকিনী আছে, কামদ গিরি আছে, লক্ষ্মণ গিরি আছে, প্রমোদবন আছে, জানকীকুণ্ড আছে, তীর্থকোট আছে, দিব্যাঙ্গনা আছে, হনুমানধারা আছে, জনস্থান আছে; যতদিন তোমার কাছে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি আছে, বৃহৎ বৃহৎ শিলাবিকীর্ণ পর্ব্বত আছে, পার্ব্বতীয় পথ আছে, বনস্পতি, বনলতা বনফুল আছে; যতদিন তোমার কাছে স্থানে স্থানে জলধারা আছে, গিরিকন্দরের উপরিভাগে ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য আছে; যতদিন তোমার কাছে পাখীর স্বরে চিত্রকূট প্রবণ আছে, নানাবিধ বনবিহঙ্গের পরিষ্কার ঝঙ্কার আছে, ইহাদের দ্রুত গমনভঙ্গি আছে; যতদিন তোমার কাছে কুষার-

ধবল পর্ব্বতাকার মেঘপুঞ্জ আছে. আবার সেই পর্ব্বত-সানুদেশে অন্তঃসূর্য্য রজতমণ্ডিত নীলমেঘের বপ্রক্রীড়া আছে ; যতদিন তোমার কাছে সব আছে—ততদিন এই সব পদার্থে তাঁহাকে দেখা অপেক্ষা রমণীয় আর কি হইতে পারে ? আবার যখন তোমার কাছে অন্য কিছুই আর উদিত হয় না, শুধু তোমার রমণীয় দর্শনের মধুর মূর্ত্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই দয়িত অঙ্গে সকলকে দেখা অপেক্ষা আর রমণীয় কি থাকিতে পারে ? তাই শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ ভক্তকে অত্যন্ত সুখের কথা যাহা তাহার সংবাদ দিয়াছেন। যে ভক্ত ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তিনিই ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যিনি না পারেন তিনি যদি বিশ্বাসেও ইহা দেখেন, দেখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন, সাধনার সঙ্গে এই চেষ্টা করিতে করিতে তিনিও ধন্য হইয়া যাইবেন।

বলিতেছিলাম আমার ইচ্ছা করে "সবই আমার রাম" এই আমি দেখি। যখন এই চিত্রকূটকে ভাবনায় বিশ্বাসেও রাম দেখি, মন্দাকিনীকে রাম দেখি, জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদককে রাম দেখি, যখন এই স্নিগ্ধচ্ছায়া তরু সমাকীর্ণ রাম গিরিকে রাম বলিয়াই দেখি, যখন সকলকেই রাম বলিয়া ভাবনা করিতে পারি, যখন সুন্দরে-কুৎসিতে, জীবজন্তুতে, নরনারীতে কোথাও আমার রাম ভাবনা ভুল না হয়, যখন কর্কশ মধুর সকল প্রকার বাক্যে সেই রামই ভাবনা হয়, এক কথায় যখন বিশ্বাসেও জগৎ রামময় হইয়া যায়, তখন কি আমার আর কোন প্রার্থনায় বস্তু থাকে ? পুষ্পে পত্রে রাম, ফলে মূলে রাম, সর্ব্বত্র রাম যখন আমার স্মরণ হয়, তখন বুঝি আমার রাম-উপাসনা সাঙ্গ হয়। তখন বুঝি আমার রামকে বুঝিবার সময় হয়।

এই যে বলিতেছিলাম সবই আমার রাম—ইহা কি আমার মনগড়া একটা উচ্ছ্বাস ? না তা হইবে কেন ? শাস্ত্রও যে ইহা বলেন পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছি।

শ্রীবৃহৎরামায়ণে শ্রীচিত্রকূট মাহাত্ম্যেও শ্রীভগবান বাল্মীকি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

চিত্রকূট গিরৌ রম্যে মন্দাকিন্যা স্তটে শুভে।
বসীণামাশ্রম পদে সদা তিষ্ঠতি সানুজঃ।
যত্রো ভূতা নদী যত্র রামরূপা ন সংশয়। ইত্যাদি

এখানে নদী, পর্ব্বত এখনও সেই শ্রীবাল্মীকির বর্ণন সময়ের মতনই

দেখা যায়। ইহারা রামরূপেই ছিল চিরদিন; যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন থাকিবে।

শ্রীরামপদভূষিত এই পর্ব্বত কত সুন্দর!
প্রয়াগাৎ পশ্চিমেভাগে সপ্তযোজন সম্মিতঃ।
সকূটঃ পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো মণি কাঞ্চন চিত্রিতঃ বিরাজতে। ইত্যাদি॥

প্রয়াগ হইতেই চিত্রকূট যাইতে হয়। প্রয়াগে ভগবান্ ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। এখনও সেই স্থান আছে। কতকগুলি দেবমন্দির সেখানে আছে, সপ্তঋষির স্থান আছে, আর সেই ভরদ্বাজাশ্রমের দীনহীন পাণ্ডাদিগের মধ্যে পাণ্ডানীদিগের মুখে এখনও রাম রাম আছে। শ্রীভগবানের লীলা-বর্ণনা শুনিলে এখনও চক্ষে জল আসে। আমরা ঐ স্থানে তুলসীদাসের রামায়ণ ও শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলাম। আর ঐ স্ত্রী লোকেরা তাহা শুনিয়া কাঁদিয়াছিল।

এই ভরদ্বাজাশ্রম হইয়া আমরাও চিত্রকূটে যাই। রামায়ণের বর্ণনাতে দেখি এখান হইতেই বনভূমি আরম্ভ হয়। শ্রীভরত যখন অযোধ্যার সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রীরঘুনাথের সহিত মিলিতে গমন করেন, তখন প্রথমে এই নিবিড় বনভূমিতে তাঁহাকে পথ প্রস্তুত করিতে হয়। শ্রীভগবান্ কিন্তু বনে বনেই ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রকূটে উপস্থিত হয়েন।

আমরা সন্ধ্যার সময় চিত্রকূটে পৌঁছিলাম। পাণ্ডা শ্রীকাশীপ্রসাদ বেশ ভাল। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সায়ংকালে মন্দাকিনীতে স্নানার্থ আসিলাম। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ বড় হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যে স্থানে স্নান তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটি বেশ সুন্দর। সকল ঘাটই বাঁধান। আমরা রামঘাটে জ্যোৎস্নামাখা মন্দাকিনী-জলে স্নান করিলাম। শ্রীবাল্মীকি বর্ণিত চিত্রকূট-বিহারিণী এই দেব-নদী কতই মধুর বোধ হইল। স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

সকল তীর্থে যেমন বাঁদর চিত্রকূটেও সেইরূপ। তবে কাশীর মত এখানে কাপড় লইয়া যায় না, খাবার যাহা পায় তাহ লইয়াই পলায়ন করে। আবার বড় বড় বাঁদর মানুষের কাছে আসে। মানুষের গায়ে গায়ে বসিয়া খাবার খায়। আমাদের পাণ্ডার এক ১০।১১ বৎসরের ছেলের সঙ্গে এক বালক বাঁদরের

সখ্যতা আছে। বাঁদর সকল সময়েই বনে বনে বেড়ায়, কিন্তু প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ বালকের ডাকেই আইসে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আশ্বিন শুক্লা ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাকালে আমরা চিত্রকূটে পোঁছাই। পরদিন শুক্রবার। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া চিত্রকূটের পশ্চিমে যে সমস্ত গিরিকন্দর আছে, আমরা সেই দিকে যাই। সেখানে ময়ূর ময়ূরীর ইতস্ততঃ পাদচারণ দেখিয়া কতই যে সুন্দর বোধ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। ময়ূরগণ এক কন্দরের উপরিভাগ হইতে অন্য কন্দরের উপরে উঠিয়া যাইত; আমি সাগ্রহে তাহাই অবলোকন করিতাম্। মনে হইল এই পর্ব্বত এত রমণীয় না হইলে শ্রীভগবান্ চতুর্দ্দশ বৎসর এইখানেই অতিবাহিত করিতে অভিলাষ করিতেন না। ভগবান্ বাল্মীকি এই পর্ব্বতের বর্ণনা রামায়ণে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সে কতকালের কথা। যাঁহারা চিত্রকূট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উচিত শ্রীরামায়ণের অপূর্ব্ব বর্ণনা পাঠ করা।

শুক্রবার প্রাতে স্নান, সন্ধ্যা, পূজা, পাঠাদি করিয়া মানদ গিরি পরিক্রমণের ইচ্ছা করি। বেলা ১২ টায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। চারিদিকেই পর্ব্বত। পাণ্ডারা পর্ব্বতের উপরেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চারিদিক হইতে বৃষ্টির জল মনোহর শব্দ করিতে করিতে মন্দাকিনী-মুখে ছুটিয়াছে। পূর্ব্ব দিন রাত্রে এবং পরদিন প্রভাতে মন্দাকিনীর রূপ একপ্রকার দেখিলাম, আবার বৃষ্টির পরেই মন্দাকিনী দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিল।

আমরা বেলা ৩।৩½ টায় মানদ গিরি পরিক্রমণার্থ বাহির হইলাম। এই সেই মানদ গিরি—ইহারই উপরে শ্রীভগবান্ মা-জানকীর সহিত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানকার লোকে এই পর্ব্বতকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে। কেহই এই পর্ব্বতে আরোহণ করে না। সম্মুখে লক্ষণ পাহাড়ী বলিয়া অন্য একটি পর্ব্বত আছে। পরিক্রমণের পথে তাহা পাওয়া যায়। সেই পর্ব্বতে উঠিয়া মানদ গিরি অবলোকন করে।

বৃহৎ রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

কথং শ্রীরাজরাজাসৌ সপ্তাবরণ শোভিত:।
জানক্যা সহিতঃ শ্রীমান্ মন্দিরে রত্নভূষিতে॥
অভ্যন্তরে পর্ব্বতস্য বিহারং কুরুতে পরঃ।
এতৎ বিস্তরতো ব্রূহি সংসারার্ণব তারক॥

শ্রীসুতীক্ষ্ণ ভগবান্ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করেন—রত্নভূষিত, সপ্তাবরণ শোভিত এই পর্ব্বত-অভ্যন্তরবর্ত্তী মন্দিরে কিরূপে সেই রাজরাজেশ্বর শ্রীজানকীর সহিত বিহার করেন তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ অগস্ত্য শ্রীভগবানের এই পরমাদ্ভুত বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। পর্ব্বত মধ্যে সন্তানক বন। বনের মধ্যে বিধিনির্ম্মিত সরোবর। সরোবরের উত্তর দিকে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মণিমাণিক্যবিজড়িত মন্দির। ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগাদিনির্ম্মিত চতুর্দ্দার সেই মন্দিরের। মন্দির রত্নকবাট দ্বারা সুশোভিত। মন্দিরের শিখরদেশ মণিমাণিক্য-শোভিত হেম-কুম্ভযুক্ত। মন্দিরের তোরণদ্বার সমূহ মুক্তাদাম বিলম্বিত।

ভগবান্ বাল্মীকি কতই বর্ণনা করিয়াছেন। মন্দিরের চারিধারেই রমণীয় বনভূমি। সেখানে হংস, পারাবত, ময়ূর, কোকিল, শারিকা, শুকবৃন্দ সর্ব্বদা আনন্দধ্বনি করিতেছে। মন্দির সহস্র স্তম্ভসংযুক্ত। বজ্রভিত্তিবিনির্ম্মিত। মন্দিরের মধ্যে রম্য দিব্য রত্নবিনির্ম্মিত বেদিকা। ত্রৈলোক্যের সারভূত বস্তু দ্বারা এই রম্য-মন্দির সুশোভিত। সরোবর মণিবদ্ধ সোপানযুক্ত। মন্দিরের মধ্যে আবার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর চারিদিকেই কত মন্দার, কত পারিজাত, কত সন্তান, কত হরিচন্দন বৃক্ষ। মধ্যদেশে যে বেদিকা তাহা কল্পবৃক্ষ তলে। মন্দির যোজনায়তন।

বহু বিস্তৃত বেদিকার উপরে দিব্য রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত, ইন্দ্রনীলাদি নবরত্ন-খচিত মনোহর সিংহাসন। রসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ সীতার সহিত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট। ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি ত্রিদশ সেব্যমান শ্রীভগবানকে এই পর্ব্বতাভ্যন্তরালস্থিত রত্নভূষিত মন্দিরে যিনি ধ্যান করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন; তিনি সর্ব্ব কামনার সিদ্ধি করেন।

ধ্যায়ন্তি যে শ্রীরঘুবংশ বর্দ্ধনং
সিংহাসনাসীন মুদার বর্চসম্।
নগস্য মধ্যে সুবিশাল মন্দিরে
তে দেব বন্দ্যা ভগবৎ প্রিয়োনরা।

ইহার পরে আবরণ দেবতাদিগের সংবাদ। প্রথম আবরণে রামপাদ-প্রিয়া বিভূতিদা ঋদ্ধিদা ছায়া কান্তিমতী কান্তা বিমলাদি সখীবৃন্দ। ইঁহারা—

রামরম্যা রামরতা রামনামপরায়ণা।
জানকীলক্ষ্মণাভিজ্ঞা জানকীপাদসেবিকা।

ইহাদের কেহ বা বীণা বাদন করিতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ তাল দিতেছেন, কেহ হাস্য করিতেছেন। কেহ বা

শ্রীরামচন্দ্রস্য মুখপঙ্কজং নিঃসৃতং—
তাম্বূলং চর্ব্বণং চক্রে। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় আবরণে অনিমাদি বিভূতি সমূহ। তৃতীয় আবরণে ধ্যানপরায়ণা সর্ব্বাবরণভূষিতা বেদমাতা গায়ত্রী। চারি বেদ অষ্টাদশ পুরাণ সংহিতা আগম—এই সমস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্থ আবরণে ব্রহ্মাদি সত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন। সেখানে ব্রহ্মা, শম্ভু, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য, মরুদ্গণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ,

ধ্যায়ন্তি জানকীং শান্তং চতুর্থাবরণেস্থিতা।

পঞ্চমাবরণে দিব্যদেহধারী মুনীশ্বরগণ। ষষ্ঠাবরণে দিব্যরূপধারিণী গঙ্গাদি নদী। সপ্তমাবরণে দিব্যদেহধারী সুগ্রীব, হনুমানাদি কপীশ্বরগণ।

সকলেই রামানন্দ-রসোৎসুক। সেখানে কত গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ কত রত্নবৃন্দ। এই সপ্তাবরণ মধ্যে

—জানকী জানিঃ সখীভিঃ সহিতো হরিঃ
সিংহাসনে রাজমানঃ সর্ব্বেষাং পুরতস্থিতঃ।

ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

এবমাবরণোযুক্তং যো ধ্যায়ন্তি রঘূত্তমম্।
চিত্রকূটস্থমতুলং মনোবাঞ্ছা ফলং লভেৎ॥

এই মহিমান্বিত পর্ব্বতকে এখনও সকলে প্রদক্ষিণ করেন। আমরা এই পর্ব্বতের কামধেনু মুখারবিন্দ, ভরতমিলন এই তিন দ্বার দর্শন করিলাম। আরও এক দ্বার আছে, তাহার নাম জানিতে পারিলাম না।

যেখানে ভরতমিলন হইয়াছিল, সেখানে পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি মন্দির। শ্রীভগবানের বহু বিগ্রহ এখানে ভক্তরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু শ্রীভগবানের, শ্রীজানকীর ও শ্রীলক্ষ্মণাদির পদচিহ্ন।

কি সুন্দর, কি মহিমান্বিত এই শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন। যতবার স্পর্শ কর ততবারই শরীরে সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হয়। মনে হয় সেই চরণ-চিহ্নের উপর লুণ্ঠিত হই।

চরণ-চিহ্নের অপূর্ব্বতা মুখে বলা যায় না। শ্রীজানকী যখন শ্রীভগবানের সঙ্গে বনগমন করেন—সুমন্ত্র রথ লইয়া ফিরিয়া গেলে মা জানকী যখন ঐ দেশের কঠিন মৃত্তিকায় চলিতে অসমর্থ হন - রথ হইতে অবরোহণ করিয়া "চতুরাণি পদানি গত্যা" চার পা গমন করিয়াই যখন শ্রীভগবানের দিকে ফিরিয়া বলেন আর্য্যপুত্র! আর কত দূর যাইতে হইবে? শ্রীভগবান্ তখন জনকনন্দিনীর জন্য কাতর হইয়া পৃথিবীকে প্রার্থনা করেন।

ধরণি! তব সুতেয়ং পাদবিন্যাসদেশে।
ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাতিরণ্যম্।

ধরণি! এই তোমার দুহিতা আর চলিতে পারে না। তুমি জানকীর পাদ বিন্যাস স্থানে নিজের কঠিনতা ত্যাগ কর; জানকী যে বনে যাইতেছে। শ্রীভগবানের বাক্যে পর্ব্বতও কোমল হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? যিনি বিশ্বাস করেন তাঁহার নিকট সকলই সত্য যিনি বিশ্বাস না করেন তাঁহার কাছে আর সত্য কি থাকিবে?

কামদগিরির পরিক্রমা পথে ভরতমিলন স্থানের পরেই আমরা লক্ষ্মণ পাহাড়ীতে গমন করিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঐ সময়েই পর্ব্বতে আরোহণ করি। পর্ব্বতের উপরে এখন মন্দির হইয়াছে এবং ভগবানের বিগ্রহ আছে। লক্ষ্মণগিরির যে দিক্ কামদগিরির দিকে তাহারই এক কোণে একটি উচ্চস্থান। সেই স্থানের উপর একটি ধনুকের রেখা ও পদচিহ্ন। এই পদ সেই মহাপুরুষের যিনি শ্রীসীতারামের সেবা জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ রাত্রিকালে এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কামদগিরি স্থিত শ্রীভগবানের কুটীরের দিকে চাহিয়া থাকেন। কোন বন্য জন্তু বা রাক্ষসাদি যাহাতে তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদন না করিতে পারে এই মহাপুরুষ সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া তাহাই দেখিতেন। এই স্থানে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শতবার সেই চরণে লুণ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করে।

পরিক্রমার চারিধারেই মন্দির। আমরা পরিক্রমা শেষ করিয়া রাত্রি ৯ টার সময় মন্দাকিনীতে আসিলাম। রামঘাটে সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

শনিবারে আমরা প্রমোদ কানন, জানকী কুণ্ড ইত্যাদি দর্শন করিলাম। এই সব স্থান এতই সাধনার অনুকূল যে একবার দেখিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না। কত সাধু এখানে তপস্যার জন্য বাস করিতেছেন।

রবিবারে আবার বৃষ্টি হইতে লাগিল, আমরা সে দিন বিশ্রাম করিলাম। সোমবারে আমরা প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়া যাত্রায় বাহির হইলাম। ভরত মিলনের পরে যখন অযোধ্যার লোকজনের গতাগতি হইতে লাগিল, তখন শ্রীভগবান্ যে পথে দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন, আমরা সেই পথে চলিলাম। চিত্রকূটের কিঞ্চিৎ দূরে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা। শ্রীভগবান্ সেই পর্ব্বতের উপরে উপরে গমন করিয়া দণ্ডকারণ্যে গিয়াছিলেন। ঐ যাত্রায় আমরা পর্ব্বতের উপরে কোটিতীর্থ, দিব্যাঙ্গনা, শ্রীজানকীর রন্ধনশালা এবং হনুমান-ধারা পর্য্যন্ত গমন করি। এ সমস্ত স্থান এতই রমণীয় যে ইহা বর্ণনা করিতে গেলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। স্থানাভাব জন্য আমরা এইখানেই শেষ করিলাম।

জানকী কুণ্ড হইতে অনুসূয়া ৪ ক্রোশ। এখান হইতে ৫ ক্রোশ দূরে শরভঙ্গ আশ্রম। তথা হইতে ৪০০ ১০০ ক্রোশ মধ্যে নাশক পঞ্চবটী। যিনি গিয়াছেন তিনিই জানিতে পারিবেন এই সমস্ত কত সুন্দর!

আমরা উপসংহারে বলি, শ্রীরামতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি কোন সাধক এই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন, তবে তাঁহার তীর্থদর্শন কখনও বিফল হয় না। আজকাল চিত্রকূটে থাকিবার স্থানও অনেক হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য অবশ্যই বিলাসিতা-বর্জ্জিত। জীবনধারণোপযোগী সমস্তই পাওয়া যায়। তপস্যা করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের খাদ্যের জন্য কোন অসুবিধা হইবে না।

আর এক কথা বলি, তীর্থদর্শনে শাস্ত্র বলেন স্থূল স্থূল পাপের ক্ষয় হয়। তীর্থদর্শনে যদি ভগবৎ-বিশ্বাস বাড়িয়া না যায়, তীর্থদর্শনে যদি ভগবৎ-অনুরাগ না বর্দ্ধিত হয় তবে সে তীর্থ ভ্রমণে ফল কি?

তীর্থদর্শনে যখন ভগবৎ-অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তীর্থদর্শনে যখন ভগবৎ-বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন বল দেখি কাম, ক্রোধ, লোভাদি নরকদ্বার আর

কি বিভীষিকা দেখাইতে পারে? বলনা—স্থূল তীর্থ তোমাকে মানসতীর্থে পৌঁছিয়া দেয় কি না?

একবার পুণ্যস্থান সমস্ত দর্শন করিয়া আসিয়া মনে মনে প্রধান প্রধান স্থানে পরিভ্রমণ করিলে সহজেই চিত্ত শান্ত হয়। স্থূল শরীরকে তীর্থে ফিরাইলে যে ফল হয়, সূক্ষ্ম মনকে প্রত্যহ তীর্থ দেখাইলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইবেই। মন অসম্বদ্ধ প্রলাপ ত্যাগ করিয়া শান্ত হইলেই, উহা পরমানন্দপ্রাপ্তির উপযোগী হইল।

সৃষ্টি-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এই যে সীতারামতত্ত্ব ভগবান ব্যাসদেব প্রকাশ করিলেন ইহা জানিলে আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হইবে?

হইবে যদি এই তত্ত্ব বুঝিয়া আপনার সহিত এই তত্ত্বটি মিলাইয়া লওয়া যায়।

কিরূপে?

শ্রবণ কর। সৃষ্টিরহস্য মধ্যে তোমারও সৃষ্টিরহস্য রহিয়াছে। রাম-সীতা বা প্রকৃতিপুরুষ হইতে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সেইরূপ তুমিও পুরুষ-প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট।

সীতারাম যেমন শক্তি ও শক্তিমান মিলিত অবস্থা তুমিও সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান জড়িত মূর্ত্তি। তোমার শক্তিটি যিনি তিনি তোমার শক্তিমানকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। তোমার নাম রূপ বিশিষ্ট এই মূর্ত্তিই তোমার প্রকৃতি। আর তোমার শক্তিমান যিনি তিনি শক্তির পূর্ণাবস্থা হইয়াও আরও কিছু। তোমার সমস্ত শক্তি—তোমার শক্তিমানের একদেশে ভাসিয়া পূর্ণ শক্তিমানকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়াছে। তাহাতেই তুমি দেহ বিশিষ্ট হইয়াছ। শক্তিই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন আর তোমাতে তাহা আরোপ হইতেছে মাত্র। "তুমি কিন্তু স্বরূপতঃ যাহা তাহা নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্। এখন এই শক্তিতে অভিমান না করিয়া যদি তুমি সর্ব্বদা শক্তিমানে অভিমান করিয়া

স্থিতিলাভ করিতে পার, তুমি শক্তি নও তুমি শক্তিমান এই ভাবনায় যদি তুমি স্থিতিলাভ ক রতে পার তবে তুমি আপন স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে। এই স্বস্বরূপে স্থিতিলাভের এক উপায় যোগ।

যোগ কি ?

যোগ শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ

সমস্ত চিত্তবৃ'ত্ত 'নরোধ কর তুমি প্রকৃতি হইতে যে পৃথক্ তাহা দেখিতে পাইবে ?

যোগ করিলে কি হয় ?

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্।

যোগসিদ্ধ করিতে পারিলে দ্রষ্টুর স্বরূপে বানিঃসঙ্গ দ্রষ্টা- রূপে স্থিতিলাভ কারতে পা'রবে। ইহাই শক্তি হইতে শক্তিমানকে পৃথক্ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করা। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে চির'স্থতি। বুঝিলে—সৃষ্টিরহস্য বুঝিলে কিরূপে আত্মরহস্য বুঝা যায় ? বুঝিলে কিরূপে ইহাই মুক্তি ? যদি বোঝা হইয়া থাকে তবে শাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বনে কর্ম্ম করিয়া ঐ অবস্থা লাভ কর। ইহাই জীবের কর্ত্তব্য। যাহারা ইহার অধিকারী হইতে পারিতেছে না তাহাদিগকে শাস্ত্রমত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দাও। ক্রমে চিত্তশুদ্ধি করিয়া ইহারা সর্ব্বদুঃখ 'নবৃত্তি করিতে পারিবে।

নতুবা সমস্ত জীবন ধরিয়া পুস্তক লিখিবে আর মরিবার সময় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিবে ইহাতে তোমার উদ্ধার হইল কৈ ? তোমার জগতের উদ্ধারই বা হইল কিরূপে ?

প্রাচীন সাহিত্য ইহাই শিক্ষা দিতেছেন তোমার আধুনিক সাহিত্য কি এই উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে ?

অধিক কি !

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

সংসার-মায়া—গাধি-ব্রাহ্মণ।

১। সুন্দর পর্ব্বতের পার্শ্বে সুন্দর আশ্রম। চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ। বৃক্ষে বৃক্ষে নানা প্রকার ফল ফুল। ফুলে ফুলে নানাবর্ণের প্রজাপতি। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবিধ ফল পাইয়া নানাবিধ বিহঙ্গম কাকলি করিত। নানাবর্ণের হরিণ বনভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। আশ্রমের নিকটে খেলা করিত। ময়ূর আসিয়া নৃত্য করিত। আশ্রমটি বড়ই সুন্দর। আশ্রমের নিকটেই প্রফুল্ল কমলশোভী এক সরোবর। সরোবরের জলপান করিতে কত বন্য জন্তু আসিত। সরোবরে স্নান করিতে কত পক্ষী আসিত। কোশল নামে জনপদে এই ঘটনা।

২। গাধি ব্রাহ্মণ বাল্যকাল হইতে বিরাগী। পিতামাতা বহুদিন হইল গত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন নাই; একা আশ্রমে তপস্যা করেন।

৩। ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া ডাকিয়া থাকেন। কাতর প্রাণের ডাকে শ্রীভগবান্ ঐ হইয়া দেখা দিলেন। তপস্যা-তপ্ত ব্রাহ্মণ প্রার্থনা জানাইল—ভগবান্, সংসার-মায়া কিরূপ তাহাই দেখিতে ইচ্ছা। দেখিতে পাইবে এবং মায়া হইতে উদ্ধারও পাইবে, বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। সেই অরণ্যে ব্রাহ্মণ কতিপয় দিবস আবার তপস্যা করিলেন। ব্রাহ্মণ, মানসবধ্যে, অতীত ও ও অনাগত বিষয় বিষ্ণুর আদেশানুসারে চিন্তা করেন।

৪। ব্রাহ্মণ একদিন সকুশ করদ্বয় দ্বারা জল ভাগ আবর্ত্ত করতঃ, সরোবরের জলে ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছেন। অতি অল্পকাল জলে ডুবিয়া থাকিতে হয়। মন্ত্রজপের জন্য জলে ডুবিয়াছেন। মন্ত্র ভুল হইয়া গেল। ঐ অত্যল্প-কালের মধ্যেই ব্রাহ্মণ বহু অবস্থায় পতিত হইতে লাগিলেন।

৫। গাধি ব্রাহ্মণ জলমধ্য হইতেই দেখিলেন যেন নিজভবনে মৃত হইয়া নিশ্চলভাবে পতিত আছেন। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল রসশূন্য ও মলিন। বায়ুশূন্য হওয়ায় গণ্ডস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শবীভূত সেই দেহে নয়নদ্বয় কপালে উঠিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় অলম্ব। শুভ্রদশনাবলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে যেন আত্মজীবন লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিতেছে। যেন বলিতেছে—এই অসার ক্ষণস্থায়ী রক্তমাংসের সমষ্টি এই জঘন্য দেহ, আবার আমাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিল? আমি ছিলাম বলিয়াই ইহার সৌষ্ঠব ছিল,—আমি চলিয়া যাইতে না যাইতে দেখ ইহার কি বিষম আকার হইয়াছে? আমি চলিয়া যাইতেছি, আর দেখ শরীরটা কিরূপ ক্লেশ করিতেছে?

৬। গাধি দেখিলেন, আত্মীয়বর্গ দীনভাবে চারিদিকে কুররীপক্ষীর দলের ন্যায় উপবেশন করিয়া চীৎকার করিতেছে। মাতা, গাধির চিবুক ধরিয়া রোদন করিতেছেন। ভার্য্যা, সেতুভঙ্গ হইলে জলাশয়ের জল যেমন বাহির হইলে আকণ্ঠ-সলিলমগ্না নলিনী অবনতমুখী হয়, সেইরূপ অবনতমুখী হইয়া তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্টা। গাধি যেন বান্ধবদিগের কাহার কিরূপ স্নেহ ইহা বিচার করিবার জন্য মৌন হইয়া রহিয়াছেন।

৭। সকলে নিরুপায় হইয়া তাঁহার মৃতদেহ বাড়ী হইতে বাহির করিতে লাগিল। মাতা, ভারবাহী ঘোটকীর ন্যায় ভূমে পড়িয়া কাতরভাবে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর পরিজনেরা মাংসনাড়ীবসা-কর্দ্দমময় ভীষণ শ্মশানে মৃতদেহ আনয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে দেহ, চিতার উপর স্থাপিত হইল। চিতামধ্যে অগ্নি প্রদত্ত হইল। ক্ষণকালমধ্যে ঐ দেহ ভস্মাবশেষ হইল।

৮। গাধি ব্রাহ্মণ জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতেছেন তাঁহার আত্মা ভূতমণ্ডল নামক এক জনপদের প্রান্তসীমাবাসী এক চণ্ডালীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সেই সুকুমার আত্মা, গর্ভবাস নিবন্ধন যন্ত্রণায় সাতিশয় পীড়িত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

২

সংসার-মায়ায় গাধির চণ্ডালত্ব।

১। চণ্ডালী কালক্রমে এক সন্তান প্রসব করিল। চণ্ডালীগর্ভে জন্মিয়া গাধির আত্মা, চণ্ডালগণের প্রিয়শিশু হইয়া উঠিল। ষোড়শবর্ষ বয়সে চণ্ডাল-শিশু কুক্কুরসঙ্গে বিচরণ করিয়া শত শত মৃগবধ করিত। ক্রমে এক চণ্ডাল-বালিকার সহিত গাধির বিবাহ হইল। ক্রমে চণ্ডালরূপী গাধির কতিপয় পুত্রকন্যা জন্মিল। গাধিচণ্ডাল এক গৃহস্থ হইয়া উঠিল।

২। দেখিতে দেখিতে জরা আসিয়া পড়িল। গাধিচণ্ডাল জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। চণ্ডাল অতিশয় ক্রূর। বহু জীবহিংসা করিত। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, গাধিচণ্ডালের স্ত্রীপুত্রকন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গাধিচণ্ডাল কতই কাঁদিল। শেষে দুঃখিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে, কীরজনপদে এক সুন্দর পুরীতে সে আসিল।

৩। গাধিচণ্ডাল দেখিল ঐ দেশের পথিমধ্যে বিবিধ মণিরত্নভূষিত এক মঙ্গলহস্তী বিচরণ করিতেছে। ঐ দেশে রাজা ছিল না। মঙ্গলহস্তী যাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইবে সেই রাজা হইবে—ইহাই ঐ দেশের নিয়ম।

৪। গাধি পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। ক্রমে হস্তী গাধির নিকটে আসিল। আসিয়া গাধিচণ্ডালকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। ঐ রাজ্যের লোক তখন গাধিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। সে যে চণ্ডাল ইহা কেহই জানিল না।

৫। গাধি রাজা হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিল। ক্রমে গাধি রাজভোগে নিজের চণ্ডালত্ব ভুলিল। অন্তঃপুরচারিণী রাণীগণের সেবায় গাধির নূতন জীবন হইল। নাম হইল গবল রাজা।

৬। আট বৎসর হইয়া গেল। গবল রাজার রাজত্বে সকলে আনন্দে রহিয়াছে। রাজা একদিন যদৃচ্ছাক্রমে গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া শূন্যদেহে অবস্থান করিতেছিলেন। অলঙ্কার, বেশভূষার প্রতি তাঁহার বিরক্তি আসিয়াছে।

৭। গবল ঐ ভাবেই রাজপুরীর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়াছেন। একদল স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ চণ্ডাল, বাহিরে বীণাবাদন করিয়া গান

করিতেছিল। সেই চণ্ডালগণ রাজাকে কটঙ্গ বলিয়া সম্বোধন করিল। আর রাজকামিনীগণ বাতায়ন-পথে তাহাই দেখিতেছিলেন।

৮। চণ্ডালগণ বলিল, ওহে কটঙ্গ! এই দেশের রাজা ত তোমাকে বসন ভূষণ দিয়া আপ্যায়িত করেন? রাজা চণ্ডালদিগের কথা অমান্য করিলেন। কিন্তু রাজকামিনীগণ রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া সন্দেহ করিলেন। ক্রমে সেই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

৯। মন্ত্রীগণ, রাজনারীগণ ও নগরবাসীগণ চণ্ডাল-অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মহীপতিকে শবের ন্যায় আর স্পর্শ করিলেন না। রাজভৃত্য রাজা হইতে দূরে দূরে রহিতে লাগিল।

১০। ক্রমে রাজ্য নিরানন্দময় হইয়া গেল। মহাপাপ হইয়াছে মনে করিয়া, স্ত্রী-পুরুষ সকলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে মনস্থ করিল। নগরব্যাপী এক চিতা প্রস্তুত হইল। বহুলোক প্রজ্বলিত অনলরাশিমধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল।

১১। রাজার প্রাণে নিদারুণ যাতনা। তাঁহার জন্যই প্রজাবর্গ প্রাণত্যাগ করিতেছে ভাবিয়া, রাজা অগ্নিকুণ্ডে সেই গবল নামক দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

৩

গাধি ব্রাহ্মণের জলমধ্য হইতে উত্থান।

১। জলমধ্যস্থিত গাধি ব্রাহ্মণ অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতেই স্বীয় অঙ্গদাহ অনুভব করতঃ বোধপ্রাপ্ত হইলেন।

২। জল হইতে উঠিয়া গাধি ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ আমি কি দেখিলাম? আপন চিত্ত শান্ত করিবার জন্য গাধি আপন স্বরূপ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আমি সেই গাধি, এই আমি জলমধ্যে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছিলাম্। আমি চণ্ডাল হই নাই। গাধি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

৩। নিজ স্বরূপ স্মরণ করিয়া গাধি, তীরে উঠিলেন; কিন্তু তিনি সকল বস্তুকে অসৎরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। মনে মনে আবার স্মরণ করিতে লাগিলেন, আমি কে? কি দেখিতেছি? এ যাবৎ আমি কি করিলাম? আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই জন্য এই ভ্রম দেখিতেছি।

৪। গাধি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি মাতা ও পত্নীর সম্মুখে মৃত হইলাম। কিন্তু আমার মাতা ও পত্নী কোথায়? শৈশবেই আমার

মাতাপিতা মৃত। আমি চির-অবিবাহিত। ব্রাহ্মণের মদিরাস্বাদনের ন্যায় রমণীর আস্বাদ আমি একবারেই জানি না। আমি গন্ধর্ব্বনগরবৎ তবে একি দেখিলাম? ইহা আমার ভ্রম। ইহা কোন মায়া।

৫। তথাপি আমি বিশেষ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। উন্মত্ত শার্দ্দূল যেমন গভীর অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, দেহীদিগের চিত্তও সেইরূপ এই প্রকার ভ্রান্তদৃষ্টিতে ভ্রমণ করে। এই সমস্তই চিত্তের ব্যামোহ। গাধি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কিছুদিন আপন আশ্রমে বাস করিলেন।

৪

গাধি ব্রাহ্মণের নূতন ঘটনা।

১। গাধি আপন আশ্রমে বাস করিতেছেন। একদিন অন্য এক ব্রাহ্মণ গাধির অতিথি হইয়া আসিলেন। গাধি যত্নপূর্ব্বক অতিথির সেবা করিলেন। সে রাত্রি অতিথি ও গাধি, সন্ধ্যোপাসনা ও জপাদি সমাপনান্তে একত্রে কোমল পল্লবশয়নে শয়ন করিলেন।

২। তপস্বীদ্বয় তপস্যা সম্বন্ধে বহু আলাপ করিলেন। শেষে গাধি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগ! আপনি এত কৃশ কেন? কেনই বা আপনাকে এত পরিভ্রান্ত বোধ হইতেছে?

৩। অতিথি বলিতে লাগিলেন, আমি কীরদেশে এক মাস ছিলাম। অকস্মাৎ একদিন শুনিলাম, আজ আট বৎসর এই দেশে এক চণ্ডাল রাজত্ব করিতেছিল। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কথা সত্য। রাজার চণ্ডালত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িলে, রাজা হুতাশনে দেহত্যাগ করেন। রাজ্যের বহুলোক পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন। আমিও প্রয়াগে গিয়া পাপশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করি। তৃতীয় মাসের পর পারণ করিয়া, এই অন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।

৪। সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে অতিথি প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৫। গাধি আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। ভাবিলেন ইহাও কি মায়া? আমি বন্ধুজনের মধ্যে যে মরিয়াছিলাম ইহা ত নিশ্চয়ই মায়া। কিন্তু আমার চণ্ডালত্বের ব্যাপারটা কিরূপ তাহা একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

৬। গাধি ভূতমণ্ডল গ্রামে আসিলেন। গ্রামের চতুঃসীমা দেখিয়া বিস্মিত

হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, নরকরাশির ন্যায় গান্ধি সেই চণ্ডালপল্লীকে সেইরূপ দেখিলেন। চণ্ডালজন্মের সমস্ত চিহ্ন সেখানে বিদ্যমান দেখিলেন।

৭। পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানসকল দেখিয়া গান্ধির বৈরাগ্য জন্মিল। সেই ভগ্ন বাসগৃহ, গৃহভিত্তিতে যবাঙ্কুর, পানপাত্র স্বরূপ খর্পর, গৃহের চালের অর্দ্ধভাগ পতিত, সেই মাদুরের ছিন্নার্দ্ধ—এই সমস্ত পূর্ব্ববৎ দেখিয়া গান্ধি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। ভিতরে ঘৃণা, আত্মগ্লানি, অদৃষ্টনিন্দা-প্রবাহ ক্রমে চলিতে লাগিল। তত্ত্ববিৎ গান্ধি, শুষ্ক শবপ্রায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রাক্তন আত্মভবন দেখিতে লাগিলেন।

৮। গান্ধি তখন এক লোকালয়ে গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ গৃহে যে চণ্ডাল বাস করিত, তাহার কথা কি তাহার মনে আছে?"

৯। গ্রামবাসী বলিল ঐ চণ্ডালের নাম কটঙ্ক। তাহার পুত্র পৌত্রাদি মৃত হইলে, সে কীরদেশের রাজা হইয়া আট বৎসর অতিবাহিত করে। পরে তাহার চণ্ডালত্ব চারিদিকে প্রচার হইলে, সে বহু লজ্জার সহিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন দেয়। ব্রাহ্মণ আপনি, এত আগ্রহ করিয়া উহার কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? সে কি আপনার কেহ হয়?

১০। গান্ধি এক মাস ঐ গ্রামে বাস করিয়া, স্বপ্নানুভূত ঘটনাগুলি দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া লইলেন। মায়া-কৌশল করিয়া মিথ্যাকে সত্যবোধ করাইয়া দিতে লাগিল।

৫

গান্ধির কীরদেশে গমন।

১। গান্ধির দুঃখের সীমা নাই। চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানগুলি দর্শন করেন। যেখানে গৃহভিত্তিতে গজদন্ত প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেখানে সুরাপানমত্ত চণ্ডালবন্ধুদিগের সহিত বানরীমাংস পাক করিয়াছিলেন, যেখানে গজমদতিক্তীকৃত সুরাপান করিয়া চণ্ডালীকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহচর্ম্মে শয়ন করিতেন, যেখানে কুক্কুরগণ ভিত্তি-প্রোথিত গজদন্ত-স্তম্ভে চর্ম্মদ্বারা বাঁধা থাকিত—একে একে গান্ধি সমস্ত দেখিয়া উন্মাদের মত হইলেন। শেষে কিছুদিন পরে ভূতমণ্ডল গ্রাম ছাড়িয়া, হিমালয়ের উপর সেই কীরদেশে গমন করিলেন।

২। এখানেও সেই সমস্ত। সেই রাজধানী, সেই অট্টালিকা, সেই

উদ্যান, সেই সরোবর। গাধি, সেখানকার লোককে চণ্ডালরাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রামবাসীগণ মঙ্গলহস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া, গগন রাজার অগ্নিপ্রবেশের কথা সমস্তই বলিল। আরও বলিল, সে ঘটনা বার বৎসর হইল হইয়া গিয়াছে।

৩। গাধি সেই দেশে থাকিতে থাকিতে বিষ্ণুকে রাজা হইয়া মন্দির হইতে বাহির হইতে দেখিলেন। সমস্ত ঘটনা গাধি স্মরণ করিলেন এবং সত্য দেখিলেন। ইহা সমস্তই স্বপ্ন। কোথা হইতে এই মায়া আসিল? আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি চারিদিকে ভ্রান্তিই দেখিতেছি। চক্রধারী বিষ্ণু আমাকে মায়া দেখাইয়াছেন ইহা আমার মনে হইতেছে। আমি গিরিগুহায় থাকিয়া যাহাতে মায়ার জন্ম ও স্থিতি জানিতে পারি তাহার যত্ন করিব।

৪। হায়! মায়া কতই দুরত্যয়া। এই মায়াকে কে তাড়াইতে পারে? কে ইঁহারে জয় করিতে পারে? রামরাবণের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যখন মায়াতে সীতাকে দ্বিখণ্ড করিয়া দেখাইয়াছিল, তখন অন্যের কথা দূরে থাক মায়াস্তকারী সাক্ষাৎ রুদ্ররূপী শ্রীমহাবীর পর্য্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। দশানন যখন শ্রীজানকীকে বশ করিতে না পারিয়া শ্রীভগবানের কাটামুণ্ড দেখাইয়াছিল, তখন সাক্ষাৎ মায়াস্বরূপিণী শ্রীসীতা আপনার মায়ায় আপনি ভুলিয়াছিলেন। সাধারণ মানব কি করিবে? মনই যে তাহাদের মায়া। কোথাও কিছু নাই, এই মন কত মায়া তুলিতেছে, আর মানুষ কতই ভ্রম দেখিতেছে—এই মন বশ করিবে কে? সেই জন্য মায়া অতিক্রম করিবার কৌশল, মন বশ করিবার কৌশল শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে" আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে থাক; আমার নাম লইয়া, আমার কথা স্মরণ করিয়া, মনের তরঙ্গসমূহে স্থির থাকিয়া, নামের হাল ধরিয়া থাক; আমিই তোমাকে মায়া অতিক্রম করাইয়া দিব।

৫। গাধি গিরিগুহায় গমন করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে প্রীত করিবার জন্য গণ্ডূষ মাত্র জল পান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মায়া একদিকে চণ্ডালত্বের ঘটনা সত্যবৎ দেখাইয়া ব্যাকুল করিতেছে; কখন কখন চণ্ডালত্ব স্বপ্ন বলিয়া আবার চণ্ডালপল্লী দেখাইয়া দিয়া ভ্রম দৃঢ় করিতেছে; অন্যদিকে গাধি নিতান্ত কাতর হইয়া মায়া বুঝিবার জন্য শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতেছেন। ইহাই সাধনা। গাধি এক বৎসর ধরিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিলেন।

৬। গাধির উগ্র তপস্যায় শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। শূন্যে থাকিয়াই শ্রীভগবান্ দেখা দিলেন। গাধি কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমার বাসনাদিষ্ট মন স্বপ্নে যাহা দর্শন করিল, আমি জাগ্রত হইয়াও তাহা ঠিক ঠিক দেখিতেছি কেন? জলমধ্যে এক মুহূর্ত্তে যে স্বপ্ন-ভ্রম উপলব্ধি করিলাম, তাহা আবার প্রত্যক্ষগোচর করিলাম কেন?

৭। ভগবান্ কহিলেন—গাধে! জগদ্রূপী মহাভ্রম যাহা দেখিতেছ, তাহা বাসনাযোগাক্রান্ত চিত্তভাবাক্রান্ত আত্মস্বরূপেরই রূপ। সমস্তই চিত্ত-মধ্যে। সেই অতিথি, সেই চণ্ডালগণ, সেই কীরবাসীগণ, সেই ভূতমণ্ডল গ্রাম এই সমস্তই ভ্রম—সমস্তই মোহ। তুমি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করতঃ মনে মনেই উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় এই বিভ্রম দৃষ্টিগোচর করিয়া থাক। এখন উঠ, নিজ কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ভিন্ন শ্রেয়ঃলাভ হইবে না। চিন্তাকে অনাস্থা করিয়া ঘন ঘন নাম করিয়া যাও। না পারিলে চুপ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে মায়া-চণ্ডীর প্রচণ্ড নৃত্য দেখিতে থাক। আমিই তোমাকে শান্ত করিয়া দিব, বিষ্ণু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

৬

গাধির শেষ কথা।

১। বিষ্ণু চলিয়া গেলেন। গাধি নিজে মোহ-বিষয় বিচার করিবার জন্য আবার ভূতমণ্ডলে আকাশে মেঘভ্রমণের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

২। কোথাও কিছু নাই বলা হয়, মনে কর এইখানে এক গোল পুষ্করিণী, তাহার মধ্যে বটবৃক্ষ। বৃক্ষের ছায়া পুষ্করিণীকে ছায়াময়ী করিয়াছে। ইহা সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু তুমি এই মিথ্যা ত্যাগ কর। ত্যাগ করিয়া আমায় বলিও। ত্যাগ করিয়া আসিয়া যদি সংবাদ না দাও, তবে আমি তোমায় অভিসম্পাত করিব। এই যে মিথ্যা, এই মিথ্যাকেও যেমন ত্যাগ করা যায় না—মায়ারও ব্যাপার সেইরূপ। গাধি যাহাকে মিথ্যা বলিতেন—তাহাই পুনঃ পুনঃ দর্শনে মায়ারই কার্য্য করিতে লাগিলেন।

৩। এই উপায়ে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে না পারিয়া, গাধি আবার গিরি-কন্দরে ফিরিয়া আসিয়া, হরির আদেশমত তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

৪। অল্পকাল-মধ্যে আবার জনার্দ্দন দেখা দিলেন। একবার আরাধনা করিলেই বিষ্ণু বশ্য হইয়া থাকেন। জলধর যেমন গর্জ্জন করিয়া মযূরের সঙ্গে

কথা কয়—শ্রীভগবান্ গাধিকে পুনরায় বলিলেন, গাধে! পুনরায় তপস্যা দ্বারা তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ?

৫। দেব! আমি পুনরায় সেই ভূতমণ্ডলে ও কীরদেশে ছয়মাস ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে ত পারিলাম না। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম—এবারেও তাহাই দেখিলাম, তাহাই শুনিলাম। প্রভু! তবে কেন তুমি বলিতেছ সমস্তই মিথ্যা? তোমার বাক্যে আমার মোহনাশ না হইয়া, বাড়িয়াই যাইতেছে।

৬। তখনও গাধির কালপূর্ণ হয় নাই। ভগবান্ বলিলেন, চিত্তমধ্যে কতকগুলি ঘটনা প্রবাহিত করিয়া দিলে, ঐ ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক, তাহা সত্য মত প্রতিভাত হয়। একজনের চিত্তে যে ভ্রম ঘটে, বহুজনের চিত্তে সেইরূপ হইতে পারে। জগদ্দর্শনটাও ঐরূপ ভ্রম মাত্র। বহুজনের চিত্তে ঐ এক ভ্রম আছে, তাই সকলে একরূপ ভ্রম দেখিতেছে। তুমি সংসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া "আমি কে" এই ধ্যান কর। প্রথম প্রথম চিত্ত সঙ্কল্প তুলুক বা না তুলুক, তুমি চিত্তকে ও চিত্তসঙ্কল্পকে মিথ্যা ভাবিয়া দ্রষ্টারূপে অবস্থান কর। এই শান্তভাবে থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিবে—তুমি সেই হৃদয়শায়ী পুরুষ—যিনি এই "নবদ্বারপুরে দেহে নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" ভাবে শান্ত হইয়া অবস্থিত। তুমি সর্ব্বসঙ্কল্প, সর্ব্বচিন্তা দিয়াই আমার পূজা কর। চিন্তা উঠিলেই বল—প্রভু এই চিন্তা উঠিতেছে, আমি সুন্দর সুন্দর বস্তু দিয়া তোমাকে পূজা করিতে পারিলাম না; আমার স্বকীয় বস্তু এই সমস্ত সঙ্কল্প; আমি ইহাই তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তোমাকে যাহা দিলাম, তাহা তোমার নিকটেই গিয়াছে, আমার আর কোন কিছু নাই; আমি শান্ত হইয়া রহিলাম। তুমি এইভাবে সর্ব্বসঙ্কল্প আমাতে অর্পণ করিয়া আত্মদেবের পূজা করিয়া পরম শান্তভাবে ধ্যানস্থ হও। শ্রীভগবান্ এই উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

৭। গাধি আবার কতদিন গিরিকন্দরে তপস্যা করিলেন, তথাপি ভ্রম দূর হইল না। তিনি আবার শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন এবং দুঃখ জানাইলেন।

৮। গাধির সময় পূর্ণ হইল। শ্রীভগবান্ এবারে আগমন করিয়া গাধির মায়া দূর করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন;—

গাধে! তুমি মায়া দেখিতে চাহিয়াছিলে, সেই জন্য মৎসঙ্কল্পবশে আমি

তোমার চিত্তে চণ্ডালসংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলাম। ভূতমণ্ডলগ্রামে পূর্ব্বে কটঙ্কক নামে এক চণ্ডাল তোমার চিন্তিত শরীর ও গৃহদারাদি প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ চণ্ডালই কীরদেশে রাজা হয় এবং হুতাশনে দেহত্যাগ করে। তুমি এখন যাহা চিত্তে প্রবাহিত দেখিলে, আমি তাহাকেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত করিয়া মায়াবলে উৎপন্ন করিয়া দিলাম। অতীত ঘটনা হইলেও এই কটঙ্ক-বৃত্তান্ত তোমার চিত্তে বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হইল। তোমার চিত্তে যে ঘটনা উদয় করাইব, তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তিত বিষয় লইয়া আমি পূর্ব্বে ঐ ঘটনাগুলি ঘটাইয়া রাখিলাম। কাজেই তোমার চিত্ত যে সমস্ত প্রবাহ মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল, তুমি স্থূলশরীরে তাহার কিছু না করিলেও সূক্ষ্মদেহে সমস্ত করিলে, এবং কটঙ্ক চণ্ডালও পূর্ব্বে তাহাই করিয়াছিল; কাজেই তুমি সূক্ষ্মদেহে যাহা ভোগ করিলে, পূর্ব্বে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া তোমার এখনকার চিন্তিত ব্যক্তি তাহা করিয়া গিয়াছে। কাজেই তোমার সমস্ত বিষয় সত্য বলিয়া মনে হইল।

চিত্তই মায়াচক্রের নাভি, মায়াচক্র প্রবলবেগে ঘুরিতেছে। এই চিত্তরূপ মায়াচক্রের মধ্যভাগকে যদি আক্রমণ করিয়া থাকিতে পার, তবে মায়াচক্র আর তোমাকে ঘুরাইতে পারিবে না।

এখন তুমি বৈরাগ্যবশে সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত কর্ম্ম, আমাতে অর্পণ করিয়া সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ কর, করিয়া তপস্যা কর; তুমি পরমপদে চিরবিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিবে।

গাধি দশবৎসর জম্বুবৃক্ষ পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

গাধির উপসংহার।

১। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জান। মিথ্যা কি? সমস্তই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই সত্য। চেতনই সত্য, জড় মিথ্যা। ইহার বিচার কর?

২। জগৎ যাহাই হউক তুমি ইহার সম্বন্ধে যাহা চিন্তা কর, তাহাই ত কল্পনা? কল্পনাটা চিত্তস্পন্দন মাত্র। চিত্ত স্পন্দনশূন্য কর, সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তুমি আত্মসংস্থ হইয়া শান্তভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করিবে।

৩। কিছুদিন ধরিয়া বিচার কর সত্য কি? মিথ্যা কি?

কল্পনাটা মিথ্যা। তমসসঙ্কল্প লইয়া থাক, তুমি কীট পতঙ্গাদি হইয়া যাইবে। রজসসঙ্কল্প লইয়া থাক, আবার মানুষ-জন্ম হইবে। সত্ত্ব সঙ্কল্প কর, মোক্ষ-সাম্রাজ্য তোমার অদূরে। এই সমস্ত কল্পনা ত্যাগ কর, এই জীবনেই মুক্তি। সঙ্কল্পটা মায়া,—মিথ্যা।

অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্মফলত্যাগ।

নাম অভ্যাস অপেক্ষা নামের জ্ঞান ভাল; নামের জ্ঞান অপেক্ষা নাম লইয়া ধ্যান ভাল; অজ্ঞান পূর্ব্বক ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতি জন্য কর্ম্ম করা ভাল।

১। চিত্ত যখন সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য হইয়া পরমপদে সমাহিত হয়, তখন সমাধি।

২। চিত্ত যখন এই স্পর্শ করিলাম ভাবনা করে, তখন ধ্যান।

৩। চিত্ত যখন ধ্যান না পারে, তখন ইহাকে মানসে যে ফুলতোলা, মালা-গাঁথা ইত্যাদি ঈশ্বরভক্তিবর্দ্ধক কর্ম্ম করান তাহার নাম মৎকর্ম্ম-পরম হওয়া। শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং—অভ্যাসযোগে ইহার সাধনা করিবে।

৪। চিত্ত যখন নিজের সঙ্কল্পসমূহকে, উহারা যেমন যেমন উঠে তেমনি তেমনি তাহাদিগকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে, করিয়া আবার শান্ত হইয়া স্পর্শ করিতেছি এইরূপ ভাবনা করিতে পারে—চিত্তের এই বাসনা-সমর্পণ কার্য্যকে সঙ্কল্পত্যাগ-চেষ্টা বলে, ইহাই মদ্‌যোগ।

৫। চিত্ত যখন ভারি চঞ্চল, তখন নিবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রোজ্জ্বল আমি, প্রবৃত্তিমার্গের বিষয়-দীপিত আমিকে উপদেশ করি—ইহা বৈরাগ্য উদয়ের জন্য করিতে হয়। বৈরাগ্য উদয়ের পরে যখন কর্ম্ম করা যায়, তখন কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াই কর্ম্ম হয়। মদ্‌যোগটি সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগ জন্য। এখানে কর্ম্ম নাই; কিন্তু বৈরাগ্যটিতে কর্ম্ম আছে, কর্ম্মফল নাই।

৬। যখন কোন উপদেশই এই দুরন্ত চিত্ত শুনিতে না চায়, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেও পুনঃ পুনঃ বিষয় চিন্তাতেই ইহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তখন যে বেগে চিত্ত চিন্তা তুলে, আমার আশ্রয়ে থাকিয়া সেই বেগে ইহাকে জপ করাইতে হয়। ইহা যত যতবার ভূত দেখিবে, তত ঘন ঘন রাম নাম ইহাকে করাইতে হইবে। ইহাই জপ। এই জপ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা।

৭। এই জপ সন্ধ্যাপূজায় আছে, এই জপ প্রাণায়ামে আছে, এই জপ কুম্ভক করিয়াও সুন্দর হয়, এই জপ করিতে করিতে ধ্যান অভ্যাস হয়, এই জপ পরম উপকারী। এই নাম্ জপ দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া, চিত্তকে নামে একাগ্র করিলে, নামস্বরূপ যে নামী তাঁহার দর্শন হয়। তিনি একবার দেখা দিলেই বন্ধু হইয়া যান। যখন ডাকা যায়, তখন আসিয়া যাচা করিলে ভাল হয় তাই করিতে বলিয়া যান।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে।

প্রভু! নিবেদি চরণে তবে,
প্রাণের আকুতি ব্যাকত করিব
যা থাকে কপালে হ'বে।
পুরীক্ষেত্র-মাঝে, জগন্নাথ-সাজে,
তোমারে দেখিনু আমি;
বিশাল নয়নে করুণা সাগর,
চাহিয়া রহিলে তুমি।
(আমি) সে মুখ নেহারি অথির হইনু,
নয়নে ঝরিল ধারা;
তুলসী চন্দনে শ্রীপদ পূজিতে
হইনু বাউরি পারা।
না দিল আমায় তিল অবসর,
পূজার সময় হরি;
(আমি) লুটায়ে লুটায়ে কাঁদিলাম কত,
তোমায় স্মরণ করি।
যেখানেই যাই দেখিতে তোমায়,
পশ্চাতে তাড়না কত;
অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা রহিল শ্রীনাথ,
এবার জনম-মত।

বারে বারে নাথ, পাইয়া আঘাত,
শিখেছি লুকাতে আমি ;
লুকাইয়া পূজা হ'লনাত আর
তুমি যে জগতস্বামী।
অগাধ সলিলে কঠিন প্রস্তরে,
চন্দ্রমা সরোজ মাঝে,
গুরুব্রহ্মরূপে বিরাজ ধাতুকী,
অর্দ্ধ-নারীশ্বর সাজে।
প্রকৃতি-জড়িত পুরুষ সুন্দর,
অনাদি গৃহস্থ তুমি ;
(হবে) কাহার বিধানে, কেমনে হইব—
বল হে স্বতন্ত্র আমি।
তবু তুমি আমি এ কোন্ বিচার,
তাইনা যাতনা পাই ;
ঘুচিল না হরি ! বৃথা হাহাকার,
তিন লোকে নাই ঠাঁই।
রূপ রস আদি বিষয়-পরশে,
সজ্ঞানে হারাই জ্ঞান ;
প্রখরা প্রকৃতি কুটিল কটাক্ষে,
ভুলায় তোমার ধ্যান।
ধারণা-অভ্যাস নাহিক আমার,
কি হ'বে হে দীনবন্ধু !
কেমনে যাইব বল বল গুরো !
এ ভব দুস্তর-সিন্ধু !
সমুদ্রকল্লোল অতীব ভীষণ,
অনন্ত তরঙ্গ তায় :
রাম রাম ভরে ভয় জগন্নাথ !
আমারে করহে পার !

ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা।

১। সকলের মধ্যেই সত্যস্বরূপ তুমি আছ। কিন্তু সর্ব্বত্র তুমি ভাস-না, তাই আমি তোমায় দেখিতে পাই না। আমি মূঢ়।

২। বিশ্বাস রাখি তুমি সর্ব্বত্র আছ। তথাপি সর্ব্বকালে সর্ব্ববস্তুতে তোমায় স্মরণ করিতে পারি না। কতবারই ভুলিয়া যাই। আমার কর্ম্ম ভাল ছিল না। তাই তোমায় স্মরণ করিতে না পারিয়া, আমি মিথ্যা তরঙ্গে ভাসিয়া যাই।

৩। মিথ্যাকে মিথ্যা ভাবিতে আমার মনে থাকে না। আমার বিচার সব সময়ে থাকে না বলিয়া ক্লেশ পাই।

৪। আমি কোন্ পথে চলিব? তুমি সর্ব্বত্র আছ ইহাই যখন মনে রাখিতে পারি না, তখন তোমার সন্তোষের জন্য কর্ম্ম আমি করিব কিরূপে? তবে আমার পথ কি?

৫। সত্যস্বরূপ তুমি। তোমার উপর মিথ্যার খেলা হইতেছে। তুমি তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়ার সঙ্গে না জানি কি খেলা খেলিতেছ। আমাকে এই মিথ্যা হইতে রক্ষা কর। আমার আর কেহ নাই। কেহই আমায় রক্ষা করিতে পারে না। আমি তোমার আশ্রয়ে আসিলাম। আমি তোমার হইলাম।

৬। দেখ প্রভু! আমার দুঃখ কি? আমি যখন নির্জ্জনে বসিয়া তোমায় ডাকিতে চেষ্টা করি, তখনও আমি নির্জ্জন পাই না। আমি সর্ব্বদা যেন বহু লোকজনের সঙ্গে কথা কই। আমার চিত্ত একাগ্র হইয়া শুধু তোমায় লইয়া থাকিতে পারে না। আমার চিত্ত সর্ব্বদা পরের কথা লইয়া থাকে। মুখে তোমার নাম করি; কিন্তু চিত্ত, জপকালেও অন্য বস্তু বা ব্যক্তির সহিত নানা কথা কয়।

৭। বল আমি কি করিব? ঠিক পাগলের মত মন এখানে ওখানে ছুটিয়া বেড়ায়। এটা ওটা ধরে। আমি শাসন করিতে গেলেও শাসন মানে না। আমি মনের উপর রাগ করি। মন তাহা গ্রাহ্যই করে না। বল প্রভু! আমার উপায় কি?

৮। আমি কত কষ্ট করিতেছিলাম; তুমি আসিয়া আমায় পরিত্রাণ করিলে? তুমি বলিলে—চিত্ত যাহা করে করুক তুমি চিত্তকে সংসারের হাল দেখাও। বাল্যকাল, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধত্ব যাহা যাহা যেমন যেমন দেখিয়াছ, নিজের হউক বা পরের হউক একবার আলোচনা কর। কত দুঃখ পাইয়াছ তাহাই চিন্তা কর। কতবার কর্ম্ম-চরাচার হইয়াছ ভাব। কতবার কত অঘণ্ড কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছ মনে কর। আর মনে কর মরিতেই ত ছুটিয়াছ। যাহা যাহা করিলে মৃত্যু হয় তাহাই ত করিতেছ। মৃত্যু হইতে রক্ষা যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা ঠিক মত হইতেছে কোথায়?

৯। প্রথমে ভিত্তি দৃঢ় কর। সেই ভিত্তির উপরে ধর্ম্ম-প্রাসাদ তোল। তবে ত ধর্ম্ম সৌধ স্থির থাকিবে। নতুবা ভিত্তি দৃঢ় নহে বলিয়া, সামান্য বাতাসেই তোমার ধর্ম্ম-গৃহ পড়িয়া যাইবে।

১০। বৈরাগ্যই ধর্ম্মের ভিত্তি। বৈরাগ্য নিত্য অভ্যাস করা চাই। প্রত্যহ বৈরাগ্য আলোচনায় যখন মন কাতর হইবে, প্রত্যহ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধত্বের ক্লেশ স্মরণ করাইতে করাইতে যখন মন কাতর হইয়া উঠিবে, স্বামীর মৃত্যু, বা জামাতার মৃত্যু, বা পুত্রের মৃত্যু, বা কন্যার মৃত্যু, স্ত্রীর মৃত্যু, বা পিতামাতার মৃত্যু যাহার ভাগ্যে যাহা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া, মনকে লোকসঙ্গ হইতে, সংসারসঙ্গ হইতে প্রত্যাহার কর, মৃত্যু চিন্তায় ভীত হও, হইয়া তবে ভগবানের আশ্রয়ে যাইস। তখন কাতর হইয়া ভগবানের নাম করিতে পারিবে, তখন ভগবানের নাম করিতে করিতে রস অনুভব করিতে পারিবে। তখন বাহিরের কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেছ স্মরণ করিতে পারিবে। মনই মায়া। মন বশীভূত করিতে হইলে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস কর। করিয়া জপ, ধ্যান, আত্মবিচার এই অন্তরঙ্গ সাধনা কর। বাহিরের কর্ম্ম যতদিন না ছুটিয়া যায়, ততদিন ঈশ্বর-স্মরণ করিয়া লোক সেবা কর।

১২। সংসার সত্য, লোকজন সত্য, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন সত্য, যাত্রা সং সত্য, রঙ্গ তামাসা সত্য, ইহা হইলে শ্রীভগবান্‌কে হারাইয়া ফেলিবে।

১৩। আর সমস্তই ক্ষণিক বলিয়া আস্থার বস্তু নহে। শ্রীভগবান্ সত্য,

তাঁহার নাম সত্য, জপ ধ্যান আত্মবিচার দ্বারা সেই সত্য আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্‌কে লইয়া থাক, তবে থাকিতে পারিবে।

১৪। মিথ্যাকে ভগবানের আত্মমায়া জানিয়া, মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহারপরায়ণ হও। সর্ব্বদা সত্যস্বরূপ ভগবান্ লইয়া থাকিতে চেষ্টা কর। চিত্ত প্রসন্ন হইবে। তখন ভগবৎ কৃপা বুঝিতে পারিবে। ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

১৫। এ দেহও থাকিবে না, এ ধন-জনও থাকিবে না, এ দুঃখও থাকিবে না, এ সুখও থাকিবে না— প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে ডাকিতে থাক; আলস্য, অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া ভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ত্তব্য করিতে পারিবে।

এস দীন দয়াময়।

এস এস বলি ডাকি সকাতরে,
শুনিতে তুমি কি পাওনা?
ব্যথিতের প্রাণ তুমি যে জগতে,
তবে কেন দাও যাতনা!
বড় সাধ মনে একান্তে বসিয়া,
করিব তোমার সাধনা;
আশায় আশায় দেহ হ'ল ক্ষীণ (বুঝি)
অপূর্ণ রহিল কামনা।
গণা দিন গেল দেখিতে দেখিতে
কি হইবে প্রভু! বলনা?
দিবস ঢাকিয়া গভীর আঁধার,
চৌদিকে করিছে ঘোষণা।
এস জ্যোতির্ম্ময় মানস-মন্দিরে,
দূরে থাকা আর সাজে না

সময় থাকিতে এস এস হরি,
তবে ত বুঝিব করুণা।
এস এস বলি ডাকি কত কাল,
অসাড় হইল রসনা :
তবু কি তোমার পূজা নিতে আর,
সময় এখনও হ'লনা ?
(তবে) থাক তুমি থাক, বাকী কটা দিন
আমার আর কি যাবেনা ?
আমি থাকিতে পারি না, না ডেকে তোমায়,
কি করিলে তুমি বলনা ?
কি আছে তোমার দুইটি অক্ষরে,
কত সুধা ক্ষরে জানি না ;
দয় দয় ধারে বুক ভেসে যায়,
বলা আর কিছু হ'লনা।
আমি অভিমানে, বলি কত কথা,
অপরাধ তুমি নিওনা ;
এমন করিয়া স্নেহের নয়নে,
কেহ ত আমারে দেখেনা !
(আমি) এই ছুঁই ছুঁই যুগল চরণে;
মাথা রেখে বলি এসনা ;
নয়নের জলে পথ যে ভিজাই,
পাছে পদে লাগে বেদনা।
(আমি) না জানি আহ্বান, আদর আরতি,
স্তব-স্তুতি ভব ভজনা ;
(তুমি) শিখায়েছ যাহা, ডাকি দু অক্ষরে,
যা জান তা তুমি করনা।

যা—

৺কাশীধাম।

সে অনেক দিনের কথা—যখন বিশ্বেশ্বর প্রথম ৺কাশীতে লইয়া যান। সেই সময়ে দুটী দৃশ্য শ্রীভগবান্ দেখাইয়াছিলেন। উপযুক্ত না হইলে তিনি বৃথা কোন কার্য্য করেন না। এখন যে তিনি উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাও আমি জানি না; কিন্তু যেন সেই বহুপূর্ব্বের দৃশ্য একটু বুঝিতে পারিতেছি, আর শাস্ত্রের সহিত এই বুঝার অর্থ মিলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছি—হয় ত তিনি একটু উপযুক্ত করাইয়া লইতেছেন।

কথাটা এই। নূতন ৺কাশীতে গিয়াছি, দশাশ্বমেধ নূতন দেখিতেছি। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর নূতন দেখিয়া আসিয়া দশাশ্বমেধের বাজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। গলিগুলি কিছুই ঠিক হয় নাই; দিকেরও নিশ্চয় হয় নাই। মনের মধ্যে কোনটার নিশ্চয় নাই। মনের মধ্যে স্থানগুলা পর্য্যন্তও যেন গোলমাল হইয়া আছে।

দুইটী সাধুকে বিশ্বেশ্বরের গলির দিক্ হইতে আসিতে দেখিলাম। একটি সাধু যুবক। আর এক জন সাধু বৃদ্ধ। উভয়েরই গৈরিকবস্ত্র-পরা। যুবকের গায়ে পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র জড়ান। বৃদ্ধের কটীদেশটুকু মাত্র গৈরিক বস্ত্র দ্বারা আবৃত। যুবক সন্ন্যাসী কাহারও দিকে চাহিলেন না। মুখখানা গম্ভীর। চক্ষু দুটী যেন কোন একটা ভাবে বাহিরের কিছু লক্ষ্য করিতেছে না। আপন মনে আপনি চলিয়াছেন। মনের মধ্যে কিছু লইয়া এতদূর অন্যমনস্ক আছেন যেন তাঁহার কাছে এই জগৎ পর্য্যন্ত নাই। সেকালে আমার এই দৃশ্যটী বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেই যুবক সন্ন্যাসীটি বাজার ছাড়াইয়া দেবনাথপুরা, বাঙ্গালীটোলা, রাণামহল বা কেদার যাইবার গলি (কালীমূর্ত্তির সম্মুখের পথ দিয়া গিয়াছে)—সেই দিক্ দিয়া গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকেই চিন্তা করিতেছিলাম; ভাবিতেছিলাম কি সুন্দর ভাবই দেখিলাম। বাহিরে চাহিয়া আছি, আর ভিতরে বাজারের নিকটে দাঁড়াইয়া কি যেন কি দেখিতেছি হঠাৎ আর এক দৃশ্য দেখিলাম। কতকগুলি বাবু লোক—এখন যেখানে রুদ্রাক্ষের মালার দোকান ও তাহার পাশে অন্ন অন্ন দোকান—সেই স্থানে বসিয়া নানা প্রকার বাজে কথা কহিতেছিলেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এক জন পরমহংস—এখন তাহা বুঝিতেছি। তখন পরমহংস দেখি নাই।

পরমহংস মুণ্ডিত মস্তক। ইনি ঐ দোকানের নিকটে আসিয়া বাবুদিগের দিকে একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বিকটভাবে দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিয়া যে দিক্ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিকেই চলিয়া গেলেন। তখন এই দৃশ্য ভাল লাগিলেও পুকের যুবক সন্ন্যাসীকে ভাল লাগিয়াছিল। আর এখন ভাল লাগিতেছে এই পরমহংসকে।

উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। এক জন ভাব পাইয়া ভাবের ঘোরে অন্য বিষয়ে অন্যমনস্ক। কিন্তু তিনি দুঃখী। কারণ যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাকে যেন পাইতেছেন না। ভাব আয়ত্ত হয় নাই বলিয়া দুঃখী। পাইতেছি না বলিয়া দুঃখী। এই যে তাঁহার দুঃখভরা মূর্ত্তি ইহাতেও একটা অভিমান আছে—দেহাত্ম বোধ আছে বলিয়াই দুঃখী।

পরমহংস—ভাব আয়ত্ত করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইতেছেন—যে বিকট ভঙ্গীকে তোমরা ভদ্রলোক সকলে অসভ্যতা মনে কর, তাহা তোমরা অজ্ঞান দেহাত্মবাদী বলিয়াই মনে করিতেছ। আমি দেহ নহি, দেহ হইতে স্বতন্ত্র। হে ভদ্রলোক! যখন তুমি মরিবে তখন এই শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহটাকে সভ্যভব্য করিতে কত প্রয়াস পাইতেছ বলিয়া, দেহাত্মবোধ প্রবল রাখিয়াছ বলিয়া, তুমি দেহটাকে আমি আমার করিয়াছ বলিয়া, মরিবার সময় বহু কষ্ট পাইবে। আর তোমার অজ্ঞানাচ্ছন্ন পরিজনও তোমার মৃত্যুসময়ে তোমার বিকট অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কতই দুঃখ করিবে; তোমার মুখের বিকৃতি দেখিয়া তখন ইহারা কতই কাঁদিবে। কেননা ইহারা দেহ পর্য্যন্ত দেখিতেই জানে। আর আমি! আমি দেখিতেছি দেহটা, আমি নই। এটা মরিবার সময় বহু বিকট আকার ধরিবে। ইহার বিকট আকার দেখিয়া, আমি তখন এটাকে উপহাস করিতে করিতে রমণীর দর্শনের নিকটে চলিয়া যাইব। যাইবার সময় বলিয়া যাইব—রে হতভাগা! দেখ তুমি সর্ব্বদাই বিকট; তুমি নিতান্ত অঘনা বস্তু হইয়া আমাকে কিরূপে তোমার মধ্যে রাখিতে পার? দেহ! তুমি দগ্ধ হও বলিয়াই তোমার নাম দেহ। তুমি শীর্ণ হও বলিয়াই তোমার নাম শরীর। তুমি মরিবে—জ্ঞানীর মৃত্যুতে দুঃখ কি? দেহ! তোমার যে যাতনা ইহা উপহাসেরই বিষয়।

আমি ছিলাম বলিয়াই দেহের সৌষ্ঠব থাকে, আমি চলিয়া যাইতে না

যাইতেই ইহার বিষম আকার হয়; ইহা বিকট ভঙ্গী করে। হে ভদ্রলোক সকল! আমি তোমাদিগকে এই যে বিকট আকার দেখাইলাম, এই অঘন্য দেহের এই স্বরূপ; তোমরা ইহাকে সাজাইয়া জামা জোড়া গায়ে দিয়া সৌষ্ঠব করিলে কি হইবে? ইহাকে অন্তরে উপহাস করিতে শিক্ষা কর, অন্তরে অনাস্থা করিতে অভ্যাস কর; এটা ভূতে নির্ম্মাণ করিয়াছে—ভূতের নির্ম্মিত বস্তু সর্ব্বদাই অঘন্য, এটাতে আমি আমার ত্যাগ কর; যাইবার সময় বলিয়া যাইতে পারিবে—হতভাগ্য দেহ! আমি তোমাকে উপহাস করিয়াই চলিয়া গেলাম; এখন তুমি দগ্ধই হইবে।

পরমহংসের মনের ভাব এই—ইহা ভাবিয়াও আমি এখন শান্তি পাইতেছি। যেটাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, সেটা শত্রু, তাহাকে অনাস্থা করিতেই তিনি দেখাইলেন। দেহ হইতে তিনি ছাড়া, তাই দেখাইলেন।

কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহের স্বরূপ দুঃখ; আমার স্বরূপ আনন্দ। বিকট-ভঙ্গীর সঙ্গে হাঁসি— ইহার অর্থই তাই। আমি আনন্দ, দেহ বিকট। বিকটটা পুড়িবে, আর আনন্দ আপনস্বরূপ পরমানন্দের নিকট চলিয়া যাইবে। যে দেহ এত দিন আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল যাইবার সময় তাহাকে একটু উপহাস করিয়া যাওয়াই উচিত।

সংসারচক্র নিবৃত্তি বা মোহনিবৃত্তি।

১। "মম মায়া দুরত্যয়া" মায়া নিতান্ত বিষমা, দুস্তরা। অনবহিতচিত্ত ব্যক্তিকে ইহা সঙ্কটে পাতিত করে। কোথায় মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপী স্বপ্নভ্রম-দৃষ্টি আর কোথায় বহুবর্ষব্যাপী জনমমরণ ভ্রম, বহুযোনী ভ্রমণ ভ্রম।

২। মায়াচক্রই সংসারচক্র। ইহাই মোহ চক্র। 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা" মায়া বা "আমি আমার", ইহাই যথার্থ জ্ঞান যে শান্ত স্বরূপে স্থিতি যথার্থ জ্ঞান যে নৈব কুর্ব্বন ন কারয়ন্ অবস্থা, ইহাকে হরণ করে।

৩। সর্ব্বদা গমান ভ্রমপ্রদ এই সংসারচক্রের নাভি হইতেছে চিত্ত।

সংসারভাবনা যাহা কিছু, দুঃখসুখ যাহা কিছু, বিপদ আপদ যাহা কিছু, তাহার ভাবনা, ভয় এবং তজ্জনিত দেহবিকার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যখন মনে কষ্ট পাও, তখন কষ্ট কোথায় হইতেছে ভাবনা কর দেখিবে চিত্তই ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

৪। "মানের যে প্রপদ্যান্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" আমিই পুরুষকার-রূপী। পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারিলে—চক্রের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তুল কাষ্ঠ (ঘুর) আঁটিয়া ধরিলে যেমন চক্র থামান যায়—সেইরূপ সংসার চক্রের মহানাভী চিত্তকে আক্রমণ করিলে, সংসার চক্র বা মোহ-চক্র থামিয়া যায়।

৫। পুরুষকার দ্বারা চিত্ত-আক্রমণ কিরূপ এখন ইহা দেখ। ইহাই চিত্তনিরোধ উপায়। চিত্তকে বশীভূত করাই একমাত্র উপায়। চিত্তমধ্যেই সংসার। ঘট-নাশে ঘটাকাশ থাকে না চিত্তনাশে সংসারও থাকে না।

চিত্তলয় কিরূপে হয়?

১। প্রথমেই চিত্তকে অনাসক্ত কর, বিষয়দোষ দেখাও; তবেই চিত্ত অনাসক্ত হইবে। গত বিষয় ভাবনা ও ভবিষ্যত বিষয় ভাবনা করিও না কেননা ইহাতে কোন ফল নাই। গত ও ভবিষ্যৎ ভাবনা আসিলেই ঐ সমস্ত চিন্তা আত্মদেবকে সমর্পণ কর—প্রভু! গত ও ভবিষ্যৎ ভাবনার যোগ্যতা আমার নাই—আমি বিশ্বাস করি এ সমস্তই মিথ্যা ভাবনা—আমি শ্রীভগবান্ আত্মারামে সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস করিলাম। এই ভাবে সঙ্কল্পপ্রভব কামনা সকল ত্যাগ কর। ভূত ভবিষ্যৎ ভাবনা না করিয়া চুপ করিতে গেলেও বর্ত্তমান বিষয় সকল চিত্তমধ্যে উঠিবে। চিত্ত অনাসক্ত হইয়া কেবল বর্ত্তমান বিষয় ক্ষণকাল বাহ্যবুদ্ধিতে সেবনপূর্ব্বক ভূতভবিষ্যৎ বিষয় ভাবনা ত্যাগ করিলে চিত্ত অচিত্তভাব প্রাপ্ত হইবে। চিত্ত লয় হইবে। এই সাধনাটি সম্পন্ন করিবার জন্য চিত্তকে সম্বোধন করিয়া জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলিতে চিত্ত যেরূপ ক্লেশ পাইয়াছে তাহা উহাকে স্মরণ করাইয়া দাও। পুত্র কন্যার মৃত্যু ক্লেশ, অর্থ উপায় ক্লেশ, লোকসঙ্গ ক্লেশ, বালককালের ক্লেশ, যৌবনের ক্লেশ, জরা ব্যাধির ক্লেশ, শরীরের সর্ব্বদা ক্লেশ, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করার ক্লেশ, বিহিত কর্ম্ম করার ক্লেশ—ইহাই চিত্তের মধ্যে তুলিতে থাক। আগত মৃত্যুক্লেশ কিরূপ ভীষণ হইবে—প্রতিদিন মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস নিদ্রা সময়ে ঈশ্বর বিস্মৃতি কত ভয়ানক

চিত্তকে ইহা স্মরণ করাও—এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত বৈরাগ্যে পূর্ণ হইবে—বিষাদযোগ স্থির হইলেই তখন চিত্ত সর্ব্ব সঙ্কল্প শূন্য হইয়া পরমপদ ধ্যান করিবার উপযুক্ত হইবে। আরও চিত্তকে স্মরণ করাও মৃত্যুকালে বা নিদ্রাকালে রমণীয় দর্শনের কাছে যাইতেছি। ইহা যতদিন না দৃঢ় ভাবনা হয় ততদিন সুখ কিছুতেই নাই। অন্য ভোগ যাহা রাখিয়াছ তাহারও ভোগকালে চিত্তকে নিত্য তিরস্কার কর। এই সমস্ত করিতে করিতে এক দিকে ভোগে অরুচি, অন্য দিকে রমণীয়দর্শনের কাছে যাইব এই ভাবনা অত্যন্ত হইবে।

২। অনুক্ষণ সঙ্কল্পাংশের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর—যখই সঙ্কল্প উঠিবে তখনই বল আবার দেখ চিত্ত বৃথা কি সঙ্কল্প তুলিতেছে—ইহাতে কোন ফল নাই—শান্তপদে থাকার জন্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়নের স্মরণ জন্য নাম লইয়া থাকাই শ্রেয়। অনুক্ষণ এইরূপ করিলে চিত্ত অচিত্ত ভাব ধারণ করিবে। তরঙ্গ আপন চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া শান্ত জলরূপে পরিণত হইবে।

৩। যতক্ষণ মেঘ থাকে ততক্ষণ আকাশে জলবিন্দু থাকে। চিদাত্মা যতক্ষণ চিত্তযুক্ত থাকিবেন ততক্ষণ সঙ্কল্প কল্পনা থাকিবে, দুঃখ থাকিবে, যাতনা থাকিবে—যতক্ষণ চন্দ্র ততক্ষণ হিমবিন্দু। কিন্তু চিদাত্মা নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্, সদা শান্ত, আর চিত্তটা সদা চঞ্চল। চিত্তটা সঙ্কল্প তুলুক বা না তুলুক—তাহাতে অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিলে—যাহাই কেন হউক না আমি কিছুই করি না, কিছু করাইও না, এই ভাবনা সর্ব্বদা করিলে চিদাত্মা যে চিত্ত হইতে পৃথক্ ইহা স্থিরবিশ্বাস দাঁড়াইবে—ইহা দ্বারাই প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ হইয়া যাইবে। ইহাতেই সংসার মূলদগ্ধ হইয়া গেল।

৪। চিত্ত হইতে পৃথক্ কৃত যে চেতন তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য। ঐ প্রত্যগাত্মা নির্ম্মল স্বভাব। ইঁহাতে সঙ্কল্প নাই! নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ইহাই সঙ্কল্প শূন্য অবস্থা। চিত্তটি ক্ষয় হইয়া গেলে, চঞ্চলতাটি থামিয়া গেলে একটি পরমার্থ দৃষ্টি জাগিবেই। জল নড়াটি বন্ধ হইলেই পূর্ণচন্দ্রটি জলের মধ্য হইতে ভাসিবেন। পূর্ণচন্দ্রই সমস্ত ছাইয়া আছেন দেখা যাইবে। মায়াচক্রটি বা মোহচক্রটি যে আত্মার সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিয়া আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবলবেগে ঘুরিতেছিল—চিত্তটি ক্ষয় হইলেই এই সংসারচক্র থামিয়া গেল—রহিলেন 'আমি' পূর্ণ শশধর—আহা! আমিই সেই পূর্ণশশধর! চিত্তটাই আত্মাকে যেন অহঙ্কার বিমূঢ় করিয়া অহং কর্ত্তা এই অভিমানে অপরিচ্ছিন্নকে

পরিচ্ছিন্ন করিয়া সংসারমোহ তুলিয়াছিল ; এখন চিত্তস্থির হওয়াতে মিথ্যা আমি আমি আমার আমার কোথায় দূর হইয়া গেল—এখন সেই ধ্যেয় নাম —পরিপূর্ণ নামীমাত্র রহিলেন—পরদুঃখ নিবৃত্ত হইল—আপদ গেল।

একান্তে গিয়া কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া এই সাধনাটি করিতে হয়। ভূর্ভুবস্থ ব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার বরণীয়ভর্গ প্রণবটি—তাঁহারাই দীর্ঘ জপ করিতে হয় ; পরে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি যাঁহার করা অভ্যাস থাকে তাহা করিতে করিতে—অথবা চিত্তপিশাচকে এই সেই পরমপদ স্পর্শ করিলাম—সহস্রার নীচে ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে স্পর্শ করিলাম এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে—স্পর্শ হইয়া গেলে চিত্ত আত্মাতে সমাহিত হইলেন—আত্মসংস্থ যোগ সাধিত হইল। তখন যোগিনাং অপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং. ইহা করিয়া যুক্ততম হইয়া ধ্যান অবস্থাতে ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে থাকিয়াই সেই কোটি বিদ্যুদ্ভাসিত মণিমণ্ডপে নিরন্তর থাকিয়াও চলা ফেরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস আহারবিহার সমস্তই হয়—সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আত্মবিভূতি মাত্র দর্শন হয় পরে জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়!

৫। এই যে এই কর্ম্ম করা—এত লেখা এত সাধনা—ইহা নৈব কুর্ব্বন্ না কারয়ন্ স্বরূপ হৃদয়পুরের রাজা যে আমি সে আমি করেন না। সে আমি করানও না। কিন্তু আমি থাকার জন্য চঞ্চল চিত্তের মধ্যে যে একটা প্রতিবিম্ব ভাসিয়াছে সেই প্রতিবিম্ব একবার প্রবৃত্তিমার্গের চিত্তে অভিমান করিয়া সুখী দুঃখী হইতেছে আবার নিবৃত্তিমার্গের চিত্তে অভিমান করিয়া শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে উজ্জ্বল হইয়া—এই নিবৃত্তিমার্গের আমি প্রবৃত্তিমার্গের আমিকে জপ পূজা বিচার ধ্যান লেখাপড়া ইত্যাদি করাইতেছে। ইহা দ্বারাই এই প্রতিবিম্ব আমিটা বিম্ব আমিতে মিশিতে চেষ্টা করিতেছে। এই আমিটা যখন নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্এর নিকটে আসিতেছে তখনই পরম শান্তপদে স্থিতি—এইটি আত্মাধীন হইলেই যখন ইচ্ছা দেহ ধরা বা দেহ ছাড়া—আর জননমরণ নাই আর পুনরাবৃত্তি নাই। ইহাই জীবন্মুক্তি।

ভয় ও অভয়।

বাবা! সংসার করিতেই সময় যায় আপনার উপদেশ মত কর্ম্মে বেশী সময় যে দিতে পারি না তাতেই ত ভয় হয়।

না পারিলেও ভীত হইও না। যাহা কর সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কর তাহাতেও অভয় পদ পাইবে।

সকল কর্ম্ম শরণাপন্ন হইয়া কিরূপে করিতে হয়? সংসারের কর্ম্মও কি শরণাগত হইয়া করা যায়?

যায় বৈকি। সকল কর্ম্মই তাঁহার শরণে আসিয়া করা যায়। তবে কর্ম্মের কৌশলটি জানা চাই।

কর্ম্মের কৌশল কি বাবা?

যৎ করোষীত্যাদিনা অর্পয়িতৃত্বেব কর্ম্মাণি কুরু। নতু কুর্ব্বার্পয়েতি। সকল কর্ম্ম যাহা কর, যাহা খাও, যাহা যজ্ঞ দান বা তপস্যা কর—সকল বৈদিক কর্ম্ম বা সকল লৌকিক কর্ম্ম—ওকালতি বা ডাক্তারি বা মোক্তারি বা বিছানা করা, ঘর ঝাট দেওয়া বা রাঁধা বাড়া অথবা সন্ধ্যা আহ্নিক করা যাহা কিছু করনা কেন সমস্তই প্রথমে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস করিও। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে হে ভগবান্! হে দয়াময়! হে দীনবন্ধু! আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ঘোর সংসারে পড়িয়াছি। কত লোক তোমার পূজা, তোমার জন্য ফুল চন্দন সংগ্রহ করা, তোমার জন্য মালা গাঁথা, তোমার জন্য ধূপ দীপ দেওয়া, তোমার জন্য শাস্ত্রাদি পাঠ করা ইহা লইয়াই থাকিতে পার—আমি পতিপুত্রাদি লইয়া ব্যস্ত তোমার কার্য্যে সময় পাই না। আমি কিন্তু প্রভু! তোমার শরণাগত। আমি তোমারই! কর্ম্ম করিতে যাইবার আগে অথবা মনে মনে মনকে নির্জ্জন করিয়া এই প্রার্থনাগুলি কর করিয়া কর্ম্ম কর তবেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা হইল। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ ইহাই। এমন অভ্যাস কর যে কোন কর্ম্মই যেন তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া হয়—এই যদি করিতে পার তবে অভয় পদ প্রাপ্ত হইবে।

দেখ অনেকে সাধু সাজিয়া থাকিতে পারে বটে কিন্তু বালক বা বালিকা কাল হইতে কি কি করিয়াছে তাহা সকলেই জানে—আর জানেন শ্রীভগ-

ক্রমশঃ—

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অস্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

স্বর্গদ্বারে গীত।

—"যে মাতা বাঁধেন মোহে
মোহমুক্ত করিতেও তিনি'

রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ
বল কোথায় শিখেচ।
স্বরূপেতে অরূপ যিনি
তাঁরে রূপ ধরিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি॥

রূপটি তোমার কেউ জানে না, তবে তোমায় কেউ বোঝে না
কোথাও নাই তবু তুমি, যথায় তথায় ভেসেচ
তা'তে ভেসে তারে নিয়ে,
রূপধ'রে রূপ দিয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

তোমার রূপের নাই তুলনা, প্রাণে ভাসে মুখ ফোটেনা
কেমন চাওয়া কেমন হাসি, উদাস ক'রে রেখেচ
শতদলীর পদে ছুলে
ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়েচ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

এই যে সাগর তুফান ডেকে, ওঠ পড় তাহার বুকে
নেচে নেচে সারা বুকে, পদ্মে পদ্ম ছেয়েচ
উঠার মিলায় নাচ-ভঙ্গে
এক রয় এক দেখাচ্চ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

জগবন্ধ এই যে নমি, ভিতরে সে বাইরে তুমি
তার প্রাণে তোমার রূপে, দুয়ে একটি হ'য়েচ
পানার মত জনম জলে
জলকে ঢেকে ভেসেচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

এইই তুমি আদিখুদে পোত দেখিয়ে যাগে যোগে
হয়ে কুলাঙ্গনা বিবসনা, রণরঙ্গে মেতেচ
শেষে এলোকেশী ধ'রে অসি
দানবে নাশ ক'রেচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

ত্রেতায় কুলবধূ হ'য়ে, অসুর-গৃহে বন্দী র'য়ে
যেন কত অনাথিনী, কতই কেঁদেচ
এক হ'য়ে আর সেজে
কৌশলে কুল মজিয়েচ।
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

দ্বাপরে আয়ান-ঘরে, সদা ননদিনী ডরে
বধূরূপে বাস ক'রে, কতই করেচ
(তবু) যার বধূ তার বধূ আছ
(শুধু) ক্লীব সংসার তরিয়েচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

তুমি বরণীয় স্বর্গ, তুমি ভোগ অপবর্গ
তুমিই তুমি আর কেন, আমি-সাজা রেখেচ
শ্রীচরণে এই মিনতি, আমি মেরে পাড়াও যদি
(তবে) আমার তুমি চরণ দিয়ে সকল সাধ মিটিয়েচ ॥
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেচ। ইত্যাদি

ভয় ও অভয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বান্। তিনি ত জানিয়াইছেন তবে কেন তাঁহাকে মন খুলিয়া সব বলিতে পারিবে না? তাঁহাকে বল—তাঁহার শরণাপন্ন হও—সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ কর—এও খুব ভাল সাধনা। অথবা সকল সাধনার মূলে এই সাধনা থাকিবে।

বাবা! আমি ত অনেক পাপ করিয়াছি। তার ফলে আমাকে নাস্তিক পুত্রাদির জন্ত অশাস্ত্রীয় রন্ধনাদিও করিতে হয়। বাবা! অশাস্ত্রীয় কর্ম্মও কি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া করা যায়? না আপনি আমার মনে যাহাতে হতাশ না আইসে সেইজন্ত শুধু সাহসের কথা বলিতেছেন?

বাপু! আমার কথায় সন্দেহ করিও না। জানিও আমি নিজের কথা একটিও কই না। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলি।

শ্রীগীতা বলিতেছেন—অষ্টাদশে

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বদা মদেক শরণ হইয়া কর। আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয় পরম পদ লাভ করিবে।

ভগবান্ শঙ্কর ব্যাখ্যায় বলিতেছেন সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধানাপি—সর্ব্ব-কর্ম্ম এমন কি নিষিদ্ধ কর্ম্মও যদি মদেক শরণ হইয়া কর—কর্ম্মের পূর্ব্বে আমাকে বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও—তুমি সমস্ত উচ্চ অঙ্গের সাধনালাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যাইবে।

বল না এমন অভয় আর কোথায় আছে? যাহা কর—করিবার অগ্রে তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া শ্রীভগবানের শরণে আসিয়া কর নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ থাকিবে না। কর—আজ হইতেই আরম্ভ কর। হইবেই।

ধ্যান—স্থূলে ও সূক্ষ্মে।

স্থূল ধ্যানে উপাস্য ও উপাসক থাকে। সূক্ষ্ম ধ্যানে উপাস্যের সঙ্গে উপাসক মিশিয়া এক অদ্বৈত ভাবে থাকে। সূক্ষ্মধ্যানই স্থিতি।

সুন্দর দেবতা মনোহর মূর্ত্তি। প্রাণভরা সাগ্রহ দৃষ্টি। এই দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম। প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সব ভুল হইয়া গেল। যেন তোমায় লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রদক্ষিণ হইতেছে। কতক্ষণ পরে মনে হই। আমি যেন স্থির হইয়া শান্তচক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া আছি। পদতলে পতিত পরম শান্ত চলন রহিত পুরুষ, অনিমিষে আপন বক্ষোপরি নৃত্যশীলপদে দণ্ডায়মানা আপন প্রকৃতিকে দেখিতেছেন। বড়ই মধুর। যখন এই ভাবে আপন বক্ষে আপন প্রকৃতিতে একাগ্র হইবে, তখন স্থূলধ্যানে স্থিতি হইল। ইহাতে উপাস্য উপাসক থাকিল। দেখিতে দেখিতে যখন দেখা আর থাকিবে না—শুধু এক দ্বৈত-রহিত জ্ঞানানন্দমাখা কি রহিল—ধ্যান নাই, ধ্যাতা নাই, বোধ নাই এই অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই সূক্ষ্ম ধ্যান।

সমুদ্র।

আহা! ঐ সাগর-উদ্বেলিত উন্মথিত ফেনিল অম্বুরাশি ঐ তুলা ফেলা ঐ রঙ্গ ঐ নৃত্য আহা! কাহার জন্য তাহা কি বুঝিয়াছ? না শুধুই সৌন্দর্য্য ও কবিতার হার?

আহা! সাগর গর্জ্জন ঐ বিরামবিহীন আলস্যবিহীন মধুনিস্যন্দিত মৃদু মধুর ঝঙ্কার! আহা! গর্জ্জন কি? ঐ গর্জ্জন ঐ তর্জ্জন কেন? গর্জ্জন কি শুধুই গর্জ্জন না তাহা ছাড়া আর কিছু আছে? গর্জ্জনের মধ্যে প্রবেশ কর; কি দেখিলে? বলিবার নাই, বলিতে পারিলাম না!

আহা! সর্ব্বোপরি এই হৃদয়সমুদ্র কি উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়াছে? আহা এই যে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপলকে তোমাকে নাচাইয়া নাচাইয়া কোন্ অব্যক্ত অজানা পথে ঢেউ খেলা সোপানরাজির মধ্য দিয়া ফেনিল আকুল

জীবনভার বহিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ? না শুধুই সাগরগর্জ্জনে আপন উন্মত্ততার অবসর অন্বেষণ?

উন্মত্ত ত অনেক হইয়াছ তবে কেন? আপন ছাড়িয়া উন্মত্ত হও, দেখিবে ভিতর বাহির সব গোল হইয়া গেল; তুমি 'প্রলয় পয়োধিজলে' ভাসিতেছ। তখন চিরপ্রবাহ—সে প্রবাহ এই কল্লোলের ন্যায় মুখর—এই উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল চলমান।

তাই বলি, হৃদয়সমুদ্র তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া ঐ সাগরতরঙ্গে মাতিও না। হৃদয়তরঙ্গে সাগরতরঙ্গে মিলাও; এক মহাতান বাজিয়া উঠিবে; দুয়ে মিলিয়া মহালয়ে সুচিরশান্তিতে লীন হইয়া কোথায় যাইবে কে জানে? ইহারই নাম বিশ্বসুরে যোগদান। ইহারই নাম বিশ্বপ্রেম। ইহারই নাম সনাতন ধর্ম্ম। আর আন অসম্ভব।

দেখ, শুন, বুঝ, সমুদ্র কেন নাচে? নাচা কি নাচাই? এতে থামা কি নাই? গর্জ্জন করে সত্য—গর্জ্জনের মধ্যে এক মহাবিরতির লয় ঝঙ্কার কি নাই? দেখ হৃদয়তরঙ্গঝঙ্কার উঠে, নামে, থামে। থামে কোথায়? লক্ষ্য কর। কি উপায়ে থামে? সে থামার নিয়ম, আইন লক্ষ্য কর; তুমি আর নাচিতে চাহিবে না। নাচিবে অথচ নাচার রঙ্গভঙ্গ থাকিবে না।

আচ্ছা সাগর নাচে। কাহাকে লইয়া নাচে? কাহাকে ভিন্ন কি নাচা হয়? কাহাকেও আশ্রয় না করিলে নাচা কি সম্ভব?

সাগর! নাচ—যার জন্যই নাচ—তুমি নাচ. তুমি বড় সুন্দর নৃত্য করিতে পার—জানা গেল। তাতে আমার কি?

সাগর! বেশ সুর তুলিতে জান—বেশ লয় তানের ঝঙ্কার মিলাইয়া সপ্ত স্বরের তন্ত্রীযোগে বেশ কলকণ্ঠ স্বনে নিনাদ ছাঁদিতে শিখিয়াছ—বল তা'তে আমার কি?

আমার চাওয়ার জিনিস তোমার মধ্যে—তোমার উদ্ভ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে—তোমার মর্ম্মরায়িত নিনাদের মধ্যে কোথায়?

আহা! তুমি যা চাও—আমিও তাই চাই। তবে কিছু ভেদ আছে। থাক্—আজ ভেদ তুলিব তোমার চির বিরহ বহ্নিপুঞ্জিত অসীম প্রেমবহ্নি মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ডুবিব—দোষ কি? তুমি অতলস্পর্শ অসীম প্রেম রত্নাকর তোমার মধ্যে চিরশান্তিলাভ করিতে দাও তোমার অনন্ত অসীম সুশীতল প্রাণের

যদো সমবেদনার যোগদান করিয়া একতানে মিশিয়া যাইব। তুমি—আমায় তোমার ঐ তরঙ্গে নাচাইয়া—লইয়া না যাইয়া—কোথায় যাইবে?

যে মুখর—তীব্র ভীষণ চণ্ড উন্মত্ত, কপট মোহন—আর না আর তোকে দেখিয়া ভয় নাই। যাহার মৃত্যু তুচ্ছ তাহার আবার ভয় কি?

আঃ—

পথহারা—শ্বাসে লক্ষ্য।

দৃশ্য মনোহর, দেখিতে দেখিতে বহুদূর আসিলাম, পথ আর ফুরায় না, বহুকাল ধরিয়া চলিতেছি, চলিবার বিরাম নাই। অপরিণত বয়সে মোহবশতঃ সুন্দর ভ্রমে এই পথে বাহির হইয়াছিলাম, যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই মনোরম বোধ হইতেছিল বটে কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, যাহা খুঁজি তাহা এপথে নাই। প্রথমতঃ শোভায় মন মুগ্ধ হইতেছিল, তাই ভাবিতেছিলাম যে, এই পথেই সুখ পাইব; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এপথের সুখ স্থায়ী নয়, আজ আছে, কাল নাই। বাল্য গেল, যৌবন গেল, প্রৌঢ়াবস্থাও যায় যায় হইয়াছে, কত কি করিলাম, কত দেখিলাম, কত ছবি সুন্দর বোধে হৃদয়ে আঁকিলাম, কত হাসিলাম, কত কাঁদিলাম, কত কি ছাইভাই করিলাম, কই যাহা খুঁজি তাহা ত পাইলাম না। ক্রমে ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ভোগলালসা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে; সুতরাং সুখের বিনিময়ে দুঃখই পাইতেছি। দর্শনশক্তির হ্রাস হইতেছে চস্‌মা দিয়া দেখিতেছি, শ্রবণশক্তির হ্রাস হইয়াছে, শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল, দন্ত গিয়াছে, কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে ভক্ষণ করিতেছি, চলিবার শক্তি নাই, যান দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিতেছি। ভোগের জন্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করিতেছি, তথাপি তৃপ্তি হইতেছে না, যতক্ষণ ভোগ করা যায় ততক্ষণ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকি, ভোগাবসানে আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ। এযেন দুঃখের রাজ্য, এখানে ত সুখ নাই। এখানে যেন একই ভাব, সকলেরই সমান দশা, সকলেই দৈন্যের হাসি হাসে, দুঃখের উপর একটা আবরণ জোর করিয়া দিতে চেষ্টা করে। যাহা ধারাবাহিকরূপে এক নিয়মে পরিচালিত হয়, তাহা ত চেতন নহে জড়, আসল নহে নকল। তাহা হইলে ইহার নিয়ামক এক-

জন আছেনই। তিনি নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে আছেন, তিনি ধন্য আর ইহা ধন্য। কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে একজন গাহিয়া গেল—

"বটিল বিষম গ্রহ, সোনা ফেলে আঁচলে দিয়েছি গেরো"। গানটি শুনিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, যে আমারও যেন ঐ অবস্থা; যাহা খুঁজিতেছি, যেন তাহাকে ফেলিয়া দিয়া বাহ্য চটকে মুগ্ধ হইয়া আঁচলে গেরো দিয়াছি। এখন কি করি, কোথা গেলে তাহাকে পাই কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যেমন চলিতে ছিলাম তেমনিই চলিতেছি, কাহারও সহিত দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করি। সকলেই হাসে, বলে পাগল! এত নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইলে না, উপভোগের নিমিত্ত এত বিলাস সামগ্রী রহিয়াছে, তাহাতেও মন উঠিল না, যাহা কেহ জানে না, কেহ দেখে নাই, কেহ পায় নাই—তাহার জন্য এত লালায়িত কেন? এস যাহা পাইতেছ তাহা লহ, অধ্রুবের জন্য ধ্রুব ত্যাগ করিও না সকলই নশ্বর, আজ যাহা দেখিতেছ কাল তাহা থাকিবে না, সুযোগ ছাড়িও না, ভোগ করিয়া লও, নচেৎ পরে দুঃখ পাইবে। এই সব শুনিয়া আর মন উঠে না, বলি, "যাহা আজ আছে তাহা কাল থাকিবে না,—তাহা কি কখনও সুখ দিতে পারে? যদি দেয় ত সে সুখ দুদিনের জন্য, পরে আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ, বরং তখন ঐ ক্ষণিক সুখের স্মৃতি মর্ম্মদংশন করিতে থাকে, আশা আরও বাড়ে"! সকলেই পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। আমিও চলিতেছি যাহার সহিত দেখা হয় তাহাকেই বলি 'ভাই আমি পথহারা, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও'। কেহ কেহ বলে, "কোথায় যাইবে বল"। আমি ঠিক ঠিকানা বলিতে পারি না, বলি 'জানি না'। সকলেই পাগল ভাবে। এইরূপ যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া এক তরুমূলে উপবেশন করিলাম, ভাবিতেছি গন্তব্য স্থান জানি না, এসেছি বিপথে; যাঁহাকে খুঁজি তাঁহাকে চিনিনা, তাঁহার বিষয়ে কিছু জানি না, অথচ তাঁহাকে পাইতে চাই, এ বাসনা কি পূর্ণ হইতে পারে? এমন সময় সহসা ধ্রুবের উপাখ্যানটী মনে হইল, প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। বালক ধ্রুব এইরূপে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা হইলে আমার বাসনাও পূর্ণ হইতে পারে—এই আশা হইল। আরও মনে হইল বিশ্বনিয়ন্তাকে পাইবার প্রধান উপায় শাস্ত্র। শাস্ত্রে সকল অবস্থার বিষয় বর্ণিত আছে; নিজের অবস্থা শাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে বুঝিতে পারিলে সংসার

কাটিয়া যায় এবং সাধনার পথও বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় ধ্রুব-চরিত্র আলোচনা করিয়া শিশু ধ্রুবের প্রাণের ব্যাকুলতা মনে হইল, এবং ঐ ব্যাকুলতাই সাধনা বলিয়া বুঝিলাম। আরও বুঝিলাম যে ভগবানের অসীম দয়া, জীবের মতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনিই বড়ই ব্যাকুল। তাহা না হইলে এ সময়ে সহসা ধ্রুবের কথা আমার মনে উঠিবে কেন? এই তরঙ্গ যেন তিনি আমার মনে তুলিয়া দিয়াছেন। ব্যাকুল না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, সরল সুকুমার শিশু ধ্রুব কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, আর আমি মহাপাপী কত পাপ করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আর কেহ জানুক আর নাই জানুক নিজের অবিদিত কিছুই নাই, এত পাপভার বহন করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে চাহি; আমার প্রাণে কতটা ব্যাকুলতা আনিতে হইবে তাহাও অনুমান করিলাম, দুর্ব্বল পাপভারগ্রস্ত আমি তাঁহার পথে যাইতে পারিব না বোধ হইল। তবে কি যাহা চাহি তাহা পাইব না? প্রভো! দয়াময়! তুমি যে পাপীর আশ্রয়; দীনবন্ধো! হৃদয়ের জ্বালা তোমা ভিন্ন কে নির্ব্বাণ করিবে? তুমি দয়া না করিলে পাপীর গতি কি হইবে? পবিত্র সূর্য্যকিরণ চণ্ডালগৃহেও প্রবেশ করে, তবে কেন প্রভো দীনে দয়া করিবে না? না করিয়াছি এমন অকর্ম্মই নাই, অকর্ম্মের স্রোতে গা ঢালিয়া আছি, তুমি ভিন্ন কে এই শক্তিহীনকে কর্ম্মস্রোতে ফিরাইবে? তোমার দয়া ভিন্ন দাসের অন্য গতি নাই। অগতির গতি! পতিতপাবন! দীনের প্রতি কৃপানয়নে চাও, আমার অপবিত্র হৃদয়কে পবিত্র কর,—নতুবা তোমার স্বচ্ছ মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইবে কিরূপে? বিপথগামী সন্তান আমি, পথে তুলিয়া আন তুমিই যে আমার মত-পাপীর আশ্রয়। তুমিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই মাতৃস্বরূপিণী; সন্তান, অপরাধী সন্তান-শত সহস্র, লক্ষ লক্ষ, অগণিত পাপ আচরণ করিয়া কাতরভাবে মা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, মা দয়া করিয়া কোলে দাও, তোমার পবিত্র ক্রোড়ে উঠিয়া নির্ম্মল হই। জননি! কাতর সন্তানের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর, হৃদয় পবিত্র হউক। আমার মনকে কাতর করিয়া দাও, যেন তোমার পথে নিয়ত চলিতে থাকি। কামকিঙ্কর আমি, চিরকালই কামনার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, এখন তোমার কৃপার আশায় কামনাকে নিযুক্ত করিলাম, নিষ্কাম কি তাহা জানি না, উপলব্ধি করিতেও পারি না; তোমায় পাইয়া যে সুখ তাহারই কামনা করিতেছি, যদি কখনও পাই তখন কামনা যদি যায় ত যাইবে, কামনার কিঙ্কর কামনা

কিরূপে ছাড়িব ? তোমায় পাইবার কামনাই বলবতী করিলাম, বাসনাময় ! বাসনা পূর্ণ কর। এইরূপ প্রার্থনা করি আর পথ চলি, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলি,—"ভাই, যে পথে গেলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সে পথ কোথায় বলিতে পার। যেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া আসিয়াছি সেখানে যাইবার পথ বলিয়া দিতে পার।" শুনিয়া কেহ হাসে, কেহ কথা কয় না, অতি অল্প লোকেই সহানুভূতি করে। অবশেষে একটী মহাপুরুষ বলিলেন, "যে পথে আসিয়াছ সেই পথে যাও—গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিবে।" তাঁহার চরণে পতিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বলিলাম, কত কাঁদিলাম, শেষে কহিলাম, প্রভো ! এই পথে তো এতদিন আসিয়াছি—তাঁহার সাড়াটী কোথায় তো পাই নাই। তিনি কহিলেন, পাইয়াছ বই কি, মনে করিয়া দেখ দেখি "সোনা ফেলে আঁচলে গেরো" এই গানটী শুনিয়া একটু সাড়া কি পাও নাই ? ধ্রুবোপাখ্যান মনে উঠায় কি তাঁহার সাড়া পাও নাই ? উপলব্ধি করিয়াও যদি না ধর, সে দোষ কার ? তাঁহার না তোমার ? তাই বলি অতীতের আবৃত্তি ভিন্ন পাপীর ত্রাণ হয় না ; অতীতের আলোচনা কর, যে পথে আসিয়াছ সেই পথে যাও, পথ হারাইবে না। মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করিতেছ অথচ মৃত্যুর কোলে উঠিতেছ—কিরূপে মৃত্যুকে এড়াইবে ?

আ—কিরূপে মৃত্যুর কোলে উঠিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি না।

ম—ঐ ত মজা, বুঝিতে পারিলে কি কেহ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিত ? জন্ম হইলেই জীব কালের রাজ্যে পতিত হয় ; যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দক্ষিণে হাওয়াটা জীব বড় ভাল বাসে, তাই দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে আইসে ; যমের দ্বার দক্ষিণ দিকে জান ত ? উত্তর দিকে অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে তাকায় না।

আ—আপনি বলিলেন অতীতের আবৃত্তি ভিন্ন পাপীর ত্রাণ হয় না, ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

ম—বুঝাইয়া বলি শ্রবণ কর,—বর্ত্তমানে তুমি নিষ্পাপ হইতে পার, ভবিষ্যৎ তোমার করায়ত্ত, যখন ভগবানের জন্য প্রাণ আকুল হয়, তখন বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে পাপের আশঙ্কা বড় অল্প ; আশঙ্কা যে নাই তাহা বলিতেছি না, ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রকৃত আগ্রহ হইলে পাপের আশঙ্কা অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু গত-জীবন যাহা পাপে কাটাইয়াছ তাহার আলোচনা অর্থাৎ তাহার জন্য অনুতাপ

করিতে হয়, না হইলে মন নির্ম্মল পদার্থের প্রতিবিম্ব লইতে পারে না; অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

আ—বুঝিলাম, কিন্তু পথ কি?

ম—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। মহাজনেরা কেহই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হন নাই, সকলেই পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণে যে পথে চলে তাহার বিপরীত পথে গিয়াছেন। সম্মুখে লক্ষ্য থাকিলে চিত্ত বাহ্যদ্রব্যে আকৃষ্ট হয়, অনেক খেলিবার দ্রব্য পায়, সাধনে নিবিষ্ট হয় না। পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য থাকিলে কেহ তোমার অজ্ঞাতে অনিষ্ট করিতে পারে না। তাই বলি পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চল, পশ্চাদ্দিকে যে পথ অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছ সেই পথই তোমার পথ, গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিবে। এ মায়ার রাজ্যে অধিক অগ্রসর না হইয়া আলগুটানই ভাল।

আ—বেশ কথা, সম্মুখে চক্ষু রহিল আর পশ্চাতে দেখিব কিরূপে?

ম—সম্মুখে ত চক্ষু আছে, সম্মুখে দেখ তোমার যম; যাহা কিছু রমণীয় সম্মুখে দেখিবে, তাহাকে তোমার যম বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেই ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য আসিবে।

আ—আচ্ছা, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিলে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিব তাহা কিরূপে বুঝিব?

ম—যেখান হইতে আসিয়াছ, যে অবস্থা হইতে এই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ সেই অপ্রাকৃত অবস্থা পশ্চাতে না সম্মুখে?

আ—তাহা পশ্চাতে বৈ কি।

ম—তবে সেদিকে লক্ষ্য না করিলে উপায় কি? দেখ কোথা হইতে আসিয়াছ, কিরূপে আসিলে, কিরূপে এ অবস্থা হইল, তাহা হইলে মূলে লক্ষ্য পড়িবে; মূল ছাড়িয়া দিলে কি বৃক্ষের উপর উঠা যায়? মুক্ত হইতে গেলে কিরূপে বদ্ধ হইয়াছ তাহার তথ্য অবগত হও, তবে ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পশ্চাতে লক্ষ্য ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই।

আ—বুঝিলাম, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। আমি কি ছিলাম তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ম—নিশ্চয়ই; কোন ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে দেখিতে হয় ব্যাধি কিরূপে উৎপন্ন হইল, কিরূপে বিস্তার পাইল; তখন মূলে আঘাত করিলে

ব্যাধি নির্ম্মূল হয়, নতুবা দু'দিনের মত চাপা থাকে মাত্র।

আ—আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, তৎপূর্ব্বে শিশু-অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে শায়িত থাকিতাম, তৎপূর্ব্বে মাতৃগর্ভে ছিলাম।

ম—বেশ, ঐরূপই আলোচনা কর, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আরও ভাবিয়া দেখ, যৌবনের সঞ্চারকালে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া উঠিলে, বহির্বিষয়ে সেগুলিকে নিযুক্ত করিয়াই এই অবস্থা হইয়াছে; তখন সেগুলিকে ভিতরে টানিয়া রাখিতে পারিলে কি হইত তাহাও ভাব। যৌবনকাল বিকাশের সময়, ঐ সময় সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়েরই স্ফূর্ত্তি হয়। সেই সময়ে সুসঙ্গ ছাড়িয়া কুসঙ্গ করিয়া বিকাশের ব্যভিচার করিয়াছ, তাই ত এই দশা হইয়াছে। কাচ লইয়া চিন্তামণি বিকাইয়াছ, তাহার জন্য অনুতপ্ত হও। বালকাবস্থায় পিতামাতা ও নিকট-আত্মীয়গণের সহবাসে কিরূপ ছিলে তাহা ভাব, তৎপূর্ব্বে শৈশবাবস্থায় জননীর ক্রোড়ে কিরূপ ছিলে তাহা ভাব, তৎপূর্ব্বে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় কিরূপ ছিলে ভাবিবার চেষ্টা কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারিবে যে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার সময়েই ব্যভিচার ঘটিয়াছে, সুতরাং উন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতি হইয়াছে। সেই সব ব্যভিচারের জন্য অনুতাপ কর। অনুতাপেই পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, মনের দণ্ডবিধান হইবে, তবে ত মন কাতর হইবে। মাতৃগর্ভে জরায়ুমধ্যে ভ্রূণাবস্থায় থাকিবার পূর্ব্বে কোথায় কি অবস্থায় ছিলে তাহাও ভাব, কিরূপে জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলে এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ পশ্চাৎদিক্ আলোচনা করিয়া যাও, শেষে মূলে উপস্থিত হইবে; তখন বৃক্ষারোহণ অর্থাৎ সাধনা সহজ হইবে।

আ—ভ্রূণাবস্থার পূর্ব্বে পিতৃদেহে বীর্য্য এবং মাতৃদেহে শোণিতরূপে ছিলাম; এই দুইয়ের মিশ্রণে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

ম—শুধু দেহ কেন? তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে সৃষ্টিতত্ত্বে আসিলে সব বুঝিতে পারিবে; আর তখন নিবৃত্তির পথ অর্থাৎ সাধনাও বুঝিতে পারিবে। মাতৃগর্ভে জীব কিরূপে আইসে ইহাও এক রকম সৃষ্টিতত্ত্ব স্থূলভাবের। এ তত্ত্ব আলোচনা করিলে জটিল সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা সহজ হইবে।

আ—একটু বুঝাইয়া দিন।

ম—পিতৃদেহে বীর্য্যরূপে ছিলে,—উহা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং উহাকে

ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে পারা যায়। তন্ত্র বলেন বিন্দুব্রহ্ম, মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" ঐ বীর্য্যের স্পন্দন হইল, স্থির চঞ্চল হইলেন, শোণিতে সংযুক্ত হইলেন; পুরুষ যেমন মায়ায় আসক্ত হইয়া সৃষ্টি করেন, সেইরূপে বীর্য্য শোণিতে জীবসৃষ্টি হইল। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম হইতে শব্দ উত্থিত হয়। 'ওঁকার'; এই শব্দ সেবে প্রণব-মূর্ত্তি ধারণ করেন। শুক্রও তদ্রূপ ঐ ধ্বনিতে ধরাধূতে প্রবিষ্ট হয়; তখন মূর্ত্তিও হয় ওঁকার, প্রণব, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নবমূর্ত্তি হইতে চলিল। ক্রমে গঠিত হইয়া, প্রাণ দেহ মন ইত্যাদি সমস্ত সংস্কার বিশিষ্ট হইয়া রূপাকার হয়। যতদিন গর্ভে থাকে সেই প্রণবই শুনিতে থাকে, যত পুষ্টি পাইতে থাকে ততই প্রণব হইতে দূরে আসে; শেষে ভূমিষ্ঠ হয়। অজ্ঞান উল্টাইয়া মনপ্রাণ সবই বহির্ম্মুখ হইল, কেবল বাহিরেই বিচরণ করিতে থাকে; আর কালের রাজ্যে আসিয়া কালের ক্রোড়ে উঠিতে থাকে। আর অজপার দিকে লক্ষ্য থাকে না। অহং অহং করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। "হংকারেণ বহির্যাতি" এইরূপে গোলযোগ ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব বলিতেছি মিলাইয়া লও ঠিক কি না।

আ—বলুন।

ম—পুরুষ অনাদি ও স্বাধীন, স্বাধীনতা বশতঃ তাঁহার ইচ্ছা হইল "অহং বহুস্যাম্।" শব্দ উত্থিত হইল ওঁকার, উহা জ্যোতির্ম্ময়রূপ ধারণ করিল। স্থিরসমুদ্রে পবন বহিল, স্থিরত্বের উপর চঞ্চলতা আসিল, ওঁকার হংসাকারে পরিণত হইলেন "হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ" এইরূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল, উপরে চঞ্চল ভিতরে স্থির, স্থির, চঞ্চলতার আভরণ পরিলেন। স্থির পুরুষ স্পন্দিত হইয়া বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। পুরুষে প্রকৃতি সংযোগ হইল। পুরুষ স্থির, প্রকৃতি চঞ্চল; যেমন স্থির শিবের বক্ষে চঞ্চল শিবানী, স্থির নারায়ণের ক্রোড়ে চঞ্চলা লক্ষ্মী। শক্তিমান্ হইতে শক্তির বিকাশ হইল, উহাই মায়া; পুরুষ মায়ার আভরণ পরিধান করিলেন, বালকের সজ্জার ন্যায় পুরুষ আপনি আপনি সাজিলেন। বালক যেমন নগ্নাবস্থায় এই আমি কাপড় পরিলাম, এই জামা পরিলাম বলিয়া হাত পা নাড়িয়া সাজে এবং আমি বেশভূষা করিলাম বলিয়া অভিমান করে,—সেইরূপ পুরুষ মায়ার সাজে অর্থাৎ যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া মনে করিয়া লইয়া সাজিলেন এবং তাহাতেই অভিমান

করিলেন। ছিলেন নিরাকার, হইলেন সাকার; ছিলেন নির্গুণ হ'লেন সগুণ; চিন্মণি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইলেন। পরে সগুণ হইয়া ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন বিগ্রহে প্রকাশ হইলেন। প্রকৃতিও ত্রিমূর্ত্তিতে ঐ তিন মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিলেন; হ'লেন ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক হইতে বহু উৎপন্ন হইল। পুরুষের ইচ্ছা হইবা মাত্র ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ওঁকার, ইহা প্রথমে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ হইল। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "ওঁকারস্ত ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ"। এই ওঁকার স্পন্দিত হইয়াছিল গায়ত্রীচ্ছন্দে ইহা তেজোময়, সুতরাং ইহার দেবতা অগ্নি এবং সৃষ্টির প্রাক্কালে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বলিয়াছি মায়ার সংযোগে ইহা হংসরূপী হইয়াছিল; ব্রহ্মা ইহাকে বাহন করিয়া মানসসরোবরে ছাড়িয়া রাখিলেন অর্থাৎ হংসরূপী শ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা মুক্তি লক্ষ্য করিয়া যোগমায়া অবলম্বন করিলেন। মহেশ্বর এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধনেত্র করিয়া পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আর বিষ্ণু এই চঞ্চল হংসকে স্থির করিয়া নিত্যসত্ত্ব হইয়া রহিলেন। মায়ার তরঙ্গে ভাসমান সৃষ্ট জীবসমূহ, চঞ্চল তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং স্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইল। সৃষ্টির প্রাক্কালে উত্থিত ওঁকার ধ্বনি আর শুনিতে পাইল না, কেহবা সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি ভোঃ এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। মায়ার তরঙ্গে ভ্রমবশতঃ তাঁহারা ভোঃ এই সম্বোধনাত্মক শব্দ শুনিলেন। ভ্রমে-পতিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলে সে যেমন তাহার ভ্রম বুঝিতে পারে, এবং যাহা করিতে যাইতেছিল তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়,—সেইরূপ যাঁহারা ওঁকারের ভোঃ প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রম উপলব্ধি করিয়া কে সম্বোধন করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া সেই শব্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ ইঁহারা তপস্যা অবলম্বন করিলেন। আর যাঁহারা মায়ার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বহু-দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের তখন অবিদ্যার আবরণ পড়িয়াছিল। মায়ায় ভ্রম হয় অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃত মনে হয়, আর অবিদ্যার আবরণ পড়ে অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুকে জানিতে দেয় না। এই অবিদ্যার

আবরণে পড়িয়া তাঁহারা শুনিলেন "অহং"। কারণবারির অহং গর্জ্জনে তাঁহারা মত্ত হইয়া উঠিলেন,কেবল অহং অভিমানে অবিদ্যার স্রোতে গা ঢালিলেন। সুতরাং হংসের 'স' শব্দ কর্ণ গোচর হইল না কেবল হংকারেই রহিলেন। সেই হেতুই বহির্ম্মুখ হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন, কারণ হংকারের বহির্গতি; ইহাদের অন্তর্দৃষ্টি হইল না, সুতরাং মুক্তি লক্ষ্য হইল না। বাস্তবিক হংস ভিন্ন জলের উপর দেহরক্ষার উপায় আর কি আছে? "বহির্ম্মুখ হংকারে" মত্ত হইয়া তাঁহারা "স" অর্থাৎ পরমপুরুষকে বিস্মৃত হইলেন, এবং ঐ হংসরূপী শ্বাসের পীড়ন করিয়া আরও বিকৃত হইতে লাগিলেন। এই সাধারণ জীবের অবস্থা। এই বিকারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে এই হংসরূপী শ্বাসকে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। উহাই উপায়,উহা ধরিলেই 'স'কারে লক্ষ্য পড়িবে। 'সকারেণ বিশেৎ পুনঃ' সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি জন্মিবে, পশ্চাৎদিকে লক্ষ্য থাকিবে আর বাহিরে "হংকারে" যমের কোলে তুলিয়া দেয়। তাহা হইলে দেখ, পশ্চাৎদৃষ্টি না করিলে জীবের গতি নাই। হংস ভিন্ন কেহ গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে না। পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি না রাখিলে মন অশ্বকে সংযত করা যায় না, উহা নিয়তই ছুটিতে থাকে, হংসকে ধরিতে পারা যায় না। তাই বলি ভাই যাগাতে পথ চালাইতেছ, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হংসকে অবলম্বন কর। এই হংসই তোমার বাহন হইয়া তোমাকে মায়াপারাবারের পারে লইয়া যাইবে।

প্র

তুমি আমি।

আমি কে?

আমি চেতন, জড় নহি।

তুমি কে?

আমিও চেতন – অন্য কিছুই নহি।

তবে তুমি ও আমি এক?

মূলে এক, কিন্তু স্থূলে ভিন্ন।

ভাল করিয়া বল।

আমি অখণ্ড, তুমি খণ্ড। তুমি দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। আমি ব্যুত্থানে বিশ্বরূপ হইলেও আপনি আপনি ভাবে বা সমাধিদশায় অপরিচ্ছিন্ন।

আমি খণ্ড তুমি অখণ্ড ? চিরদিন কি এইরূপ থাকিব ?

না। যাহা দ্বারা খণ্ডমত হইতেছ সেটা কাটাও, আমার মত হইবে।

কিরূপে ?

দেহটা তুমি নও মনটাও—তুমি নও এইটি বেশ করিয়া বুঝিয়া প্রথমে উহাদের দ্রষ্টাস্বরূপে থাক, পরে আপনি আপনি ভাবে থাকিতে পারিবে। এই সব করিতে হইবে—সেই জন্য তোমার কর্ম্ম আছে আমার কোন কর্ম্ম নাই।

কর্ম্ম যতদিন আছে ততদিন কি করিব ?

খণ্ড যতদিন থাকিবে ততদিন কর্ম্ম থাকিবে। কর্ম্ম যতদিন থাকিবে, ততদিন তুমি মা বলিয়া সাধনা কর। বাচিক, শারীরিক, মানসিক কর্ম্ম মা'তে অর্পণ কর। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। কাজেই আহার করেন প্রকৃতি। স্নান, গমন, শয়ন, সন্ধ্যা, পূজা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সমস্ত কার্য্য করেন প্রকৃতি। তোমার দ্বারা যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তোমার চিন্তা, তোমার গমনাগমন, তোমার স্নানাহার, এই সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতিই করিতেছেন ; সকল কর্ম্মে ইহা স্মরণ করিয়া কর। ইহারও কৌশল আছে। কোন একটি মন্ত্রগ্রহণ। ঐ মন্ত্রই তোমার মা। সত্য সত্যই মা। কারণ, রূপ যেখানে যাহা আছে—জগন্নাথের রূপই বল, কৃষ্ণের রূপই বল, সীতারূপই বল, রামরূপই বল, কালীই বল, শিবই বল সবই প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত পুরুষ। মা দ্বারা আবৃত চৈতন্য। করা ধরা, অনুভব করা, যা কিছু তাহা সবই প্রকৃতি। সবই মা। ঐ মন্ত্র স্মরণ করাই মার স্মরণ। যখন যাহা কিছু করিবে মন্ত্র স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে কর। ইহা করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দও। আহার করিতে বসিয়াছ। ভাবনা কর—আহার করেন প্রকৃতি—কুণ্ডলিনীশক্তি, মা। আহারের পূর্ব্বেই বেশ করিয়া স্মরণ কর প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। বেশ করিয়া স্মরণ কর আহার করিবেন মা-কুণ্ডলিনীশক্তি ; আমি তাহাতে আহুতি দিতেছি। পঞ্চপ্রাণকে বাহিরে এবং ভিতরে আহুতি দিয়া—প্রতিগ্রাস অন্ন মন্ত্র জপ করিতে করিতে আহুতি দিয়া শ্যামা মাকে ভাবিতে ভাবিতে আহার কর-ইহাই আহার ; যজ্ঞ। এইরূপ স্নান-যজ্ঞ, গমন-যজ্ঞ, ভাবনা-যজ্ঞ, কথাকওয়া-যজ্ঞ—যজ্ঞরূপে জপে মা'কে ডাকিতে ডাকিতে কর্ম্ম কর ; ইহাই কর্ম্মার্পণ। এইরূপে যখন শারীরিক, বাচিক, ও মানসিক কর্ম্ম মাকে অর্পণ করিতে দৃঢ়-অভ্যস্ত হইলে-তখন দ্রষ্টাভাবে

শিবস্বরূপ হইয়া নিজশক্তির মধুর রূপদর্শনে বিভোর থাকিতে পারিবে। এ অবস্থায় কম্প নাই। আছে চক্ষে-চক্ষে মিলন। ক্রমে এই অবস্থায় সবিকল্প সমাধি ও অস্মিতা সমাধি আসিবে. পরে আসিবে নির্ব্বিকল্প সমাধি।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্বস্বরূপে স্থিতি। আবার ব্যুত্থানে বিশ্বরূপে স্থিতি। এইরূপ কর—দেখিবে আমিই তোমার পূর্ণত্ব কিরূপে? দেখিবে খণ্ড অখণ্ডে মিশিয়া দ্বিত্বরহিত হয় কিরূপে? দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া আত্মরতি আত্ম-ক্রীড় অবস্থায় বিহার হয় কিরূপে?

অপেক্ষা—শুভদৃষ্টি।

পুষ্প-পত্রে সাজাইয়া নির্জ্জন বাসর,
আছি শুধু অপেক্ষিয়া তারি পথ চাহি:
কি জানি আসিবে প্রিয় কোন্ শুভক্ষণে?
কোন্ কল্প লোক হ'তে মায়ানদী বাহি—
সোনার স্বপন তীরে; আগ্রহে অধীর,—
আঁখি পাশে ধরা দিবে বাসনার জন।
যদি নিমিষের তরে আঁখিতে আঁখিতে
হয় চির-আকাঙ্ক্ষিত মধুর মিলন;
তবে কিরে রহে কিছু অতৃপ্ত জীবনে?
পরশে মঙ্গল দিঠি, ধেয়ানে মুরতি—
অবহেলি শত জন্ম পারি যাপিবারে;
নিভৃত পরাণে রচি প্রেমের আরতি।
তাই শশঙ্কিত প্রাণ,—কি জানি যদি গো—
মুহূর্ত্তের আলাপনে থেকে যায় ত্রুটি;
হয় ত হবেনা সারা সমস্ত জীবনে,
স্বপনের জাল যাবে নিমিষেতে টুটি।

মৃ—

৺পুরীতে "তুমি এস" ইহার অভ্যাস।

তুমি এস। আমি তোমায় দেখিয়া তৃপ্ত হই, তোমার কথা শুনিয়া তৃপ্ত হই, তোমায় স্পর্শ করিয়া তৃপ্ত হই।

তুমি এস আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া আনন্দ পাই; তুমি আসিলে কি করিব ভাবিয়া আনন্দ পাই।

তুমি এস। আমি পদধৌত করিয়া দিয়া আহ্লাদিত হই, তোমার চরণ মুছাইয়া দিয়া আহ্লাদিত হই, তোমায় বসাইয়া এই গ্রীষ্মের দিনে তোমায় পাখা করিয়া আনন্দিত হই, তোমায় তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দিত হই।

তুমি এস। আমি তোমায় স্নান করিতে পাঠাইয়া আনন্দিত হই, তোমার আহারের আয়োজন করিয়া আনন্দিত হই, তোমায় বিশ্রামের উদ্যোগ করিয়া আনন্দিত হই, আবার বিশ্রামান্তে তোমার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া আনন্দিত হই।

তুমি এস। সকলের সঙ্গে শুধু তোমায় দেখিয়া, সকলের সংশয় নিবারণ জন্য তোমার কথা কওয়া শুনিয়া আনন্দিত হই। আবার নির্জ্জনে একান্তে তোমায় একা পাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আনন্দিত হই। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার শ্রীমুখে কিছু শুনিয়া আনন্দিত হই।

তুমি এস। তুমি এস। আমি নিত্য ভাবিব। আমি নিত্য অপেক্ষা করিব। আমি নিত্য অভ্যাস করিব—তুমি আসিলে কি করিব। আর উপাসনা ত আমি জানি না। বল ইহাতে কি আমার হইবে না?

যখন ভাবি তুমি যেন আসিলে আমি তোমার সেবা করিলাম, তোমায় বিশ্রাম করিতে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি তোমার প্রসাদ সেবা করিয়া, তোমার নিকটে স্থির হইয়া বসিলাম।

আবার তুমি আমায় আদর করাইয়া বসাইলে—কত আরও আদর করিলে ইহা যখন আমি অভ্যাস করি, তখন আর আমাতে আমি থাকি না। নিত্য যদি ইহা অভ্যাস করি, তবে কি আমার কিছু হয় না?

আর এক কথা। যখন আমার সেবা শেষ হইল, যখন তোমার আদর

সেদিনকার মত নিবৃত্তি হইল, তখন আমি তোমার নিকটে স্থির হইয়া বসিলাম। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—হাঁগা তুমি আমার কে ?

তুমি—আমি তোমার পূর্ণত্ব।

তুমি আমার "পূর্ণত্ব" কিরূপে ইহা আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমি যদি স্ত্রীলোক হই, তাহা হইলেও তুমি আমার পূর্ণত্ব—পুরুষ হইলেও তুমি আমার পূর্ণত্ব। কিসে পূর্ণত্ব হয় ?

তুমি—যাহাতে পূর্ণত্ব হয় আমি তোমার তাই।

স্ত্রীলোক হইয়া যদি আমার মা বলিয়া সুখী হও বা পুত্র বলিয়া সুখী হও বা কন্যা বলিয়া সুখী হও বা সখা বলিয়া সুখী হও বা স্বামী বলিয়া সুখী হও—আমি তোমার তাই। অথবা যদি সব বলিয়া তোমার সুখ হয়, তাহাহইলে ও আমি তোমার তাই।

পুরুষ হইয়া যদি মা বল বা কন্যা বল পিতা বল বা সখা বল বা সখী বল বা স্ত্রী বল—যাহা বলিয়া সুখী হও ,আমি তোমার তাই।

ভাবে আমায় গ্রহণ কর। স্থূল সম্বন্ধে গ্রহণ করিও না। ভাবের সম্বন্ধ মধুর, স্থূলের সম্বন্ধে দোষ আছে।

একা বসিয়া আমি যে ভাবের মানুষ তাহাই ভাবিবে ; স্থূল গুরুতে বা স্থূল নায়কে আমাকে আরোপ করিতে যাইও না।

গুরুর নিকট হইতে সন্ধ্যা-পূজা জানিয়া কখন সন্ধ্যা-পূজা সারিয়া তুমি এস ইহার অভ্যাস করিবে ; কখন "তুমি এস" ইহার ভাবনা করিয়া, ভাব আনিয়া, সন্ধ্যা পূজা করিবে। এই এক প্রকার।

আর এক প্রকার আছে। কখন তুমি এস বলিয়া তারে ডাকা। কখন নিজে তাহার নিকটে মানসে যাওয়া।

তোমার কল্পনা-শক্তি সর্ব্বদা স্বাধীন। কল্পনায় তাহার কাছে যাও। প্রথমে সংসার-সাগরের তীরে আইস। সেখানে পদ্মের উপর উঠিয়া সুধা সাগরের মধ্যে মণি দ্বীপ—তাহার নানা বাটিকা—সরোবর—সরোবরের তীরে মণ্ডপ—মণ্ডপের চারি ধারে সপ্তাবরণ। প্রথম আবরণে বিমলাদি সখী, দ্বিতীয়ে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি মূর্ত্তি ধরিয়া, তৃতীয়ে গায়ত্রী নিজে মূর্ত্তি ধরিয়া, চতুর্থে ব্রহ্মাদি দেবতা, পঞ্চমে বশিষ্ঠাদি ঋষি, ষষ্ঠে গঙ্গাদি নদী, সপ্তমে দেবতার পৃথিবী উদ্ধারের সহায়

এইগুলি পাত্র হইলে মন্দির, কল্পতরু, রত্নবেদী সিংহাসনে আমি তোমার ইষ্টদেবতা। এ করিলেও হয়। যাহার যাহাতে সুবিধা।

সন্ধ্যাপূজা অন্তে এই ভাবে মানসে তাঁহার সঙ্গ—ইহা উপাসনা।

তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে আমি কে, জগৎ কি বিচার—ইহাতে সদ্যো-মুক্তি। এখন যাহার যাহাতে রুচি। সব না পার, যতটুকু পারিবে তাহাতেই সেই লোকে গতি হইবে।

শ্রীগুরু।

বিপদভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন
তুমি নারায়ণ, গুনি চিরকাল।
জরা, ব্যাঘ্রীবেশে অন্দরে প্রবেশে,
ব্যাধি আসি, সায় করিবে কঙ্কাল॥
অনুচর সহ, মৃত্যু অহরহ,
আশে পাশে থাকি, করিছে হুঙ্কার।
ভীষণ দুস্তর, কামাদি মকর
বাসনা-সাগরে, বীভৎস আকার॥
ভয়ে কাঁপে প্রাণ, রক্ষ ভগবান্,
অনাথের নাথ! তুমি যে সবার।
থাকিতে সময়, এস দয়াময়,
দেখি নাম-নামী দু'য়ে একাকার॥
কোথা মৃত্যুভয়, ব্যাধি বা কোথায়,
কামনা সাগর নিমিষে শুখায়।
যেন অনুগত, প্রভুভক্ত মত
চিরদাস, চিত্ত শ্রীপদে লুটায়॥
কল্পনায় চিত্র, আঁকিল বিচিত্র,
সমদুঃখ কত অদ্ভুত রচনা।
মন-শিল্পীকর, এবে নিরন্তর,
যেন সে কখন কিছুই জানে না॥

জনমি শ্রীপদে, তুলিয়া সম্পদে,
বহুলক্ষ যোনী সহিয়া যন্ত্রণা—
যদি পাও তুমি, পুণ্য জন্মভূমি,
গুরু-কৃপাবলে ছেড়না ছেড়না ॥
চির-শুভকরী, শ্রীগুরু শ্রীহরি,
বীজরূপে প্রাণে করিছে ঘোষণা।
গুরু নারায়ণ, বিপদ-ভঞ্জন,
তবে বল মন কিসের ভাবনা ॥
গুরুবাক্য জ্ঞান, গুরুবাক্য ধ্যান,
অমূল্য চরণে পড়িয়া থাক না।
যা করিতে হয়, করিবে নিশ্চয়,
কেন মর ভেবে আপন-ভাবনা ॥
তোমার নিয়ন্তা, গুরু হর্ত্তা কর্ত্তা,
কেন কর্ত্তা সাজা এ সং সেজনা।
বহু অনুরাগে, পঞ্চ-অঙ্গরাগে
সাজায়েছ তনু, উপায় শোন না ॥
গুরু-পাদজলে, নিতুই সিঞ্চিলে,
কাঁচা রং আর কখন রবে না।
অমৃত পরশে, পরম হরষে,
সীতারাম বলি কেবল ডাক না ॥

রা

দাস ভাব।

আমার এমন দিন কি হ'বে যখন আর আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে হইবে না? নিজের ইচ্ছায় কিছু করা যেন আমার বড়ই ভার বোধ হইয়াছে। আমি যেন আর কাহারও ইচ্ছায় চলিতে চাই, ফিরিতে চাই, কথা কহিতে চাই, সব করিতে চাই, সব না করিতে চাই। এই আমার সুখ-স্বপ্ন।

আহা! ইহা অপেক্ষা মধুর স্বপ্ন ত আমি ধারণা করিতে পারি না। আমি চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া থাকিব, সে আমায় বলিবে এই কর; আমি প্রাণ ভরিয়া তাহার কর্ম্ম করিব, করিয়া আবার তাহার কাছে আসিব, আবার তাহাকে দেখিব, দেখিয়া দেখিয়া আমার আর নিবৃত্তি হইবে না।

এ আমার কে যার জন্য আমি নিজের বলিতে যাহা আছে সব ত্যাগ করিয়া, দাস হইয়া, দাসী হইয়া সেবা করিতে চাই? এ আমার কে যার জন্য আমি নিজের বলিতে যাহা আছে সব বিকাইয়া, ঐ চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাই?

মহাদেবের অত্যন্ত সুখ কখন?

যখন বিভোর হইয়া তিনি নৃত্য করেন।

এ কখন হয়?

যখন 'নিজশক্তি উমাং পশ্য" তার পরে আছে "মহেশ ইব নৃত্যসি"। নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া মহেশ্বরের যে আনন্দ—সেই আনন্দে মহেশের নৃত্য;—ইহা অপেক্ষা আর আনন্দ কোথায়?

প্রথম প্রথম ত নৃত্য থাকে না; প্রথম প্রথম ত চলন থাকে না। যখন দৃশ্য সংসারকে শ্মশান করিয়া, সংসারকে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম গায়ে মাখিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়; যখন মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রিয়বস্তুকে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মের বিভূতি লইয়া আভরণ করা সার হয়; যখন সদ্য-প্রাণসংহারকারী বিষধর সর্প অঙ্গে জড়াইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়; যখন মরিতে চাহিলেও মরণ হয় না; কালকূট বিষেও প্রাণ যায় না—যখন দিন নাই রাত্রি নাই, সকল সময়ে শ্মশানে মশানে সকলের পরিত্যক্ত ভয়ানক স্থানে, ভয়ানক দ্রব্যমধ্যে বেষ্টিত হইয়া, কাহার অপেক্ষায় যেন মৃতপ্রায় হইয়াও প্রাণরাখা মাত্র হয়; শবপ্রায় হইয়া শবরূপে যেন কার অপেক্ষায় চেতোমুখ হইয়া থাকিতে হয়—এইরূপে থাকিতে থাকিতে যেন হৃদয়ে কার সাড়া পাওয়া যায় ধীরে ধীরে তখন যেন শুভ্র নির্ম্মল জ্যোতির পাপড়ী হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। সেই জ্যোতির পাপড়ীগুলি সংলগ্ন হইয়া, কত সুন্দর একটি পদ্ম ফুটিয়া উঠে। উগ্র ভাবনায় দেখিতে দেখিতে পদ্মের ভিতর হইতে একটি মূর্ত্তি জাগিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে পদ্ম আর দেখা যায় না—দেখা যায় একটি মূর্ত্তি।

কি সুন্দর সেই মূর্ত্তি! বিমল শুভ্র জ্যোতিরাশির সুন্দর মহেশ্বর। মহেশ্বর বক্ষ বিস্তার করিয়া পড়িয়া আছেন—সেই বক্ষের উপরে কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী

বিগলিত চিকুরা, প্রসন্ন স্নেহবদনা, দন্তচ্ছটায় উদ্ভাসিত রূপমাধুরী, সুন্দর হিমকর-বদনা, দয়মান দীর্ঘনয়না, আলোকবক্ষে নীলমেঘের মানুষী-মূর্ত্তি কি সুন্দর! বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া এই মূর্ত্তি—আর পদতলে যিনি তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহারই পানে চাহিয়া। স্থিরদৃষ্টি দেখিয়া মনে হয়,—শবপ্রায় পুরুষ যেন ঐ রমণীয়াঙ্গী রমণী-মূর্ত্তিকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছেন। যখন চেনা হইয়া যায়, যখন ঠিক হইয়া যায় এই আমার সর্ব্বসাধনার সমষ্টিস্বরূপিণী, যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় এই আমার নিজশক্তি, তখন একটা অপরিচ্ছিন্নের পরিচ্ছিন্ন ভাব আইসে। সেই দেহ তখন ঐ অসীম আনন্দকে আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারে না তখন সাধক সমস্ত অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে দেখিয়া নৃত্য করেন। সেই দেখা অবধি তিনি দাসরূপে তাঁহারই ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যান।

অপরোক্ষানুভূতি।

আপন জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া 'তুমিই সেই' এইটি অনুভব করার নাম অপরোক্ষানুভূতি।

এই অনুভূতি হইলে কোন্ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইবে?

স্থিরনিশ্চয় হইবে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এই আত্মা কোনসময়ে জন্মগ্রহণ করেন না, কখন মৃতও হয়েন না। ভূত্বা উৎপন্ন হইয়া—বা ভূয়ঃ পুনরায়—ন ভবিতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন—ইতি ন ইহা নহে। ইনি জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ, বিকারশূন্য, অপরিণামী। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

আমি—আমার জীবাত্মা—এইরূপ ইহা অনুভব হইলেই অপরোক্ষানুভূতি হইল।

আমি জন্মাই নাই, আমি মরিবও না, দেহ নষ্ট হইলেও আমি যা' তাই আছি—এইটির অনুভব হইলে কি হইবে ?

এইটি হইলেই মোক্ষলাভ হইল। এইটি হইলেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইল। বিনা সাধনায় কখন মুক্তি হইবে না।

মহা প্রলয়ে জীব প্রকৃতিতে সংস্কারসহ লীন থাকে মাত্র। ঐ সংস্কার থাকে বলিয়া, আবার জীবকে সৃষ্টিসময়ে দুঃখভোগ করিবার জন্য সংসারে আসিতে হয়। যতদিন না সাধনা দ্বারা সমস্ত বিষয়-সংস্কার নাশ করিতে পারে, ততদিন জীবকে পুনঃ পুনঃ এই মৃত্যুসংসার-সাগরে ভাসিয়া আসা করিতেই হইবে!

আর এক কথা। জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম ভোগ হয় কিরূপে? বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে সত্য, কিন্তু জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সহকারী কারণ না থাকিলে কখনও বীজ হইতে বৃক্ষ হইতে পারে না। সেইরূপ ভোগের বস্তু না পাইলে, ভোগও হইতে পারে না। জীবের কর্ম্মক্ষয় করিয়া জীবকে মুক্তি সুখ দিবার জন্য, সগুণব্রহ্ম বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। শ্রুতি বলেন—"উতাহমৃতস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি"।

মুক্তির সাধনা কি তাহাই ত প্রয়োজন।

প্রথমে বিচার কর নিত্য কি, অনিত্য কি? যাহা নিত্য তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা অনিত্য তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অনিত্য লইয়াই জীব মত্ত থাকে। ইহাকে বিষয়বিরাগী করিতে হইবে। ভোগমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। সকল প্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ কর। সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, সবই দুদিনের জন্য, সমস্তই মায়া—পুনঃ পুনঃ ইহার অভ্যাসে ভোগে রুচি থাকিবে না! ইহার পরে মনকে নিত্যবস্তুতে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়, মনকে অনিত্যবস্তুতে যাহাতে টানিয়া আনিতে না পারে, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়নিরোধ করিতে হইবে। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের উপরে জোর নাই বলিয়া, উহাদিগকে সহ্য করিয়া করিয়া দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইতে হইবে। সেই নিত্য-বস্তুতেই রতি রাখিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে যেন কিছুতেই অবিশ্বাস না হয়। কোন কিছু হইল কি না হইল সে দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া, গুরু ও শাস্ত্র আজ্ঞা বলিয়া শ্রদ্ধা সহকারে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। এই সমস্ত করিতে করিতে মুক্ত হইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিবে। তখন অন্য কর্ম্ম

ত্যাগ করিয়া 'তুমিই সেই' ইহার বিচাররূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে হইবে।

এই সমস্ত সাধনা কি বিষয়ীর হয়? না তা হয় না। বিষয়ীর চিত্ত সর্ব্বদা অশুদ্ধ। তজ্জন্য তাহাকে—ভগবান্ প্রসন্ন হও—এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তাদি পূর্ব্ব-পাপনাশক কর্ম্ম এবং উপাসনাদি চিত্তশুদ্ধির কর্ম্ম প্রতিদিন অনলসে করিয়া যাইতে হইবে। এই সমস্ত সাধনায় বিষয়ীর বিষয়াশক্তি দূর হইয়া, চিত্ত রাগদ্বেষরূপ মল বর্জ্জিত হইবে।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিবিদিষা সন্ন্যাস লইতে হইবে। ইহার পূর্ব্বের সাধনাই বলিলাম। বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কার্য্য তত্ত্বজ্ঞান। ইঁহাদের সাধনা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

তত্ত্বজ্ঞান পরিপক্ক হইলে তবে বিদ্বৎসন্ন্যাস। বিদ্বৎসন্ন্যাসীর কার্য্য তত্ত্বাভ্যাস—আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। ইহাদের সাধনা ঐ অভ্যাসের সঙ্গে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় করা। যোগের শেষ অবস্থায় মনোনাশ হইবে এবং ভোগে অরুচি হইলে বাসনা ক্ষয় হইবে: সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ই বিদ্বৎসন্ন্যাসীর কার্য্য! সন্ন্যাসীর কোন কর্ম্ম নাই। এই সমস্ত মানসিক ব্যাপার মাত্র।

যাঁহারা তত্ত্বাভ্যাসী হইতে পারেন নাই, এবং তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করিতে পারিলেন না অথচ যাঁহারা উপনিষদাদি শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধক জন্য "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইল না তাঁহারা কি করিবেন?

মোক্ষলাভ জন্য ইঁহারা উপাসনা করিবেন। পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞান দ্বারা যেরূপ পরমতত্ত্বে স্থিতিরূপ মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা দ্বারাও মুক্তিলাভ হইতে পারে।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অত্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

গীতা পরিচয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বিজ্ঞপ্তি।

গীতা পরিচয়ের প্রথম সংস্করণ বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। সুবিধা হয় নাই বলিয়া, এতদিন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রন করা হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। মূলতত্ত্ব এক থাকিলেও, বিষয়গুলিকে বিশদ করিবার জন্য এই সংস্করণ।

নূতন সংস্করণে দুইটি নূতন অধ্যায়ও সন্নিবেশিত হইল। এই দুইটি অধ্যায়ের নাম হইবে গীতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্ম এবং গীতার রক্ষা মন্ত্র।

পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনের দুই একটি কারণ উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" যাহারা যে প্রয়োজনে আমাকে আশ্রয়ে করে, তাহাদিগকে সেই ফলদানেই আমি অনুগ্রহ করি।

স্বাধ্যায়সম্পন্ন সাধক যেমন যেমন শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ সাধনা দ্বারা এই বেদত্রয়ী তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী মুক্তিগেহিনীর আশ্রয়ে আগমন করেন, তিনি ততই যেন ইঁহার অনুগ্রহ অনুভব করেন।

শ্রীগীতা একবার অধ্যয়ন কর, মনে হইবে যেন ইহাতে কত কি আছে, যেন কত কি ইনি দেখাইবেন আশ্বাস দিতেছেন ; আবার পড় নূতন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত হইল ; আরও পড় আরও রমণীয় ; মনে হয় যেন ইহার শেষ নাই।

শ্রীগীতা ব্রহ্মস্বরূপিণী। শ্রীগীতা জ্ঞানময়ী। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার ভক্তের যে কোন ভক্ত যে ভাবে ইঁহার ভজনা করেন, ইনি সেই ভাবের মধ্য দিয়াই যেন ইঁহার আশ্রিতকে—এই কোলাহলময় জগতের অন্তস্তলে যে এক রমণীয় নিস্তব্ধভাবজগৎ আছে, প্রতিগতির অভ্যন্তরে যে এক পরমশান্ত স্থিতি আছে—ধীরে ধীরে শত সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে সেই স্থানে লইয়া যান।

শ্রীগীতা আনন্দময়ী। সাধনা দ্বারা ব্যাকুল হইয়া যে কেহ ইঁহার রূপ দেখিতে উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত হয়েন, ইনি যেন ইঁহার আশ্রিতকে আপনার স্থূল স্থূল আবরণ উন্মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে আপনার যথার্থ স্বরূপ যে সেই রমণীয় দর্শন তাঁহাকেই দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

শ্রীগীতা রঙ্গময়ী। জগৎস্বরূপিণী বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার অনুসরণ করা যেমন কঠিন, শ্রীগীতার অনুসরণ করাও যেন সেইরূপ দুরূহ। ভদ্রার সারথ্য-নৈপুণ্যে অর্জ্জুনের রথগতির মত এই বিশ্বনর্ত্তকী কখন জনমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করেন, পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া যান ; মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলার মত কখন ইনি শূন্যে চমকাইতেছেন, কখন মেঘমধ্যে লুক্কায়িত হইতেছেন ; সুদীর্ঘ জলাশয়ে বৃহৎ মৎস্যের মত কখন নিকটের জল আলোড়িত করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার দূরে চলিয়া গিয়াছেন ; কখন মনে হইল বুঝি ধরিলাম, পরক্ষণেই কোথায় চলিয়া গেল—শ্রীগীতার পশ্চাদ্ধাবন যেন এইরূপ বিস্ময়কর।

জগৎস্বরূপিণী মায়ার চাঞ্চল্যাভ্যন্তরে যেমন স্থির শান্ত রমণীয় দর্শন বিরাজ করেন, শ্রীগীতাবস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিত তনী উপনিষদ্ দেবীও যেন এই খানে সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন। অধিক কি বলা যাইবে, মহাকাশ, চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ ছাইয়া শ্রীগীতার রূপরাশি ত্রিজগৎ চমৎকৃত করিতেছে।

যিনি সমকালে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, যিনি সমকালে পরমাশ্চর্য্যরূপধারিণী মায়ামানুষী, সর্ব্বনরনারীবিজড়িত সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমসম্মিলিত বিশ্বরূপিণী, আবার আপন সৃষ্টি আপনি বিনাশ করিয়া, দৃশ্যগরল আপনি নিঃশেষে পান করিয়া, দৃশ্য-প্রপঞ্চ আপন আত্মায় নিঃশেষে পরিপাক করিয়া, যিনি

আপনাতে আপনি,—তাঁহার সমগ্ররূপ দর্শন যে আমাদের মত ক্ষীণপুণ্য, সাধন-কাতর দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সুদূরপরাহত, ইহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ?

গীতা অধ্যয়ন এক জীবনের কেন, যতদিন না জীবন্মুক্তি লাভ হয়, যেন তত জীবনের কার্য্য। জীবন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝি ইহার ভাব স্থায়ীভাবে জীব-চৈতন্য বিন্দুকে, ব্রহ্ম-চৈতন্য সিন্ধুতে মগ্ন করিয়া রাখে না।

মনে হয় দ্বিতীয় বারের আলোচনায় শ্রীগীতা আরও একটু উজ্জ্বলভাবে অসিয়াছেন। এমন কতবার হইতে পারে, কে বলিবে ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীগীতার অনুগ্রহ ভিন্ন শ্রীগীতা বুঝিতে বুঝি পারা যায় না।

যদি কাহারও শরণাপন্ন হওয়া যায়, তবে আশ্রিতকে আশ্রয়দাতার ইচ্ছা অনুসারে চলিতে হয়; নতুবা আশ্রয়-গ্রহণটা মৌখিক। যদি শ্রীগীতার আশ্রয় লইতে হয়, তবে শ্রীগীতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ অনুভব করিতে হইলেও, তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

কোথায় তাঁহার আজ্ঞা পাওয়া যাইবে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে বলিতে হয় বেদে পাওয়া যায়; অধ্যাত্মশাস্ত্রমাত্রেই পাওয়া যায়। গীতার মত পুস্তকে বিশেষরূপে পাওয়া যায়।

গীতা-শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানের আজ্ঞাগুলি বাছিয়া লইয়া যিনি যেটি পালন করিতে পারেন তজ্জন্য প্রাণপণ করুন; শ্রীগীতার অনুগ্রহ যে বুঝিতে পারিবেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গীতাগ্রন্থকে মানুষের মত জীবন্ত মনে করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অনেকে মনে ভাবিতে পারেন ইহা কি প্রকার ভক্তি ? পুস্তক আবার মানুষের মত কিরূপে হইবে ? আবার কেহ কেহ ইহা সত্যও ভাবিতে পারেন। "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। যাহা শ্রীভগবানের হৃদয় তাহা জড় বলিয়া নাই ভাবা হইল—ইহাতে কি কিছু অতিরঞ্জিত আছে ? মানুষের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়; এইগুলিকে মানুষ বলা হয় না। স্থূল আবরণগুলিকে জীবন্ত করিয়া যে চৈতন্য পুরুষ বিরাজিত, তিনিই মানুষ।

জড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। গীতা-গ্রন্থের অক্ষরগুলিকে শব্দমাত্র বলা হইলেও সেই শব্দরাশির অর্থ দ্বারা যে আত্ম-

দেব প্রকাশিত তিনিই শ্রীগীতা। ইনিই সমকালে অক্ষর বা অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ, ইনিই মায়ামানুষ বা মায়া-মানুষী। জড় আবরণটি মায়া, ভিতরের হৃদয়টিই আত্মদেব বা আত্মদেবী।

এই আত্মদেব বা আত্মদেবীর নাম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন :—

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥
অর্দ্ধ মাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥
ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরোনিশ্চল মানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥

হে অর্জ্জুন! গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ইত্যাদি নাম যিনি নিশ্চল-চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি সর্ব্বদার জন্য জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন, এবং অন্তে পরম শান্ত নিশ্চল আনন্দস্বরূপ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ এই ত্রিপাদের ঊর্দ্ধে যে পরম পদ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতিলাভ করেন।

সর্ব্বজ্ঞান-প্রয়োজিকা ধর্ম্মময়ী শ্রীগীতাকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমস্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার, গীতাই আমার অত্যুগ্র অব্যয়-জ্ঞান, গীতাই আমার রমণীয় বাসভবন, গীতাই আমার পরম পদ। অধিক কি গীতাই আমার পরম গুহ্য; গীতাই আমার পরম গুরু।

শ্রীভগবানের পরম গুরু যিনি তাঁহাকেও চৈতন্যময়ী বলিতে কি আপত্তি হইতে পারে ?

শেষ কথা। "কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্,ব্যাসো বা ব্যাস-পুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ"—

যাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় কৃষ্ণই সম্যক্ জানেন, অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ ফল অবগত, ব্যাসদেব বা শুকদেব বা যোগী যজ্ঞবল্ক্য বা জনক কিঞ্চিৎমাত্র জানেন তাঁহার সম্বন্ধে অকিঞ্চন এই ছার জীবে কি জানিবে ? তথাপি কোন্ সংস্কারবশে এই অসাধ্যসাধনও ছাড়িতে দাও না, তাহা বুঝিব কিরূপে ? জীব কি আপন ইচ্ছায় এইরূপ কার্য্য করে, অথবা তোমার ইচ্ছায় চালিত হইয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা কে বুঝাইয়া দিবে ? অথবা বুঝিবারই প্রয়োজন কি ?

হে অগতির গতি ! যে দিকদিয়াই লইয়া যাও-হে আত্মদেব-আমাদের এই কর যেন সকল কার্য্যে মানুষ তোমার অনুগ্রহ কামনা ভিন্ন অন্য কামনা না করে, যেন সমস্ত ফলকামনা ত্যাগ করিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে তোমার আশ্রয়ে নিরন্তর থাকিতে পারে। জনন মরণে তুমি মাত্র আশ্রয় দাতা। হে অধমজনের ত্রাণকর্ত্তা ! হে পতিতপাবন ! হে পাপীতাপীর আশ্রয় ! হে ক্ষমাসার ! প্রভু ! কি আর বলিব, প্রার্থনা করিতেও জানি না। তথাপি এই বলি, ভৃঙ্গ যেমন কমল মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে আরাম পায়—তাপত্রিতয় জ্বালামালাকুল আমরা যেন সর্ব্বদা এই জ্বালা অনুভব করিয়া, কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, তোমার পরমপদে, তোমার মধুর চরণকমলে চিরাস্থিতি লাভ করিতে পারি। হে অব্যক্ত স্বরূপ ! হে বিশ্বরূপ ! হে স্বেচ্ছামৃত বিগ্রহ ! তোমার এই ত্রিবিধ রূপ দর্শন করিব ; এই উৎকণ্ঠস্ফুটিত চিত্তে যেন নিরন্তর তোমাকে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি ; প্রভু ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮,
মহাবিষুব সংক্রান্ত।
বলিহার।

ব্রজলীলা-গান।

জাগ পৌর্ণমাসি! মা কুলকুণ্ডলিনি!
চতুর্দ্দল পদ্মে আছ কি মা নিদ্রে উঠ জননি!
সহস্রদল পদ্মে পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে
জীবাত্মা রাধায় হইয়ে সহায়
মিলন কর ব্রজলীলাকারিণী॥
চিত্রা চিত্ত-পটে পলক রাখিয়ে
দেখাইতে রূপ পশিল হৃদয়ে
সমাধি মিলন ভাবে ভাবিনী॥
ললিতা আচার্য্য হৈল উপদেশ
কৃষ্ণনাম আত্মতত্ত্ব সবিশেষ
শ্রবণে রাধার হ'ল প্রেমাবেশ
বিরাগে অনুরাগিনী॥
বৃন্দা প্রণব ডাকিছে রাইকে লয়ে যেতে ধীর সমীরে
ষট্‌চক্রপরে কর অভিসার
গোপন স্থানে যাবেন গোপিনী॥
কুল শীল মান সংসার পরিত্যাগ
বিধি ধর্ম্মপ্রতি নাহি অনুরাগ
এ সমাজ ছাড়া কলঙ্কিনী
পরকীয় পর-পতি কৃষ্ণ সঙ্গে
পরকীয় রূপ লীলা কত রঙ্গে
যতেক ব্রাহ্মণী রাস-রস বিলাসিনী
অন্তরে প্রকৃতি বাহে পুংসাচার
তবে হবে এই সেবায় অধিকার
কবে সেবায় মগ্ন হবে মন আমার
হয় গোবিন্দের চিন্তা দিবারজনী।

সমাধি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতেছে। ব্রজলীলা ও মিলনসমাধি। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মলীলাকে দুইপ্রকার বলা হইয়াছে।

লীলৈব দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যবহারিকী। বাস্তবী তৎ স্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যবহারিকী। আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাস্তগা কচিৎ। বাস্তবী ও ব্যবহারিকী লীলা এই দুই প্রকার। বাস্তবীলীলা নিজে জানা যায়। ব্যবহারিকীলীলা সাধারণ জীবের জন্য।

কিন্তু বাস্তবীলীলা ভিন্ন ব্যবহারিকীলীলার মর্ম্ম অনুভব হয় না। আবার ব্যবহারিকীলীলা ভিন্ন বাস্তবীলীলার অনুভব হয় না। উপরের গানটিতে বাস্তবীলীলার কথা সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। রচয়িতা যিনিই হউন তিনি যে ব্যবহারিকীলীলাকে বাস্তবীলীলাতে আনিয়া সাধকের সাধনার সুবিধা যাহা তাহাই দেখাইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিলনসমাধি বা ব্রজলীলা ভিন্ন অন্য প্রকার সমাধির কথাও যোগশাস্ত্রে দেখা যায়।

(১) মনকে শরীর হইতে বিভিন্ন করিয়া পরমাত্মার রাখার নাম সমাধি। ইহাতে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ইহা সাংখ্যসমাধি।

(২) "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য বিচারজন্য অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন জন্য সমাধি লাভ হয়। ইহা বেদান্তসমাধি।

(৩) শাম্ভবী মুদ্রা দ্বারা বিন্দু দর্শন করিয়া সেই বিন্দুতে মন রাখাও সমাধি। এই সমাধিতে আকাশের মধ্যে বিন্দু ভাবনা এবং বিন্দুর মধ্যে আকাশ ভাবনা। বিন্দুই জীবাত্মা এবং চিদাকাশই পরমাত্মা। ইহা ধ্যানযোগসমাধি।

শ্রীমতীর প্রণয়।

সখিরে! কি কহিব শ্যাম কি মোহন?
না দিল আমারে বিধি শতেক বদন।
রসনা, করিতে অনুভব প্রকাশিত,
বহুভাব সমাবেশে বচনরহিত।
সহজে অবলা নাহি ভাষা-পরিচয়,
ভাব কহিবারে পদ-সঙ্গতি না হয়।

তথাপি কহিতে কথা মোহন শ্যামের
বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি হয় অন্তরের।
শ্যামের প্রসঙ্গ তোরা কহিস্ যখন
কত যে আরতি প্রাণে, কত ফুল্লমন।
শুনিতে শুনিতে সখি শ্যামের বাখান,
ভাবিতে ভাবিতে রূপ, অবশ পরাণ;
ভুলে যাই আপনারে শ্যাম ধ্যান, জ্ঞান,
রাধা, রাধা নাই, শ্যামে নিমজ্জিত প্রাণ।
সখিরে! কি হেরিছি রূপ সে মোহন!
নয়নে প্রথমে হেরি সার্থক জীবন।
সেরূপ জাহ্নবীজল, নেত্র-পরশন
পেয়ে, পাতকিনী হ'ল পাপবিমোচন।
হেরিয়াছি বররূপ সুন্দর কানাই,
মরিতে এখন সখি আর দুখ নাই।
সে মোহন শ্যামরূপ ভুবনের সার
দেখি জীবনের মূল্য মিলিল রাধার।
শ্যামরূপ সখি কিরে! এত প্রলোভন?
কতদিন হেরিয়াছি রূপ সে মোহন,
অন্তরের তৃষা তবু না হ'ল পূরণ;
আঁখিতে অঙ্কিত কেন নহে প্রিয়জন?
সখি রে!
একবার মাত্র হেরি কি, সে তৃপ্তি হয়?
নিরন্তর প্রিয় কেন আঁখি আগে নয়?
ভাগ্যবতী কমলিনী প্রেমনীরে ভাসি
শতদলে সদা রাখে দীননাথে হাসি।
অভাগিনী রাধা, সখি! দিনান্ত যখন,
মনঃখেদে সারাদিন করিয়া যাপন,
যমুনার তীরগাহে, সন্ত্রাসে গোপনে,
ক্ষণকাল শ্যামরূপ হেরিল নয়নে;

আধ-চোখে আধ-দেখা আশা না মিটিল,
বরং পিপাসা তায় দ্বিগুণ বাড়িল।
অতৃপ্ত-বাসনা, সখি! আমি অভাগিনী;
কেবল লাভের মধ্যে গঞ্জনাভাগিনী।
সখি রে রাধার দু'টি মানব-নয়ন,
বঁধুর অসীমরূপ সে দেব-মোহন।
সে সাগর-দিব্যরূপ, চষক নয়নে,
পান করি শেষ, সখি! কভু হয় ক্ষণে?
সখি। শ্যামরূপ হেরি নিতান্ত বিকল,
আবদ্ধ নয়নরূপে হ'য়ে অচঞ্চল।
চলৎ চরণ, শ্যামে হেরিলে অচল,
সেরূপ নেহারি মূঢ় ইন্দ্রিয় সকল।
কিংবা তীক্ষ্ণ গুপ্তদ্বার করি উদ্‌ঘাটন,
মোহিত হইয়া তারা করে বিলোকন।
আমিও বিহ্বল হ'য়ে রূপ করি ধ্যান,
অন্তরে বাহিরে শুধু সেইরূপ জ্ঞান।
অন্য জ্ঞান নাহি চিত্ত বৃত্তি শ্যামময়,
সেরূপ জাগ্রত শুধু—রাধা, রাধা নয়।

যে—

অহল্যা।

অবতরণিকা।

অহল্যার চরিত্রে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

কেন?

আজকালকার সমাজে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, নানা কারণে কলঙ্কিত। পবিত্র থাকিবার যে সমস্ত উপায় এখনও আছে, সেগুলি নানা কারণে লঙ্ঘন করা হইতেছে। যেখানে রিপুর প্রশ্রয় হয়—সেই সমস্ত কুসঙ্গ করাও হইবে, অথচ পবিত্রও থাকা যাইবে ইহা অসম্ভব। সেজন্য অনেকের জীবনে

অপবিত্রতার কার্য্য করা হইয়া গিয়াছে। রিপুর কার্য্য লইয়া কিন্তু মানুষ চিরদিন থাকিতে পারে না। যৌবনের বেগ কিছু ক্ষীণ হইলেই, মানুষ বুঝিতে পারে অপবিত্রতা ঘৃণার বস্তু। স্বামীকে গোপন করিয়া রিপুর প্রশ্রয়ে কোন কিছু করা, ঘোরতর অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মের ফলও অতি ভয়ানক।

যখন সংসারের ধাক্কা খাইয়া মানুষ কাতর হয়, হইয়া শ্রীভগবান্‌কেই এক মাত্র সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে চায়; এক কথায় যখন কুপথ ছাড়িয়া সুপথে ফিরিতে চায়, তখন তাহাকে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হয়। সে তখন অপবিত্রতার কার্য্য ছাড়িয়াছে সত্য সে তখন ঈশ্বর-উপাসনা করিতে চায় সত্য, সে তখন নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ ভগবৎ আজ্ঞা পালন করিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে সত্য কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করিবার সময়েও তাহার মন স্থির হইবে না; এক চিন্তা করিতে অন্য অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে, এক ভাবিতে আর ভাবিবে। এই ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতেও পারিবে না। কাজেই তাহার চিত্ত স্থির হইবে না। নানা উপায়ে যেমন সংগীতের সাহায্যে বা ধর্ম্মবক্তৃতার সাহায্যে ক্ষণকালের জন্য ভগবৎরস আসিলেও যেমন ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির হইবে অমনি সব ভুলিয়া যেমন ছিল সেইরূপই থাকিবে। সরলভাবে যদি লোকে মনের কথা কয় তবে দেখা যায় অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এইরূপ।

ধর্ম্ম করিতে চাহিলেও ইহারা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য কর্ম্ম করে না বলিয়া ইহারা শান্তি পায় না। আবার যতদিন হৃদয়ের রাজাকে বুঝিতে না পারে, যতদিন তাঁহাতে নির্ভর করিতে না শিখা করে, যতদিন তাঁহাকে অগ্রে স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে অগ্রে জানাইয়া মানসিক, বাচিক ও শারীরিক কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করে—এক কথায় সর্ব্বকর্ম্ম সেই হৃদয়ের রাজাকে সমর্পণরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ না করে, ততদিন শুধু নৈতিক উপদেশ মত চলিতে গেলে তাহার পদে পদে পদস্খলন হয়। ফলে ঈশ্বরকে যে হৃদয়ে জাগাইতে না পারিয়াছে, সে ব্যক্তি শুধু উপদেশ বাক্য দিয়া চরিত্র গঠন করিতে কিছুতেই পারে না। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইলেও ইনি ধর্ম্মবক্তৃতা বেশ করিতে পারেন, লোককে উপদেশও বেশ দিতে পারিবেন; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার চরিত্র অন্যরূপ হইবে। এরূপ ব্যক্তির

পোষাকী ও আটপৌরে চরিত্র থাকিবেই। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মজগতে স্থান হইতেই পারে না, কাজেই মনের শান্তিও থাকিতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই জীবন কাটে; প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে না। আবার যতদিন উন্নতি হইতেছে ইহা বুঝিতে না পারা যায় ততদিন কিছুতেই উৎসাহ থাকে না। অনুৎসাহে কর্ম্ম করিতে গেলে ভিতরে বহু বিষয়ে বিকৃতি ঘটে। কাজেই নানা প্রকার রোগও জন্মে। শেষে বড় দুঃখে এই জগৎ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়।

আমরা অহল্যাচরিত্রে অহল্যার পাপ কিরূপে হইয়াছিল দেখাইব। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু পাপ করিয়াও আবার পবিত্র কিরূপে হয় তাহা প্রদর্শন করা। এইটীই আধুনিক সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

যে পাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা ত ঘটিয়াছে কিন্তু পাপের প্রতীকার কিরূপ এবং প্রতীকার করিয়া আবার পবিত্র হওয়া কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্যই অহল্যাচরিত্র অঙ্কন।

ধর্ম্মভাবের শিথিলতা ও শাস্ত্র প্রয়োজন।

১

ধর্ম্মভাবের শিথিলতা

যাহাদের সকল কর্ম্ম ধর্ম্ম-জড়িত, তাহাদের ধর্ম্ম-শিথিলতার কারণ কি?

(১) চার্ব্বাক মত প্রতিষ্ঠা।—চার্ব্বাক মতটি এইরূপ। আচার অনুষ্ঠানের ক্লেশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ভাল লাগিবে তাহাই আহার করিবে। শুচি অশুচি মনের ভ্রম। মন শুচি থাকিলেই হইল। বিষ্ঠা ভাণ্ড ত সঙ্গেই আছে; তথাপি তুমি কাপড় ছাড়িয়া, স্নান করিয়া, কি আর শুচি হইবে? মল-ভাণ্ড ধুইলেই কি শুচি হয়? যোগ, উপবাস, ব্রত ইহাদের ক্লেশ কেন করিবে? যাহাতে সুখ পাও তাহাই কর। ক্ষণিক সুখ আবার কি? যতক্ষণ সুখ পাও তাহাই ভাল। নিত্য স্থায়ী সুখ নাই। চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়া আহার করিতে কোন দোষ নাই। বিছানায় বসিয়া খাইতেও দোষ নাই। চর্ম্মপাদুকা

পায়ে দিয়া দেবতার স্থানে যাইতে কি দোষ? সাহেবেরা ত গির্জ্জাতেও চর্ম্ম-পাদুকা ত্যাগ করেন না, আহারকালেও ত্যাগ করেন না; তাঁহাদের কি ধর্ম্ম হয় না? শুচি অশুচি করিয়া তোমরা দাস জাতি; কিন্তু সাহেব-বিবিরা স্বাধীন জাতি। এই সমস্ত চার্ব্বাক-যুক্তি যখন প্রবল হয়,তখন প্রকৃত ধর্ম্মভাব শিথিল হয়।

(২) শাস্ত্রে অবিশ্বাস :—শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারিলেই,চার্ব্বাকদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র কুসংস্কারে পূর্ণ। বেদ কৃষকের গান ইত্যাদি মতও চার্ব্বাক মত। শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা, যেমন;—জনক রাজা সীতাকে লাভ করিলেন অর্থাৎ জনক রাজা ৮মী চাষ করিলেন; এইরূপ ব্যাখ্যাও চার্ব্বাক মত। শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান না করিয়া শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিলে, প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রালোচনা হইল না। তখন যথার্থ শাস্ত্রালোচনা বলবৎ সংস্কার লাভ হইল না। সংস্কার না থাকায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল না।

তবেই হইল চার্ব্বাক—চারুবাক্য—মুখরোচক উপস্থিত ক্ষণিক সুখদায়ী বাক্য ও ব্যবহার প্রচার দ্বারা এবং যথার্থ ভাবে শাস্ত্রালোচনা না থাকা জন্য ধর্ম্মের শিথিলতা ঘটে।

যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করেন, সন্ধ্যা-বন্দনাদিও করেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেও চরিত্রগত কোন উন্নতি দেখা যায় না কেন?

ধর্ম্ম-কর্ম্ম দুই প্রকার (১) জ্ঞানপূর্ব্বক বা আত্মভাবনা পূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্ম করা; (২) জ্ঞান বা আত্মভাবনা ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম,কর্ম্ম করা। প্রথমটির ফল দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি। জ্ঞানপূর্ব্বকং দেবলোকাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তং প্রাপ্তি ফলম্। আত্মভাবনা না করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল পিতৃলোকপ্রাপ্তি। কেবল পিতৃলোকাদি প্রাপ্তি ফলম্।

শাস্ত্র বলেন—"যে ব্যক্তি আত্মভাবনা করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি করেন, তিনিই প্রশস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন। যিনি ফলকামনঃ পুরঃসর যজ্ঞাদি করেন, তিনি অপ্রশস্ত ধর্ম্মকর্ম্মকারী। তথাচ শাস্ত্রং আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজী ইত্যাদি। ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারাই সংসারে আসিতে হয়। কিন্তু যিনি পাপ ও পুণ্য উভয়ই করেন, তাঁহার কি হয়?

পাপ-পুণ্যের সমতা হইলে মনুষ্য-যোনি লাভ হয়। পাপ-পুণ্যের অল্পাধিক্যতা জন্য ব্রহ্মাদি- পর্য্যন্ত জীব, স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাদি দোষপ্রভাবে পাপপুণ্যার্জ্জিত নাম রূপ ও কর্ম্মাশ্রয়রূপ সংসার-গতি লাভ করেন।

জীবের এই যে কর্ম্ম প্রবাহ ইহা কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

সৃষ্টি অনাদি। কর্ম্ম প্রবাহ এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও সূক্ষ্মরূপে ছিল। বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রকৃতিতে কার্য্য-কারণ প্রবাহও যেমন অনাদি ভবাবহ সংসারও সেইরূপ অনাদি।

বহু দুঃখপূর্ণ সংসারে যাঁহারা বীতস্পৃহ, তাঁহাদের অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান. সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমেই ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা লিখিয়াছেন তদবলম্বনে ইহা লিখিত হইল।

২

শাস্ত্র প্রয়োজন।

শাস্ত্র কোন্‌টি ?

বেদই হিন্দুর শাস্ত্র। বেদই অন্য সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের মূল। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্র নহে।

বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?

পরমানন্দপ্রাপ্তি রূপ অভিলষিত ফললাভ এবং সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় জ্ঞাপন করাই বেদের উদ্দেশ্য।

সকল লোকেই ত ঐ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবৃত্তি জন্য ব্যস্ত। ইহা ত সকল মনুষ্যের স্বাভাবিক। তবে আবার বেদের প্রয়োজন কি ?

দেহের ক্ষণিক ইষ্টলাভ বা অনিষ্ট পরিহারের উপায় যেমন প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায়, স্থায়ী ইষ্টলাভ বা স্থায়ী অনিষ্ট পরিহারের উপায় কিন্তু সেরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায় না। দেহাতিরিক্ত আত্মার ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহারে উপায় জন্য শাস্ত্র আবশ্যক। জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহারের যে ইচ্ছা হইবে, ইহা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে হয় না।

আত্মা আছেন, জন্মান্তরেও থাকিবেন, একথা ত চার্ব্বাকেরা স্বীকার করে না। জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহারের ইচ্ছা তাহাদের হইবে কেন ? এই জন্যই ত অধিকাংশ লোকই দেহের সুখ লইয়া ব্যস্ত। এই জন্মেই সমস্ত ভোগ করিয়া লইতে হইবে—এই ধারণায় ত অধিকাংশ লোক কর্ম্ম করে।

চারুবাক্য যাহারা বলে তাহারা চার্ব্বাক। খাও দাও সুখে থাক। কোন কায়ক্লেশ করিবার আবশ্যক নাই। যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট আছে, তাহা করা উচিত নহে। এইরূপ মুখরোচক, উপস্থিত সুখসাধক বাক্যই সকল অজ্ঞানীরই ভাল লাগিবে।

সাধনা, তপস্যা ইত্যাদি বড়ই ক্লেশকর। সংযম অতিশয় ক্লেশজনক। উপস্থিত ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পরলোকে আত্মার হিত হইবে এই ভাবিয়া, ভোগত্যাগে রুচি অজ্ঞানের হইবে কিরূপে? পশু কি আহার মৈথুনাদির ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে।

চার্ব্বাকগণ অজ্ঞানীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য মুখরোচক কথা কহিয়া থাকে; কিন্তু জন্মান্তর সম্বন্ধে আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-পরিহার জন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অধিকাংশ লোকেরই পশ্বাদি সাধারণী বৃত্তি দেখা যায়। ইহাদিগকে শাস্ত্রবিশ্বাসী করিতে পারিলেই, চার্ব্বাক-ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয়। এতদ্ভিন্ন জগতে প্রকৃত কল্যাণ হয় না।

লোকান্তর কি আছে? চার্ব্বাক-মতের অনুসরণ করিয়া, বহু লোকেই এই সন্দেহ করে।

চার্ব্বাকেরা লোকান্তর মানে না; কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র বলেন, লোকান্তর আছে। জ্ঞান এবং পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম, মৃতব্যক্তির অনুগমন করে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহার সেইরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। আপন আপন কর্ম্ম জন্য কেহ মনুষ্য হয়, কেহ বৃক্ষাদিও হয়। পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা স্বর্গলাভ হয়— ইত্যাদি বাক্য শাস্ত্রে দেখা যায়। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

আত্মা যদি প্রত্যক্ষ বা অনুমানের গোচর হইতেন, তাহা হইলে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বলিয়া গোল তুলিত না।

যাঁহারা দেহান্তর-সম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই অন্য দেহে সম্ভব ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায় প্রাপ্তি জন্য শাস্ত্র অবলম্বন করেন।

সেই উপায় জ্ঞাপন জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড।

দেখিবার ব্যাকুলতা।

সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি তুমি অন্তরেও আছ, বাহিরেও আছ; আবার নানা পুণ্যস্থানে নানা তীর্থে তুমি বিশেষভাবে আছ। কত পুণ্যবান্ তোমায় দেখিয়াছেন। আজও কত সাধক তোমায় দেখিতে পান। আমিও বিশ্বাস করি তুমি আছ। কিন্তু আমিত সকল বিষয়েই অনুপযুক্ত। পুণ্যস্থানে গিয়া তোমায় উগ্রভাবে ডাকিয়া তোমার সাধনা করিবার আয়োজন করিতে ত পারি না। তুমি যে অবস্থায় আমায় রাখিয়াছ, যে সুবিধাগুলি আমার নিজের আয়ত্তে দিয়াছ শ্রীগুরু হইয়া যে সাধনা আমায় করিতে বলিতেছ আমি তাহার সাহায্যেই তোমাকে ডাকিতে প্রাণপণ করি। তুমি ত প্রতি চক্রে আছ। হৃদয় ত বৃন্দাবন, সহস্রার ত অযোধ্যামণ্ডল। বেদে এ কথা আছে। সর্ব্বশাস্ত্রেও আছে। হৃদয়-পুণ্ডরীকে কূটস্থ মধ্যে তুমি নিত্য আছ। আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একবার যদি তুমি কৃপা করিয়া দেখা দাও? এতে তোমার ভার কি! যাহা করিলে তোমার দেখা পাওয়া যায় আমাকে তাহাই করাইয়া একবার দেখা দাও না। আমি পরিশ্রম করিতে কাতর নই; আমি প্রাণপণ করাও গ্রাহ্য করি না। কত ত দেখিলাম, কতদিন সংসারে থাকিলাম; যা লইয়া উন্মত্ত হইতাম তাহার ঘোরও ভাঙ্গিয়াছে। তুমিই ভাঙ্গাইয়াছ। জীবন লইয়া কি করিব যদি তোমায় দেখা না পাই। এ ভাব ত তুমিই জাগাইয়াছ। বিপদের উপর বিপদ দিয়া দেখাইয়া দিতেছ সংসারের সমস্তই ক্ষণিক—সবই দুদিনের জন্য। কিছুই থাকিবে না। কিছুই রাখিতে পারিব না। সবই মিথ্যা। একমাত্র তুমিই সত্য। অন্য সমস্তই মিথ্যা। ইহা তুমি বুঝাইয়া দিতেছ। এখন একবার দেখা দাও না। এই ত এত নিকটে আছ। এই ত হৃদ্‌পদ্মে আছ এই ত কূটস্থে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আছ। এই ত সহস্রারে পরমাশক্তির সহিত পরম শক্তিমান্‌রূপে মিলিয়া, বিন্দুস্থানে নাম রূপ গুণ সব ছাড়িয়া আপনস্বরূপে আপনি আপনি ভাবে আপন তুরীয় স্বভাবে আছ। আমার মধ্যে এত নিকটে আছ। একবার দেখা দিয়া, আমার বিশ্বাসকে আরও একটু প্রবল করিয়া দাও না। আমার প্রাণ যেন তোমাকে দেখিলে কত আপ্যায়িত হইবে। নিত্যক্রিয়া সারিয়া তোমায় দেখা পাইবার জন্য যখন আমি অপেক্ষা করিয়া থাকি সে অপেক্ষাতেও আনন্দ পাই। না জানি তুমি আসিলে—না জানি সত্য

সত্য তোমায় দেখিলে আমার কি হইবে? কল্পনায় যখন ভাবি এই বুঝি তুমি আসিতেছ তখনই এত সুখ পাই কিন্তু তুমি ত শুধু কল্পনার বস্তু নও। তুমি যে সত্য সত্য আছ। সত্য সত্যই কত পুণ্যবান্ লোককে দেখা দাও। তুমি যে আপনিই বল "ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ" আমাকে যেরূপ করিলে ভক্ত করা যায় তাহা করিয়া কি একবার দেখা দিতে নাই? এক বার দেখা দাও না—যাহা করিলে তুমি দেখা দিতে পার তাহা করাইয়া দেখা দিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও না? আর আমি কি বলিব। শুধু বিশ্বাসের ধন্ন লইয়া থাকিতে থাকিতে কেন আমার তোমাকে দেখিবার বাসনা জাগে। নাম করি, রূপ চিন্তা করি, গুণ ভাবনা করি—তবুও যে আমার দেখিবার বাসনা জাগে তুমি একবার একটিবার দেখা দাও না? না জানি তুমি কত সুন্দর! তোমার ছবি দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমায় চক্ষে দেখিলাম না—শুধু নাম শুনিয়া শূন্যে শূন্যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার তৃপ্তি সম্পূর্ণ হইল না। আহা! যদি একবার দেখা দিতে? সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে না জানাইয়া কিছুই করিতে ভালবাসেন না—স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু ভাবিলে পাছে ব্যভিচার হয় সেই ভয়ে সতী স্ত্রী কায়িক বাচিক মানসিক সকল কর্ম্ম সকল ভাবনা যেমন স্বামীকে জানাইয়া করিতে চান—আমারও যে সেই সাধ হয়। —যদি তুমি একবার দেখা দাও তবে ত আমার সে সাধ পূর্ণ। আহা! তোমার রূপ শাস্ত্রে পড়িয়া, কল্পনায় ভাবিয়া এমন হই—না জানি তোমায় দেখিলে আমার কি হইবে? কবে দেখা দিবে? কখন দেখা কি দিবে? একবার দেখা দাও না? একবার উপযুক্ত করিয়া, দীন করিয়া দীনবন্ধু তুমি —তুমি এস না। তুমি যে কাঙ্গালের হরি। একবার কাঙ্গাল করিয়া হে হরি এস না। আমি আর ত বলিতে জানি না। আমি যে তোমারই। আমার যে আর কেহই নাই। আমার যে কেহই হইতে চায় না। কেহ আমার নাই হউক তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই—কিন্তু তুমি ত সকলের। তবে তুমি একবার আমায় দেখা দিয়া আমাকে তোমার দাস বা দাসী কর। হে প্রভু! হে দীনদয়াময়! হে কাঙ্গালের ঠাকুর!—হে মাতঃ একবার আমায় সেই প্রিয়দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দাও।

মা! তুমি প্রসন্ন হও। আমার আর বলিবার কিছুই নাই।

এই যে দেখিবার ব্যাকুলতা, ইহা একদিন মনে আনিতে পারিলেই যে হইবে তাহা নহে। এই ভাবকে স্থায়ী করিতে না পারা পর্য্যন্ত ধারণাভ্যাসী হওয়া হইল না। ধারণাভ্যাসী হইতে পারিলেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; কারণ ধারণাভ্যাসী যিনি তাঁহার দেহান্তে অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি হইবে। যদিও জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সদ্যোমুক্তি নাই, কিন্তু ধারণাভ্যাসীর সদ্যোমুক্তি না হইলেও ক্রম-মুক্তি হইবেই। ইঁহার আর পতন নাই; শেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উঠিয়া ইনি ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করিবেন। তবে যাহাতে প্রত্যহ ভাবের সহিত স্থায়ীভাবে পূর্ব্বোক্ত সাধনা করিতে পারা যায়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত সাধনাই প্রশস্ত। তুমি দেখা দাও এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল রাখিয়া, জপকালে বা প্রাণায়ামকালে বা সন্ধ্যা-আহ্নিককালে নিত্য তিন বেলায় সাধনা করিতে হইবে। করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, তুমি দেখা দাও—তুমি ত আমার কূটস্থে আছ, আমার হৃদ্‌পদ্মে আছ, আমার সহস্রারে আছ—তুমি দেখা দাও—এই উৎকণ্ঠার সহিত জপ, প্রাণায়াম বা সন্ধ্যায় তাঁহাকে ডাকিলে রস পাওয়া যায়; লয় বিক্ষেপও দূর করা যায়।

এই ভাবে নিত্য ক্রিয়া নিত্য তিন বেলায় অভ্যাস কর, চিত্ত। তোমার মঙ্গল হইবে। নতুবা বৃথাই জীবনভার বহন।

তুমি ও সে।

এই সম্মুখে আমার উপাস্যের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি কি? এখানে তুমিই বা কে? সেই বা কে?

মূর্ত্তিটি তোমার উপাস্য বলিতেছ। মূর্ত্তিটি ত পটের ছবি অথবা দারুমূর্ত্তি বা ধাতু-প্রস্তরের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি তোমার উপাস্য নহে। যেমন পিতা বা মাতা বা স্বামী বা পুত্রকন্যার ফটোগ্রাফটি বা তৈলচিত্রটি ঐ ঐ ব্যক্তি নহে—কিন্তু ছবিটি দেখিয়া ঐ ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ হয় বলিয়াই ছবি তোমার প্রিয়; সেইরূপ উপাস্যের মূর্ত্তি দ্বারা উপাস্যকে স্মরণ করা যায় বলিয়া, উপাস্য মূর্ত্তিটি পূজার বস্তু।

কিন্তু উপাস্যের স্মরণ কিরূপ হয়? উপাস্যের রূপ, উপাস্যের গুণ, উপাস্যের কার্য্য স্মরণই উপাস্যকে স্মরণ। এইটি তটস্থ লক্ষণে উপাস্যকে স্মরণ করা। কিন্তু অন্য একপ্রকার স্মরণ আছে, তাহা স্বরূপ স্মরণ। এই স্বরূপ স্মরণে, উপাস্যবস্তুটি যে সর্ব্ববস্তুমধ্যে আছেন, এবং সমস্ত বস্তুই যে উপাস্য বস্তুমধ্যে আছেন তাহার ভাবনা করিতে হয়।

আমার উপাস্যই সর্ব্বত্র আছেন, আবার আমার উপাস্য বস্তু মধ্যে সর্ব্বপদার্থ আছে—ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভাবনা করিতে পারিলে, এবং ব্যাবহারিক জগতে ইহার ভুল না হইলেই ভক্তিমার্গে যাওয়া যায়।

কিন্তু জ্ঞানমার্গে আমার উপাস্য কিরূপে সর্ব্বব্যাপী, আমার উপাস্যমধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি জীব কিরূপে আছে তাহাই বুঝিতে হয়। এইটি বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভাবটি ধারণা করা যায়। তাহাতেই রস আইসে, নতুবা শুধু বিশেষণগুলি জানিলে এবং মুখে উচ্চারণ করিলে প্রাণ শুষ্কই থাকে।

জগতে যত কিছু মূর্ত্ত পদার্থ আছে, তাহা সে আর তুমি একত্রে। [সে = চৈতন্য, পুরুষ আর তুমি = চৈতন্য দীপ্তা প্রকৃতি] রূপ, নাম ও গুণ তুমি দিতেছ, কিন্তু চৈতন্যটি সে। নাম রূপ ও গুণ এইগুলি প্রকৃতির, চৈতন্যটি পুরুষ। প্রকৃতির গুণ, প্রকৃতির কার্য্য তোমাতে আরোপ হইলে, তবে তুমি গুণবান্, রূপবান্, কর্ম্মী। তোমার চৈতন্য, প্রকৃতিতে পড়িলে তবে প্রকৃতি অচেতন হইয়াও চেতনের মত প্রতীত হয়েন। তুমি ও সে একত্রে মিলিলে, তবে জড়ের সৃষ্টি।

চৈতন্য সর্ব্বদা অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী হইলেও, প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড অংশে পড়িয়া খণ্ডবত অনুভূত হয়েন। মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য, তাহা খণ্ড-চৈতন্য মত। কিন্তু চৈতন্য যখন আপন স্বরূপে একাগ্র হয়েন, তখনই তিনি আপনার অখণ্ড স্বরূপে যাইতে পারেন। ঘটের মধ্যে যে আকাশ সে আকাশ যখন ঘটেই অভিমান করেন, তখন তিনি খণ্ড ঘটাকাশ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি ঘট অভিমান ত্যাগ করিয়া আপনার আকাশস্বরূপে তন্ময় হয়েন, তখনই খণ্ডই যে অখণ্ড তাহা অনুভব করেন।

তবেই হইল অভিমান থাকিলেই খণ্ড, অভিমান ছাড়িলেই অখণ্ডে স্থিতি। এই অভিমান ত্যাগ, জ্ঞানবিচার ভিন্ন হয় না। আবার জ্ঞান, ভক্তি ভিন্ন জন্মিতেই পারে না। শ্রুতি বলেন "ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাচিৎপি ন জায়তে"

ভক্তিশূন্য যে জ্ঞান, তাহা সাময়িক আভাস বা জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। এ জ্ঞানে ব্যাবহারিক জগতে তোমার আটপৌরে চরিত্র ও পোষাকী চরিত্র থাকিবেই; কিন্তু ভক্তি পূর্ব্বক যে জ্ঞান সে জ্ঞানে বিষয়ে বৈরাগ্য অবশ্যই জন্মিবে।

বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার অনুরাগ আসিবেই। অন্য অভিলাষ ত্যাগ হইয়া যখন ভগবৎ-প্রাপ্তি অভিলাষ মাত্র তোমার রহিল, তখন ভক্তিজন্য ব্যাকুলতা, ভগবদ্দর্শন জন্য উৎকণ্ঠাপূর্ণচিত্ত হইবেই। ইহার পরেই ভগবৎ-কৃপা অনুভব হইবে। তখন অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। ইহার পরে বিচার আসিবে। তুমি কে, সে কে, এই বিচার মীমাংসা যখন স্থায়ীভাবে রহিল তখনই তুমি জ্ঞানী। জ্ঞান আয়ত্ত হইয়া গেলেও নির্গুণ উপাসক যখন শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদন করেন, তখনই হরি হইয়া হরি ভজন হয়। তুমি ও সে—ইহার ভিতরে এত কর বুঝিবে।

কত রকম।

আমার এক আত্মীয়, মাতালের প্রতিজ্ঞাতে লিখিয়াছিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ খাওয়া ছাড়িলাম; কিন্তু শালার মাছি যে বোতলের ছিপিতে বসিয়া মদ টানিয়া খাইবে, তাকি সহ্য হয়? কখনই না। মদটা সব শেষ করিয়া ফেলি। প্রতিজ্ঞাটা না হয় এবার ভাঙ্গিল। মাছি বেটার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ তাহাতে দোষ হইতে পারে না। এই রকম কি একটা লেখা ছিল।

মদ-মাতালের প্রতিজ্ঞা ত এইরূপে ভঙ্গ হইতেছে, কিন্তু "পিত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ"—যাহারা মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত রকমই দেখা যায়।

সন্ধ্যাটি অবশ্য করণীয় প্রত্যহই। একটু জ্বর হইল অমনি সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে সন্ধ্যা বাদ পড়িতে লাগিল। বিচার আসিল কি—না তুমি শরীরটাকে সুস্থ রাখিলে না তা সন্ধ্যা আবার কি করিব? বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় কি সন্ধ্যা হয়? যেন রোজই বাবুর সন্ধ্যা হয়। এই এক রকম। অভিমান কি যেখানে

সেখানে হয়? অত্যন্ত ভালবাসা না থাকিলে কি অভিমান হয়?

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে। বলিতে হইবে, জননি! জন্মজন্মান্তরের পাতকরাশি আমাকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, কাজেই আমি তোমার কাছে যাইতে চাহিলেই উহারা বাধা দেয়। আমি নানাবিধ যাতনায় ভুগিতেছি সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐত সন্ধ্যার সময় আসিল। তুমি একটু বল দাও। আমি এই সময়ে তোমাকে একটু ডাকি, পরে না হয় আপনার দুষ্কৃতিরাশির ফলভোগ করিব। এই আর এক রকম। শেষের রকমটিই ঠিক, আর প্রথম রকমটি মাতালের প্রতিজ্ঞা পাশ ফিরাইয়া লওয়া।

উৎসবের উন্নতি কল্পনা।

একটা দেহ কখন চিরদিন থাকে না। কিন্তু কোন কর্ম্ম যদি মঙ্গল উৎপাদন করে তবে সেই কর্ম্মটা যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত চলে তাহা করা যাইতে পারে। কর্ম্মটা থাকিল। একটা লোকের অভাব হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন লোকে সেই কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে কর্ম্মটি অনেক দিন ধরিয়া চলিতে পারে।

এখন কথা হইতেছে উৎসব পত্র দ্বারা কি কোন মঙ্গল কর্ম্ম হইতেছে? উৎসব পত্র সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম প্রচার করা হইয়াছিল, তখন বলা হইয়াছিল,—ভগবান্ প্রসন্ন হও, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ইহা চলুক; আর তোমার ইচ্ছা না হয় ইহা বন্ধ হইয়া যাউক। এখনও মূলে তাহাই রহিল। ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া, ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু বহুজনের মধ্যে যে কর্ম্ম চলে, তাহাতে সকলের নিষ্কাম ভাব রাখা নিতান্ত কঠিন। কারণ সকল মনুষ্যের প্রকৃতি একরূপ নহে। সেই জন্য ফলাফলের একটু বিচার করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে এই পত্রিকা যাঁহারা চালাইবেন তাঁহাদের জন্য।

উৎসবে কি কাহারও মঙ্গল হইতেছে, ইহাই প্রশ্ন। উৎসব সাড়ে ছয় বৎসর চলিতেছে। ইহার সমালোচনাও অনেক হইয়াছে। যাঁহারা ইহার প্রশংসা করেন না তাঁহারা বলেন বিষয়গুলি বড়ই কঠিন। এরূপ অপ্রশংসাবাদ,

বেশীলোকে করেন নাই! আর যাঁহারা প্রশংসা করেন, এমন কি কোন কোন স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও লিখিয়াছেন—এই পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠে নিরুদ্যম মন উদ্যমে পূর্ণ হয়; যাঁহারা কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন; আবার উকিলশ্রেণীর কেহ কেহ বলেন এই পত্রিকায় কাজের কথাই থাকে। ফলে অনেকেই ইহার দীর্ঘ জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহা উঠিয়া যাউক এই ইচ্ছা প্রশংসাবাদী ও অপ্রশংসাবাদী কেহই করেন না। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মানুষ চক্ষুলজ্জাতেও হয়ত উৎসবের আত্মজনের মুখের উপর থাকিয়েও ইহার অপ্রশংসা না করিতে পারেন। কাজেই আমার কাছে হয়ত ইহার প্রশংসাই আসিয়াছে।

গত শ্রাবণের উৎসব পত্র খানির সমালোচনা করিয়াছেন "মেদিনীপুর হিতৈষী"। আরও ৩০ খানি মাসিক পত্রের সমালোচনা মেদিনীপুর হিতৈষী করিয়াছেন। অন্যান্য পত্রিকার সুখ্যাতিও ইনি করিয়াছেন; কিন্তু উৎসব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই পত্রিকার অন্য স্থানে দেওয়া হইয়াছে। (মতামতের বিজ্ঞাপন দেখুন) তদৃষ্টে সকলেই বুঝিবেন ইহা দ্বারা সমাজের যে বিশেষ উপকার হইতেছে ইহাই যেন সমালোচকের অভিপ্রায়।

ধরা গেল ইহা দ্বারা সমাজের উপকার হইতেছে। কিন্তু কি উপায়ে এই পত্রিকাকে বহুদিন স্থায়ী করা যায়, তাহার জন্যই উপস্থিত প্রবন্ধ লেখা হইতেছে।

আমরা উৎসবের জন্য আর কি কি আয়োজন করিব পরে লিখিতেছি; কিন্তু প্রথমেই সকলের নিকট জানাইতেছি যাঁহারা উৎসবের উন্নতি সম্বন্ধে যে কোন সৎপরামর্শ দিবেন, আমরা সাদরে সেই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

এখন উৎসবের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যাহা করিতে মানস করিয়াছি, তাহা এই:—

(১) উৎসবে একমাস ধরিয়া অভ্যাসের জন্য:—আমরা শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে প্রতি মাসে কতকগুলি শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিতে থাকিব। ইহা অভ্যাস করিলে জ্ঞানবিচার ও ভাব লইয়া সর্ব্বদা থাকিবার সুবিধা হইবে।

(২) উৎসবে ভাল কথা। স্বাধ্যায়ও যখন সাধনার অঙ্গ, তখন উৎসবের লেখক ও গ্রাহকগণের স্বাধ্যায় করা আবশ্যক। আমরা যে শাস্ত্রে যাহা ভাল কথা পাইব,—জ্ঞানের কথাই হউক বা ভাবের কথাই হউক, তাহা কতক কতক করিয়া যেমনভাবে শাস্ত্রে পাওয়া যাইবে, সেইরূপ ভাবেই প্রতিসংখ্যায় প্রথমেই প্রকাশ করিব। এই শাস্ত্র-উপদেশের সহিত আমাদের নিজের মন্তব্য কিছুই থাকিবে না। যদি কোন জ্ঞানের কথা নিতান্ত কঠিন হয়,অথবা কোন ভাব আস্বাদন করা দুরূহ হয়, তখন স্বতন্ত্রভাবে যে যেরূপে বুঝিয়াছি তাহা উল্লেখ করা যাইবে। এই বিষয়ে উৎসবের সমস্ত গ্রাহককে আমারা আহ্বান করিতেছি। যিনি যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া শাস্ত্রের যেরূপ উপদেশ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, তাহাই আমরা অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ করিব। কিন্তু কোন্ শাস্ত্র হইতে উপদেশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে। বলিতে হইবে না ইহাতে উৎসবের গ্রাহকদিগের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভাবের বিনিময় হইতে থাকিবে এবং সকলেরই একটা শাস্ত্রচর্চ্চার উপরে আগ্রহ জন্মিবে। ইহা দ্বারা সাধনার উন্নতি হইবেই।

(৩) উৎসবে চরিত্র। শাস্ত্রপাঠ করিতে করিতে যে সমস্ত চরিত্র আদর্শস্থানীয়, যে সমস্ত চরিত্র অবলম্বন করিলে নিজের চরিত্র-দোষ নষ্ট করা যায়; নিজের শোকের শান্তি হয়; অন্যেরও হইতে পারে; যে চরিত্রের কথা ভাবনা করিলে নিজের ভয়-বিক্ষেপ দূর হয়, অন্যেরও হইতে পারে—সেই সমস্ত চরিত্র অঙ্কন। এ বিষয়েও আমরা সমস্ত গ্রাহকদিগকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা নিজে চরিত্র-অঙ্কনে অসুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রে যেরূপ পাইবেন সেই-রূপেই চরিত্রটি লিখিয়া পাঠাইলে, আমরাও সেই সেই চরিত্রকে শাস্ত্রমত আরও প্রতিফলিত করিয়া উৎসবে প্রকাশ করিব। এখানেও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আজকার লেখকের কাল্পনিক চরিত্র আমরা গ্রহণ করিব না। ঋষিগণ যে সমস্ত চরিত্র জীবশিক্ষার জন্য শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই সমস্ত চরিত্রেরই আদর করিব। এখানেও যে শাস্ত্র হইতে চরিত্রটি লওয়া হইল, তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে।

(৪) উৎসবে শ্রীভাগবৎ। উৎসব পত্রিকায় ভারত সময় ২য় খণ্ড, কৈকেয়ী, ভস্ত্রা, মনোনিবৃত্তি, যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্য প্রকরণ মুমুক্ষু প্রকরণ,

গীতাদ্বারা এই পুস্তকগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত সময়ে ঋগ্বেদ সংহিতা, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, শ্রীগীতার শব্দ ও শ্লোক নির্ঘণ্ট এই পুস্তকগুলি চলিতেছে। মাণ্ডুক্য অনেক দিন হইল লেখা হইতেছে না, শীঘ্র হইবে। ইহার উপরে আমরা আর দুই খানি পুস্তকও আরম্ভ করিব। নূতন পুস্তকের প্রথমখানি শ্রীমৎ ভাগবৎ। যে ভাবে শ্রীগীতা বাহির হইয়াছে, সে ভাবে ইহা বাহির হইবে না। ভারত-সমর, যোগ-বাশিষ্ঠ ইত্যাদি পুস্তকের মত শ্রীভাগবৎ বাহির হইবে। ইহাতে মূল শ্লোকের বাঙ্গবাদির সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত অংশ থাকিবে। কঠিন শ্লোক প্রশ্ন-উত্তর ভাবে লেখা হইবে। ভাগবতের চরিত্রগুলি উপন্যাস-আকারে বাহির হইবে। এই পুস্তক উৎসবে এরূপভাবে বাহির হইবে যাহাতে ভাগবতের ভাব পাঠকের বিশেষরূপে জানা হইয়া যায়। ফলে এই পুস্তক পাঠে ভাগবতের সমস্ত বিষয়ই মূলভাবে এবং সাধনার কার্য্যগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে ও অন্য অন্য পুরাণে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহাও বর্ণিত হইবে।

(৫) উৎসবে আবার গীতা। শ্রীগীতা ৭ম অধ্যায়ের কতক পর্য্যন্ত উৎসবে বাহির হইয়াছিল। এখন শ্রীগীতা স্বতন্ত্রভাবে ১৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। শ্রীগীতার গ্রাহকেরা ১৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। শীঘ্রই বাকী অধ্যায়গুলি যাহাতে পান তাহার চেষ্টা করা হইবে। ৺কাশীধামের পূজনীয় স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস পূর্ব্বে বহু অসমর্থ গ্রাহকের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে জানাইয়াছিলেন, তোমার গীতা বাহির হইয়া গেলে তুমি যে পর্য্যন্ত উৎসবে গীতা বাহির হইয়াছিল তাহার পর হইতে ইহা আবার উৎসবে বাহির করিতে থাক। সেই অঙ্গীকার মত কার্য্য করিবার সময় এখন আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণের সুবিধা অসুবিধা একটু বিচার করা আবশ্যক।

যাঁহারা শ্রীগীতা সম্পূর্ণ লইয়াছেন অথচ উৎসবেরও গ্রাহক, তাঁহারা কেহ কেহ উৎসবে পুনরায় গীতা দিতে আপত্তি করিতে পারেন। বলিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন লাভ নাই। তাঁহাদিগের নিকটে আমার আবেদন এই, তাঁহারা একখানি গীতা ত পাইয়াছেন; না হয় আর একখানি বেশী পাইলেন।

পুরাতন গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে, পুস্তক খানি বিশেষরূপে পাঠ করাই সকলের প্রয়োজন। শ্রীগীতার প্রতি শ্লোকটিই আবশ্যকীয়। সমগ্র পুস্তক এক সঙ্গে পড়ার অবকাশ সকলের না হইতেও পারে, কিন্তু উৎসব পত্রিকা মধ্যে প্রতি মাসে অল্প করিয়া যাহা বাহির হইবে, উৎসব পাঠের সঙ্গে তাহা পড়িয়া ফেলিতে পারিলে কোন ক্লেশ হইবে না; বরং ভালই হইবে। এক মাসের কাগজে গীতার যতটুকু থাকে তাহা পড়িয়া, তন্মধ্যে করণীয় সাধনা যেটুকু থাকে তাহা যদি পুনরায় পাঠ করা যায়, এবং সেই মত কার্য্য করিতে প্রাণপণ করা হয়, তাহা হইলে পুস্তকপাঠের যথার্থ ফল ভাল হয়, ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা। পুরাতন গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে আর অধিক কি বলা যাইবে? তবে ইহাও বলা যায়, সমগ্র গীতার মূল্য ১২৸০। এই মূল্য দিয়া সকলে গীতা ক্রয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু উৎসবে বাহির হইলে, বৎসরে ১৷৷০ মাত্র দিয়া অসমর্থ গ্রাহকেও ইহা পাইতে থাকিলেন। পূর্ব্বে অনেকেই বলিয়াছেন, এত অল্প করিয়া উৎসবে গীতা বাহির করিলে কতদিনে বাহির হইবে? ততদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য্যও গীতা-পাঠকের থাকিবে না। এখন কিন্তু আর কাহারও সে কথা বলিবার উপায় নাই। সমগ্র পুস্তক ত বাহির হইয়া গিয়াছে; যাঁহারা অপেক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা একসঙ্গে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করুন। যাহারা তাহা পারেন না, তাঁহারা উৎসব-প্রকাশিত অল্প অল্প অংশ পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকুন, এবং ঐ অল্প অংশের সাধনা করিতে থাকুন ইহাতেও বিলক্ষণ উপকার আছে। নূতন গ্রাহক এখন হইতে যাঁহারা হইবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য ৭ম অধ্যায়ের প্রথম হইতেই গীতা ছাপিতে থাকিব। ইঁহাদিগকে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতার প্রথম ষট্‌ক টুকু কিনিয়া লইতে হইবে। সুন্দর মলাটে বাঁধান এই খণ্ডের মূল্য ৷৷০। আর আবাঁধা যদি লইতে চাহেন তাহা হইলে ৸৷ টাকায় তাঁহারা পাইবেন। বাকী গীতা উৎসবেই পাইতে থাকিবেন।

(৬) উৎসবের অন্যান্য প্রবন্ধ। উৎসবে পূর্ব্বে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল এখনও সেইরূপ বাহির হইবে সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলিও থাকিবে। এবং হিন্দুধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা যেখানে

তাহারও সমালোচনা অবসর মত দেওয়া যাইবে। ভাল ভাল পুস্তকের সমালোচনাও যাঁহারা করিবেন তাহাও উৎসবে দেওয়া যাইবে।

(৭) উৎসবে গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রই (ব্রাহ্মণের পক্ষে) সকল মন্ত্রের সার। ইহা বুঝিবার জন্য যেখানে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উৎসবে ইহার আলোচনা চলিবে।

(৮) উৎসবের আকার। উৎসব পত্র ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতগুলি পুস্তক থাকিবে ও প্রবন্ধ থাকিবে অথচ ৪০ পৃষ্ঠা যদি রাখা যায় তাহা হইলে অতি অল্প অংশই বাহির হওয়া সম্ভব। অথচ পুস্তক যাহা বাহির হইবে তাহা ৪ পৃষ্ঠার কম বাহির করিলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির করা যায় না। কারণ আধ ফর্ম্মার কম হইলে পুস্তকাকারেও বাঁধান যাইবে না এবং ছাপার গোলযোগও হইবে। সেই জন্য যদি উৎসবের আকার বাড়ান না যায়, তবে এক সংখ্যায় তিনখানি পুস্তক থাকায় পরের সংখ্যায় আবার অন্য কয়েক খানি থাকিল এরূপ ভাবে চলিতে পারে। আর উৎসবের আকার বর্দ্ধিত করা যায় তাহা হইলে চলিতে পারে।

(৯) আকার বৃদ্ধিতে মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত কি না—বলিতে হইবে না যে আকার বৃদ্ধিতে উৎসবের খরচ বৃদ্ধি হইবে। এখন পর্য্যন্ত উৎসবের খরচ যতদূর সংক্ষেপ করা সম্ভব তাহাতেই চলিতেছে। কার্য্যনির্ব্বাহক যিনি আছেন তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রমেই ইহা চলিতেছে। যদিও একটি অফিস আছে কিন্তু অন্য লোক রাখিবার অর্থ উৎসবের নাই। ইহার উপরে আবার কাগজের আকার বৃদ্ধি করিলে ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করিলেও, অসমর্থ গ্রাহকদিগের বিশেষ অসুবিধা। ইহা নিবারণ জন্য, উৎসবের গ্রাহকসংখ্যা অন্তত ২,০০০ দুই হাজার হওয়া উচিত। এখন দেখা যায়, বৎসরের শেষে উৎসবের গ্রাহক ১,০০০ বা কিছু কম বা বেশী হয়, আবার বৎসরের প্রথমে ভি, পি, করিয়া দাম আদায় করিবার সময় ৭৫০।৮০০ হইয়া যায়। আবার বৎসর ধরিয়া ঐ ১০০০ বা কিছু বেশী কম হইতে থাকে।

উৎসব এই ভাবে চলিতেছে। আমরা গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি জন্য দুই এক স্থানে বিজ্ঞাপন দিতেছি এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেও বিজ্ঞাপন বিলি করিবার ব্যবস্থা রাখিব। কিন্তু ইহাতেই যে গ্রাহকসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি হইবে, সে

বিষয়ে আমাদের সন্দেহ। ইহার জন্য আমরা উৎসবের গ্রাহক মহাশয়গণকেও সাহায্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। পূর্ব্বে গ্রাহকদিগের চেষ্টায়, উৎসব উপস্থিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে; এখন আবার নূতন উদ্যমে তাঁহারা যদি ইহার প্রচারের চেষ্টা করেন, তবে সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে স্বচ্ছন্দে ২০০০।২৫০০ গ্রাহক যে হইতে পারে না তাহা আমরা মনে করি না। এজন্য সকলের নিকটে আমরা সানুনয় নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা এতৎকল্পে একটু চেষ্টা করিয়া আমাদিগের এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করুন। ইহা না হইলে কিছুতেই সুবিধা হইবে না। এ সম্বন্ধেও যিনি যাহা বলিবেন তাহা আমরা গ্রহণ করিব। যিনি পাঁচজন গ্রাহক করিবেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে একখানি উৎসব বিনামূল্যে পাইবেন।

আমাদের যাহা বলিবার কথা বলিলাম; এক্ষণে যাঁহারা উৎসবের অনুগ্রাহক তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আমরা এই আশ্বিন মাস হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিব। ভাদ্র মাসের কাগজে উৎসবের উন্নতি-কল্পনা পড়িয়া, যাঁহার যাহা বলিবার আছে সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন।

শেষ নিবেদন, এই বৎসর কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ৺পূজা। আমরা আশ্বিন ও কার্ত্তিকের কাগজ একসঙ্গে বাহির করিব। ঐ কাগজে ভাল কথা, শ্রীভাগবত, গায়ত্রী, চরিত্র, গীতা প্রভৃতি কতক কতক দিব। অন্য অন্য বিষয় যেমন চলিতেছে তাহাও থাকিবে। এই সংখ্যা দেখিলেই, সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন ভবিষ্যতে উৎসব কিরূপ চলিবে।

উৎসবের অনুগ্রাহক মহাশয়গণ এই কার্য্যে সত্বর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সঙ্কল্প ত্যাগ করাই সর্ব্বোচ্চ সাধকের কার্য্য। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ সাধক এখনও হইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র শুভ সঙ্কল্প করিতেই বলেন। যদি আমাদের এই সঙ্কল্প শুভ হয়, তবে শ্রীভগবান্‌কেও ইহা জানাইয়া রাখিলাম। সর্ব্ব সঙ্কল্প তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করাই নিষ্কাম কর্ম্ম করা। যদি শুভ হয় তিনি সহায় হউন; যদি অশুভ হয় ইহা ধ্বংস হউক,—ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

পূজা।

এস এস নারায়ণ, শিবের সেবিত ধন,
এস মনোময় রাজো মানস-মোহন।
চন্দন সুরভিময়, কুসুম তুলসীচয়,
এ দিয়া কি করিব হে পূজা আয়োজন ?
তুলসী, চন্দনে মাখি, নয়ন মুদিয়া ডাকি,
এ তোমার বড় প্রিয় করহে গ্রহণ।
কভু থাকি জড়-প্রায়, কখন ভাসিয়া যায়
কভু হাসি, কভু চক্ষে বহে প্রস্রবণ।
কভু দিতে অর্ঘ্য-ফুল, হ'য়ে যায় বড় ভুল,
খুঁজিয়া না পাই ওরো ! ও চরণ-মূল।
যে অঙ্গ যখন হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
অথবা জানিনা তুমি সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল।
যত করি আয়োজন, তবুও ওঠেনা মন,
কি জানি কি অঙ্গহীন হয় নারায়ণ।
নতুবা কি দয়াময়, তব চিত্ত স্থির রয়,
নিজ-কৃত কর্ম্মে প্রভু ! ভুগি অনুক্ষণ।
দেহস্থ পৃথিবী-অংশে, গন্ধরূপে অবশেষে,
এ দিয়া কি করিব হে তব আরাধন ?
ব্যোমরূপে পুষ্প যাহা, চরণে অর্পিব তাহা,
যং রং ধূপ দীপ করি সমর্পণ।
বং বীজাত্মকে নাথ, নৈবেদ্য সাজাব আজ ?
তা'হোলে আসিয়া তুমি করিবে গ্রহণ।
হাসি আসে কান্না পায়, তোমারে কি দিব হায় !
তৈজস-সমষ্টি সব তুমি জনার্দ্দন।
তোমার ইঙ্গিতে ধায়, মহাভূত প্রাণ পায়,

চুম্বক নিকটে প্রভু লৌহের মতন।
চারি চক্ষু সম্মিলনে, দেখি রূপ এক মনে,
নাভিচক্রে শত শত কমল বিকাশ।
কমল-কর্ণিকা মাঝে, যেন কোটী শশী রাজে,
রং বীজাত্মক রূপে তুমি শ্রীনিবাস।
ঋতু পক্ষ মাস বর্ষ, জন্ম মৃত্যু শোক হর্ষ,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আর কিছু নাই।
শূন্য ব্যোম সমুদয়, তোমাতে মিশায়ে রয়,
ক্ষুদ্র আমি এ আমিত্ব মুহূর্ত্তে হারাই।
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হ'তে, পড়ি যেন আচম্বিতে,
রোষ শোক জরা জন্ম, মৃত্যু হাহাকার,
আবার আবার নাথ, দেখি সব পূর্ব্ব-মত,
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, সেই অহঙ্কার।
আর্ত্ত আমি জগন্নাথ, তুমি দীনজনা তাত,
রক্ষা কর দীনবন্ধু! অধম জনার।
অন্তিমে স্মরণ রেখ, দেখ যেন ভুলোনাক,
বলো বলো জ্ঞানময়! মম রসনায়।
শিব শিব, রাম রাম, বলি যেন অবিরাম,
অলক্ষিতে দুটি পদ দিওগো মাথায়।
স্নিগ্ধ পদতলে পড়ি, আরাম লভিব হরি,
চিরতরে পদতলে রাখিও আমায়।

রা.....

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
সপ্তাত্রাণ্যপি ভায়ায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।]　　১৩১৯ সাল আশ্বিন, কার্ত্তিক।　　[৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

অর্থচিন্তা ও ভাব-স্মরণ—নিত্য অভ্যাস জন্য।

[প্রতিমাসেই এইরূপ করিবার শুভ সঙ্কল্প করা হইতেছে। এক মাস ধরিয়া প্রত্যহ অর্থ ও ভাবের সহিত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিলে শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবে; মুখস্থ করিবার জন্য কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না। নিত্য কর্ম্মের আদিতে এই গুলির সাহায্যে ঈশ্বর-চিন্তা করিলে মন সরস হইবে। তখন সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি রসের সহিত করিতে পারা যাইবে। ক্রমে মন বিক্ষেপ কাটিয়া গিয়া নিত্য সত্ত্ব হওয়া অভ্যস্ত হইতে থাকিবে। কর্ম্ম অন্তে একান্তে ইহাদের অর্থ ও ভাব, মনকে একটা শান্ত অবস্থা আনিয়া দিতে থাকিবে। ক্রমে লোকসঙ্গেও স্মরণটি সর্ব্বদা লইয়া থাকিবার সুবিধা হইবে; তখন ভাবনায়, বাক্যে ও কর্ম্মে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া সহজ হইতে পারে। হে ভগবান্! তোমার প্রসন্নতা আমাদের অনুভব-সীমায় আনিয়া দাও। অধিক কি।)

[১]

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ শ্রীভাঃ॥

পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি। ধ্যান কিরূপে করিব? স্বরূপে তিনি যাহা সেই চিন্তা দ্বারাও ধ্যান হয়; আর তটস্থে তিনি যাহা করেন, সেই চিন্তা দ্বারাও ধ্যান হয়। স্বরূপে তিনি সত্য-স্বরূপ। তিনিই সত্য—সৃষ্ট যাহা কিছু, সমস্তই মিথ্যা। ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা মন, দেহ, জগৎ,—সত্ত্বরজস্তম-গুণের এই ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও, পরমব্রহ্ম, অধিষ্ঠান-চৈতন্য সকলের মূলে আছেন বলিয়া এই বিসর্গ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যেমন সূর্য্য-তেজে যে মরীচিকা উঠে তাহাতে জল ভ্রম হয়, জলে কাচ ভ্রম হয়, কাচে রজত ভ্রম বা জল ভ্রম হয়, অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়—সেইরূপ ব্রহ্মেই এই জগৎ ভ্রম হইতেছে। ব্রহ্মকে ভ্রমজগৎরূপে প্রতীতি হইলেও পরমব্রহ্ম স্বীয় তেজঃ প্রভাবে মায়ার সমস্ত ইন্দ্রজাল নিরস্ত করিয়া আপন মহিমায় আপনি আপনি সর্ব্বদা বিরাজমান। স্বরূপ-চিন্তায় ধ্যান এইরূপে করিতে পারিলে, দৃশ্য-দর্শন মুছিয়া যাইবে। আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হইবে।

তটস্থ-লক্ষণে চিন্তা করিয়াও আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মের ধ্যান করি। তটস্থ-লক্ষণে চিন্তা কিরূপ? সেই পরমব্রহ্ম মূলে আছেন বলিয়াই, এই অসত্য মায়িক জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ তাঁহা হইতেই হইতেছে। তিনি অনুস্যূত বলিয়া জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ রূপ ব্যাপার কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; আর তিনি অননুস্যূত—ব্যাবৃত্ত বলিয়া আকাশ-কুসুম শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি অলীক পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই কারণস্বরূপ। প্রতিকার্য্যের কারণস্বরূপে তিনি অন্বিত—অনুস্যূত। যেমন কারণ যাহা, তাহা কার্য্যে আছে কিন্তু কার্য্য যাহা, তাহা কারণে নাই—সেইরূপ ব্রহ্ম, জগতে কারণরূপে আছেন; কিন্তু জগৎ তাঁহাতে নাই। যেমন কার্য্যরূপ ঘটে, ঘটের কারণ মৃত্তিকা আছে কিন্তু মৃত্তিকাতে ঘট নাই সেইরূপ।

তটস্থ-লক্ষণে সগুণ-ব্রহ্ম চিন্তা করিয়া আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি স্বরাট্, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আবার যে বেদে জ্ঞানী সকলও মোহ প্রাপ্ত হয়েন, সেই বেদসমূহ তিনি আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্রেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে সেই পরমব্রহ্মকে এইরূপে চিন্তা করিয়া ধ্যান করি। [একাজে এই উভয়বিধ চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মই সত্য, এবং তিনি এই মিথ্যা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ রূপ মায়িক ব্যাপার করিয়া থাকেন ইহার অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে

সাধনার পূর্ব্বে যখন এই চিন্তা আপনা হইতে আসিতে থাকে, তখন আপন স্বরূপের আভাস লইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়। এইরূপে ইহাতে সর্ব্ব-সাধনা সাধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অপূর্ব্বতা লাভ হইবেই]।

[২]

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা।
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবির্ম্ম-এধি ॥
বেদস্য ম আণীস্থঃ
শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহরোরাত্রান্
সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি ॥ সত্যং বদিষ্যামি ॥
তন্মামবতু ॥ তদ্বক্তারমবতু ॥ অবতু মাম্ ॥
অবতুবক্তারমবতু বক্তারম্ ॥ ঋগ্বেদ ॥ পাঠারম্ভে শান্তিমন্ত্র ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

[আমি গুরুকৃপায় বহিঃপ্রসৃত আমার শক্তিগুলিকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিবার কৌশল শিখিয়া সংযমী হইয়াছি। ভগবতি! ব্রহ্মবিদ্যে! আমায় কৃপা কর]

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[কেহই প্রলাপ করে না] হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি আবির্ভূত হও!

হে বাক্য! হে মন!

তোমরা আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমি অধীত গ্রন্থের বিস্মরণরহিত আলোচনাতে দিবারাত্রকে নিযুক্ত রাখিব। বেদ এই রূপে অধীত হইলে, তবে আমি ঋতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব।

মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে!

তুমি আমাকে বোধ-শক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে শিষ্য-বোধন শক্তি দিয়া রক্ষা কর।

আবার বলি, হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে!

আমাকে রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে রক্ষা কর। ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

[৩]

গাব ইব গ্রামং, যুযুধি বিবস্বান্,
বা শ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়াম্বভিনো ন্যেতুধর্ত্তাদিবঃ
সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ঋগ্বেদ ॥

হে বিশ্ববার! হে সর্ব্বজন-বরণীয়!

হে সবিতা! হে সর্ব্বপ্রসবিতা! হে দ্যুলোকের ধারয়িতা! তুমি এস।

তোমার নিকটে যাইবার যোগ্যতা আমার নাই, তুমি এস। ধেনুকুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া, যেমন শীঘ্র গ্রামাভিমুখে আগমন করে, সেইরূপে তুমি এস। যোদ্ধা যেমন স্বীয় অশ্বের নিকটে আগমন করে, তুমি সেইরূপে এস। দুগ্ধবতী গাভী যেমন প্রফুল্ল মনে হাম্বারবে আপন বৎসের নিকটে আগমন করে, সেইরূপে তুমি এস। স্বামী যেমন ভার্য্যার নিকটে আগমন করেন, তুমি সেইরূপে এস।

---

(৪)

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥বেদ॥
তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ বেদ।
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥বেদ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে
সন্নিবিষ্টঃ ॥বেদ॥

যে দ্যুতিশীল, ক্রীড়াশীল পুরুষ, অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বরূপে ভুবনে প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন—সেই পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

তুমিই অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু, এবং তুমিই চন্দ্রমা। তুমিই শুক্র, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি।

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী, বিশ্বতোমুখ তুমি, তুমি মায়া-অবলম্বনে যেন জাত হইয়া কখনও জরাজীর্ণ মত হও, হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ডগ্রহণ করিয়া চল—ইহাই বক্তব্য। অন্তরাত্মা তুমি, তুমি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হইয়া সকল মানুষের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবেশ করিয়া রহিয়াছ।

[৫]

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ বেদ।
তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষুঃসূর্য্যস্তব প্রভো!
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতাস্তুতিঃ স্তব্য ইহত্বমেব।
ঈশ! ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোঽস্তু ভূয়োঽপি
নমোনমস্তে ॥ কাশীখণ্ড।

সর্ব্বপ্রাণীর সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহ বিরাট পুরুষ। এই পুরুষের মস্তক অসংখ্য, চক্ষু অসংখ্য এবং পাদও অসংখ্য। এই পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডগোলক সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া, দশাঙ্গুলি পরিমিত দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। [অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন]॥

বেদ তোমার নিশ্বাস নিখিল জগৎ তোমার স্বেদবিন্দু, বিশ্বভূত তোমার পাদদেশে, তোমার মস্তক আকাশে। তোমার নাভিদেশে অন্তরীক্ষ লোক, তোমার লোম সকলই বনস্পতি। চন্দ্রমা তোমার মন হইতে জাত। হে প্রভো! সূর্য্যই তোমার চক্ষু। তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত। যে স্তব করিতেছে, সেও তুমি: যাহা স্তব করে, তাহাও তুমি: যাহাকে স্তব করে, তাহাও তুমি। হে ঈশ্বর! তোমার দ্বারাই এই সমস্ত আচ্ছাদন-যোগ্য। তোমাকে নমস্কার; পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

[৬]

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি !
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত,
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি !
দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত,
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি !
নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা
মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যো
তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি !
প্রাচ্যোঽন্যা নদ্য স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ
পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি,
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি !
দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি দেবা দর্ব্বীং
পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ বেদ ॥

এই ক্ষয়োদয়রহিত পুরুষের প্রকৃষ্ট শাসনেই অয়ে গার্গি ! চন্দ্র সূর্য্য যথা-স্থানে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ! এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অয়ে গার্গি ! এই দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌরজগৎ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত। এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অয়ে গর্গি। নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি. অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও বৎসর সমূহ নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অয়ে গার্গি ! শ্বেতপর্ব্বত সমূহ হইতে পূর্ব্ব-দেশীয় নদী সকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে. অন্যান্য পশ্চিমদেশীয় নদী সকল আপন আপন গন্তব্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অয়ে গার্গি ! যদ্যাজ্ঞগণকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করিয়া থাকে, এবং দেবগণ যজমানের অনুগত হয়েন, পিতৃগণও দর্ব্বী-হোমের অনুগত হয়েন ॥

(৭)

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ
শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্ ।
ভূতদয়াং বিস্তারয়
তারয় সংসারসাগরতঃ ॥

হে সর্ব্বব্যাপক ! হে বিষ্ণু ! আমার ঔদ্ধত্য দূর কর। আমার মনকে দমন কর। আমার বিষয়-মৃগতৃষ্ণা শান্ত কর। সর্ব্বজীবে যাহাতে আমার দয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহা কর। আমাকে ভীম ভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর।

কতদূর হইল পরীক্ষা।

দর্শনে যাহা হয় স্মরণেও তাহাই হয়, অথবা তদপেক্ষা অধিক হয়। যত দিন ইহা না হইতেছে, তত দিন বেশী কিছুই হইল না। যাহা দেখি তাহা চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। তাহাই যখন স্মরণ করি, তখন মানসে তাহাই বিশেষ ভাবে দেখি। চক্ষে যাহা দেখি তাহা সর্ব্বদা পাই না ; কিন্তু উহাই যখন মনে গাঁথিয়া যায় তখন উহা সর্ব্বদা পাই।

চক্ষের দেখা যদি দেখার মত হয় তবেই উহা নিত্য ভাবনার বিষয় হইয়া যায়। ভাবনা না করিয়া থাকা যায় না। স্মরণ সর্ব্বদাই হয়। আপনা হইতে যখন যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই ধ্যানের বস্তু। যত দিন তাহা মনে রাখিতে চেষ্টা করা যায় তত দিন ধারণার চেষ্টা হয় মাত্র। ধারণা ঠিক হইয়া গেলেই ধ্যান হয়। ধ্যান লাভ করিতে পারিলে আর কোন ক্লেশ থাকে না। আবার এই ধ্যান যখন বহুকাল স্থায়ী হয় তখন হয় সমাধি। চেতন-সমাধি হইলে এমনটি হয় যাহাতে দেহ থাকিয়াও নাই। জগৎ থাকিয়াও নাই। মন, ধ্যেয় বস্তুর অনুভবে এমন ডুবিয়া যায় যে, অন্য কোন বস্তুর চিন্তা মনে আসিতে পারে না অথচ সর্ব্বদাই সজ্ঞানে থাকা

যায়। জড়-সমাধিতে সুষুপ্তির মত একটা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া সব ভুলিয়া থাকা হয়; আপনাকে আপনিও অনুভব হয় না।

তবেই হইল দেখাটা দেখার মত হওয়া চাই, তবেই দর্শনটিই ধ্যানে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

দেখার মতন দেখাটা কিরূপ?

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া হউক।

রাজা যুধিষ্ঠির, মাতা কুন্তীকে দেখার মত দেখিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর, মাতার মুখে শুনিলেন কর্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

পুত্রজং ভ্রাতরং কর্ণং পৃথায়া বচনাৎ প্রভো।
তেন যে দুরতে ভীত্রং হৃদয়ং ভ্রাতৃঘাতিনঃ॥

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জ্ঞাতি, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্রাদি বিনষ্ট হইল। রাজা যুধিষ্ঠির সকলের উদ্দেশে উদক-ক্রিয়া করিলেন। মনে কিছু মাত্র শান্তি নাই। মহাত্মা পাণ্ডবগণ, আপনাদের বিশুদ্ধি সম্পাদন জন্য, এক মাস ধরিয়া পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথী-তীরে বাস করিলেন। সেই সময়ে বহু ঋষি তাঁহাদের নিকট আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন দেবর্ষি নারদের নিকট দুঃখের কথা জানাইলেন। নারদ শোকব্যাকুলচিত্ত রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন। মন কিন্তু শান্ত হইল না। নারদ বলিতে লাগিলেন—রাজন্! ক্ষত্রধর্ম্ম মত তুমি বাহুবলে শত্রু বিনাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছ। যাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাও দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আপনার এখন শোকের অবসর কোথায়? যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন:—

বিজিতেয়ং মহী কৃৎস্না কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ॥
ইদং মম মহদ্দুঃখং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জ্ঞাতিক্ষয়মিমং মহান্তং লোভকারিতম্॥
সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ পিতৃন্।
জয়োঽয়মজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে॥

ভগবন্! সমগ্র পৃথিবী জয় হইল সত্য। কৃষ্ণের বাহুবল-আশ্রয়ে, ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এবং ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে সমরে জয়লাভ হইল সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়

নিরন্তর মহৎ দুঃখানলে সন্তপ্ত হইতেছে। আমি মহালোভী। রাজ্যলোভে সমস্ত জ্ঞাতি বিনাশ করিলাম। আমার অভিমন্যু নাই। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাই। আমিই উহাদিগকে বিনাশ করাইয়াছি। হায় প্রভু! এই জয় এখন পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে।

আমার ভ্রাতৃ-বধূ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা যখন কৃষ্ণের মুখে আপনার অতি-প্রিয় পুত্র অভিমন্যুর বিনাশ সংবাদ শুনিবেন, তখন মধুসূদনকে কি বলিবেন? দ্রৌপদী আজ হত পুত্র হত-বান্ধব। আমাদের প্রিয়কারিণী দ্রৌপদীর দুঃখ চিন্তা করিয়া, আমি যার পর নাই ব্যথিত হইতেছি।

আমার জননী কুন্তী, কর্ণের সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অতিশয় দুঃখে নিপাতিত করিয়াছেন।

আমি পৃথার বাক্যে কর্ণকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিয়াছি। ভ্রাতৃ-ঘাতী আমি! ভ্রাতৃহত্যা নিবন্ধন তীব্র দুঃখে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। আমি কর্ণার্জ্জুন সহায়ে ইন্দ্রকেও সহজে জয় করিতে পারিতাম।

পৃথিবী হস্তগত করিয়াও রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখী। তিনি নিজে কিছুই করেন নাই। কৃষ্ণের প্রসাদে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে, ভীমার্জ্জুনের সহায়ে রাজ্যলাভ হইয়াছে। আর তুমি আমি? এই দেবদ্বিজ-ভক্তি আমাদের কোথায়? এই কৃতজ্ঞতা কি আমাদের আছে?

আমরা বলিতেছিলাম, রাজা যুধিষ্ঠির মাতাকে দেখার মত দেখিতেন। মাতৃ-দর্শনে যখন ক্রোধের শান্তি হয়, যখন মন সমস্ত ভাবনাশূন্য হইয়া শান্ত হয়, তখনই যথার্থ মাতৃ-দর্শন হয়। আবার মাতার মত যিনি দেখিতে—তাঁহাকে দেখিয়াও ঐ ফল হইবেই।

রাজা যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন :—

দুর্যোধনের সভায় দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্ব্বাক্য বলিয়া আমার কত ক্লেশ দিয়াছিল। তাহাদের দুর্ব্বাক্যে আমার ক্রোধ হইত; কিন্তু এই সহসোৎপতিতঃ ক্রোধঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা প্রশাম্যতি। সহসা ক্রোধের উদয় হইলেও কর্ণকে দেখিয়া আমার এই ক্রোধ শান্ত হইত। আমি এখন বুঝিতেছি কেন হইত? তখন কিন্তু ইহা বুঝি নাই। আবার কর্ণ যখন কুরুসভায় দ্যূতক্রীড়া সময়ে আমার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন

কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। কেন করি নাই? কর্ণের চরণ-যুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছিল।

কুন্ত্যাহি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম।
সাদৃশ্যহেতুমন্বিচ্ছন্ পৃথায়াস্তস্য চৈব হ॥

আমি দেখিয়াছিলাম কর্ণের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণ-যুগলের সদৃশ ছিল। আমি তখন ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন ক্রমেই এতদিন উহার সন্ধান পাই নাই। এখন বুঝিতেছি কেন হইয়াছিল। কর্ণের চরণ-যুগল মাতার শ্রীচরণের মত—তাই এ চরণ দেখিয়া মাতৃ-স্মরণে ক্রোধ-শান্তি হইয়াছিল।

আমরা বলিতেছিলাম এতদিন ত ধ্যান কর, শ্রীভগবানের চরণ-যুগলও চিন্তা কর; কিন্তু কখন কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ—চরণ-যুগল স্মরণ করিবা মাত্র ক্রোধের শান্তি হইয়াছে? কাম দমিত হইয়াছে? স্মরণ মাত্রেই মন বিষয়-ভাবনা ছাড়িয়া কি এক অপূর্ব্ব-ভাবে নিশ্চল হইয়া যাইতেছে? যতদিন ইহা না হয়, ততদিন শ্রীভগবানের চরণ-দর্শন দেওয়ার মত দেখা হয় নাই। শ্রীভগবানের চরণ স্মরণ! স্মরণের মত স্মরণ হয় নাই।

বলিতেছিলাম নাম করিলে, বা স্মরণ করিলে, বা ধ্যান করিলে প্রত্যক্ষ হইবে যে ইন্দ্রিয় শান্ত হইল, মন কাম ক্রোধাদি শূন্য হইল। ইহা যত দিন না না হইতেছে, ততদিন ঠিক ঠিক ভক্তি-মার্গে যাওয়া হয় নাই। নাম করা, স্মরণ করা, ধ্যান করা—মুখে হইয়াছে। মনে প্রাণে হয় নাই। শ্রীভগবানের নাম স্মরণের, শ্রীচরণ-ভাবনার, চরণ-চিন্তার একটি শক্তি আছে।

সেই শক্তি-বলে তোমার ইন্দ্রিয় দমিত হইবে। তোমার রিপু শান্ত হইবে। ইহাই পরীক্ষা করিতে বলিতেছি।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎস্মরন্।
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধি পারং যাতি তৎপদম্॥

এইরূপ স্মরণ যদি জীবনে অভ্যাস হয়, তবেই না অন্তিমে তাঁহার নাম-স্মরণে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়? সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

শ্রীহনুমান্ শতযোজন-বিস্তীর্ণ নক্রচক্র-ভয়ঙ্কর, তরঙ্গাদি-উদ্বুদ্ধ, আকাশ-মত্ত দুর্গ্রহসমুদ্র লঙ্ঘন সময়ে বলিয়াছিলেন:—

কিং পুনস্তস্য দূতোঽহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ।
তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যম্বুবারিধিম॥

আমি তাঁহার দাস ; তাঁহার হস্তের অঙ্গুরী আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই সামান্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিব।

শ্রীভগবানের নামের বলে কি না পারা যায়? তাঁহার চরণ-চিন্তার কি কিছুই মহিমা নাই? যদি থাকে, তবে আমার শোক কেন যাইবে না? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কেন হইবে না? রিপু-দমন কোন্ ভার কর্ম্ম?

এস এস বিশ্বাস রাখ—শ্রীচরণ-চিন্তাতে এ সমস্তই হয়। নিত্য পরীক্ষা কর। প্রতি বিপদে স্মরণ কর। প্রতি কার্য্যে অভ্যাস কর। যতদিন না হয় ততদিন প্রতিকর্ম্মে স্মরণ করিতে থাক ; এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। সংসারে দুঃখ আছে, রোগ-শোকের যাতনা আছে, দারিদ্র্যের উৎপীড়ন আছে—সব সত্য। যত দুঃখ থাকে থাকুক, কিন্তু শ্রীভগবানের নামও ত আছে? শ্রীভগবানের নাম স্মরিয়া, চরণ চিন্তা করিয়া করিয়া সব সহ্য করা যায় ; সমস্ত ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিশ্বাস রাখ আর নিত্য অভ্যাস কর। পরীক্ষা কর হইতেছে কি না? যদি এখনও না হয়, তবে কাতর হইয়া প্রার্থনা কর—প্রভু! তোমার নামের মহিমা আমি এখনও অনুভব করিতে পারিতেছি না ; আমায় কৃপা কর। নিশ্চয়ই বুঝিবে ইহা হয়। নাম-স্মরণে, শ্রীচরণ-ধ্যানে অসাধ্য সাধন হয় ; সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য হওয়া যায়। নামের বলে বলীয়ান্ হওয়া যায় অথচ কেহই জানিতে পারে না—এত সহিষ্ণুতা তাঁহার ভক্তের আসে কোথা হইতে? এত নির্ভয় তাঁহারা হয়েন কিরূপে? নাম ছাড়িও না, শ্রীচরণ-চিন্তা ছাড়িও না। নিরন্তর অভ্যাস করিয়া যাও, প্রতি বিপদে নাম-স্মরণে পরীক্ষা কর—হৃদয় কত শান্ত হয় ; সমস্ত জীবন ধরিয়া অভ্যাস কর, শেষ জয় তোমার হইবেই।

ঐ যে বলিতেছিলাম তাঁহার স্মরণে অসাধ্য সাধন হয়, অদ্ভুত-বলে বলীয়ান্ হওয়া যায় ; একটা দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

সমুদ্র লঙ্ঘনের পর শ্রীমহাবীর মা'র দর্শন-লাভ করিয়াছেন। শ্রীসীতাকে রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়াছেন। জননীর নিকট হইতে তাঁহার কেশপাশান্তস্থিত চূড়ামণি অভিজ্ঞান স্বরূপে হস্তে লইয়াছেন। বিদায় লইবেন। মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—বৎস! সমস্ত বানর ত তোমার মত অতি সূক্ষ্ম বপু।

তোমরা এই মহাসুরদিগের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? মা জানকী জানিয়াও যেন জানিতেছেন না—শ্রীমহাবীর কিরূপ? জানিয়াও যেন আবার জানিতে চান। শ্রীহনুমান্ তখন আপনার পূর্ব্বরূপ দেবীকে দেখাইলেন। যিনি জীবন্মুক্ত, যাঁহার অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত তাঁহার ইহা কিছুই দুরূহ নহে। সীতা "হর্ষেণ মহতাবিষ্টা।"

নিরতিশয় হৃষ্টা হইয়া দেখিতেছেন—শ্রীহনুমান মন্দর পর্ব্বত সদৃশ; রক্ষোগণ-বিভীষণ,—মহাপর্ব্বত-সন্নিভ। এই কপিকুঞ্জরকে দেখিয়া তাঁহাকে রূপ সম্বরণ করিতে বলিলেন যদি রাক্ষসীরা দেখে তবে ত বিঘ্ন ঘটিবে। শ্রীজানকী বিদায় দিয়াছেন। শ্রীহনুমান প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কতদূর গিয়া ভাবিলেন—শুধুই মাকে দেখিয়া যাইব? আর কিছু করিয়া যাইব না?

কার্য্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্য বিরোধতঃ।
অন্যৎ কিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধমঃ এব সঃ॥

যে কার্য্যে আসিয়াছি তাহা ত হইল। কিন্তু স্বামীর কার্য্যের ক্ষতি না হয় এরূপ অপর কোন কার্য্য না করিয়া যদি লঙ্কা ত্যাগ করি, তবে ত আমি অধম দূত। একবার রাবণকেও দেখিয়া যাইতে হইবে। কিছু বলিয়াও যাওয়া উচিত। পরে রাম-দর্শনে গমন করিব।

এ সাহস কিরূপে আইসে? আমরা বলি ভক্ত সর্ব্বদা নির্ভয়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক আমার প্রভু। আমি তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। আমার কেন ভয় থাকিবে? অসৎকার্য্যে তাঁহার ভয় হয় পাছে স্বামীর বিরাগ ভাজন হই। কিন্তু শুভকার্য্যে তাঁহার ভয় কি? তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সমস্ত শুভকার্য্য করা যায়।

মহাবল শ্রীহনুমান তখন রাবণের অশোক-বাটিকাকে একরূপ বৃক্ষশূন্য করিলেন। সংবাদ রাবণের কর্ণে গেল! রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিল। বহু রাক্ষস বিনষ্ট হইল। শেষে ইন্দ্রজিতের হস্তে শ্রীমহাবীর বন্ধন লইলেন। ইচ্ছা করিয়াই লইলেন—রাবণ, সম্ভাষণ জন্য। কারণ তাঁহার আবার বন্ধন কি?

যস্য নাম সততং জপন্তি যে
হজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ।

সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং
যান্তি কোটিরবিভাস্বরং শিবম্॥
তস্যৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা
হৃদ্‌পদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ।
সদৈবনির্ম্মুক্ত সমস্তবন্ধনঃ
কিং তস্য পাশৈরিতরস্য বন্ধনৈঃ॥

যাঁহার নাম সতত জপ করিলে ক্ষণমধ্যে অজ্ঞানকৃত-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, হইয়া সদ্যসদ্যই মুক্তিলাভ করিয়া কোটিসূর্য্যসমপ্রভ তদীয় মঙ্গলময় পরমপদ লাভ করা যায়—সেই শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম সর্ব্বদা হৃদ্‌পদ্মে সুন্দররূপে ধারণ করিয়া, শ্রীহনূমান্ সকল সময়েই সমস্ত-বন্ধন হইতে মুক্ত ছিলেন। সামান্য ব্রহ্মাস্ত্র পাশে বা অন্য-বন্ধনে তাঁহার কি হইবে?

তথাপি পাশ-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যেন তিনি ভয়ে ভয়ে লঙ্কার চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। নগরের রাক্ষসগণ মহাক্রোধে শ্রীহনূমানকে মুষ্টাঘাত, চপেটাঘাত করিল। মারুতি নিঃশব্দে সহ্য করিলেন। ইন্দ্রজিত, পিতার সভায় বানরকে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইল; যাইবার সময় বলিয়া গেল "ন লৌকিকো হরিঃ"—এই বানর সামান্য বানর নহে! ইহার শক্তি অলৌকিক। মন্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া যাহা সদ্‌যুক্তি হয় তাহাই করুন।

ইন্দ্রজিত চলিয়া গেলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ তখন অঞ্জনশৈল সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, সম্মুখে অবস্থিত প্রধান সেনাপতিকে বলিলেন—প্রহস্ত! এই বানরকে জিজ্ঞাসা কর—এ লঙ্কায় কেন আসিয়াছে? এখানে ইহার কার্য্য কি? কোথা হইতেই বা আসিল? আমার এত রাক্ষস বিনাশ কেন করিল? আমার অশোক বাটিকাই বা বৃক্ষশূন্য করিল কেন?

প্রহস্ত শ্রীহনূমানকে অভয় দিল। বলিল—বানর! রাজার সম্মুখে সত্য বল কে তোমায় প্রেরণ করিয়াছে? তোমার কোন ভয় নাই।

শ্রীহনূমান্ তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হইয়া ত্রিলোক-কণ্টক রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে শ্রীরামচন্দ্রকে "মনসা স্মরন্ মুহুঃ" মনে মনে মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া, রাবণকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

"শৃণু স্ফুটং দেবগণাস্তমিত্র হে"
রামস্য দূতোঽহমশেষ হৃৎস্থিতেঃ।
যস্যাখিলেশস্য হৃতাধুনা ত্বয়া
ভার্য্যা স্বনাশায় শুনেব সদ্ধবিঃ॥

হে দেবতা প্রভৃতির শত্রু! স্পষ্ট শ্রবণ কর। কুক্কুর যেমন যজ্ঞের উৎকৃষ্ট হবি হরণ করে, সেইরূপ তুমি তোমার মরণের জন্য যে ত্রিলোকনাথের ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিয়াছ—আমি সেই সকলহৃদ্বিহারী শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রেরই দূত। ইত্যাদি।

মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিলোক বিজয়ী রাবণ। ভয়ানক রাক্ষস সেনা বেষ্টিত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় এই রাক্ষসরাজ আপন সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সভায় একাকী বন্ধন দশায় উপস্থিত হইয়াও এই রাবণকে তিরস্কার করিতেছেন এই মহাবীর। তুমি ত্রিলোকের কণ্টক! তুই কুক্কুরের হবি গ্রহণের মত চুরী করিয়া, নিজের মৃত্যুর জন্য ত্রিলোকনাথের ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিস্! শ্রীহনুমান প্রবল-বলশালী সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও দুর্দ্ধর্ষ রাবণ কম-বলশালী নহে। যাহার ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত—তাহার সভায় তাহার মুখের উপর এই কটুবাক্য বলিতেও মহাবীর ভীত নহেন। কিসে এত নির্ভয়? আমরা বলি ভক্ত যখন শ্রীভগবানকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া কথা কহেন তখন কি তাঁহার ভয় থাকিতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি তাঁহার স্মরণে কি কাপুরুষতা আসিতে পারে? হায়! শ্রীভগবানকে স্মরণও করি কিন্তু চাকুরী যাইবার ভয় রাখি? দুঃখের ভয়ে দারিদ্র্যের ভয়ে ভীত হই। এ কেমন ভক্তি? এ কেমন স্মরণ? তাই বলি, একবার পরীক্ষা কর কতদূর হইল? কপট ভক্ত হওয়া কিছু নয়। যিনি অভয়দাতা তাঁহাকে স্মরণ করিলে ভয় থাকে না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। শক্তিমানের ভজনে মৃত্যুঞ্জয়েরও শক্তি আসিবে। তাঁহাকে ডাকিলে কোন ভয়ই থাকিবে না।

তাঁহার ভক্ত আরও কত নির্ভীক আমরা শ্রীহনুমানের চরিত্রে তাহাও দেখাইয়া শেষ করিতেছি।

শ্রীহনুমান রঘুনাথ-সৎকথা রাবণকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। কক্ষপরশাস্ত্র হইয়া, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ এই দুরাত্মাকে সদুপদেশ দিলেন। বলিলেন:—

বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং
ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতি মোক্ষহেতুকীং
সমাশ্রয়াত্মান্ত হিতায় দেহিনঃ॥

হে রাবণ! সংসারে লোকের গতি বিবেক-বলে বিচার করিয়া দেখ! রাক্ষসী-বুদ্ধি আশ্রয় করিও না। সংসারে মোক্ষের হেতু দৈবী-গতি আশ্রয় কর—ইহাতেই প্রাণিগণের নিরতিশয় হিতসাধন হয় জানিও। আরও বলিলেন :—

ত্বং ব্রাহ্মণো হ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ
পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি ন পশ্য রাক্ষসো
নাস্ত্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো নহি॥

তুমি ব্রাহ্মণ! উত্তমবংশসম্ভূত তুমি পুলস্ত ঋষির পৌত্র। তুমি কুবেরের ভ্রাতা। যদি দেহাত্মবোধ ছাড়িতে নাও পার, তথাপি বুঝিয়া দেখ তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নও। আর যদি দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, তবে যে তুমি রাক্ষস নও তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

হায়! আজ সমাজ ভরিয়া এই রাক্ষসবুদ্ধি। ব্রাহ্মণবংশে, অতি উচ্চ ঋষির বংশে জন্মিয়াও রাক্ষসের মত আহার-বিহারে রুচি; রাক্ষসের মত সদাচারভ্রষ্ট আমরা। শ্রীহনুমানের এই হিতোপদেশে আমাদের শিখিবারও যে অনেক আছে।

শ্রীহনুমান তত্ত্ব-কথা অনেক বুঝাইলেন। রাবণের আত্যন্তিক মুক্তির সহজ উপায়ও বলিয়া দিলেন। বলিলেন—হে মহামতে! মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

শ্রীহরির প্রতি ভক্তি করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইরূপে যথার্থ বিষয় অবগত হও; তুমি পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে এই পুরাণ-পুরুষ, প্রকৃতির পর, পরম বিভু রমাপতি শ্রীহরি শ্রীরামকে ভজনা কর। মূর্খতা ত্যাগ কর। রামকে মানুষ আর ভাবিও না। সীতা "জনকরাজার

কুবিকার্য্য করা ভাবিও না। শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রকে ভজনা কর। শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া সীতাকে অগ্রে করিয়া, রামকে নমস্কার কর; মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো
ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমব্যয়ম্।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো
ভবাম্বুধের্দুঃখতরঙ্গমালিনঃ॥

মানুষ ভক্তিসহকারে রামচন্দ্রকে পরমাত্মা, অন্তর্যামী, আনন্দময়, অদ্বিতীয় বলিয়া না ভাবিলে, দুঃখতরঙ্গমালাসঙ্কুল ভীষণভবার্ণবপারে গমন করিবে কিরূপে?

নতুবা তুমি যেমন আপনার শত্রু আপনি হইয়া, অজ্ঞানময় বহ্নিদ্বারা নিজ আত্মাকে প্রজ্বলিত করিয়া, নিজকৃত পাপরাশির সাহায্যে আপনাকে অধোগত করিতেছে—এরূপ করিলে তোমার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এ উপদেশ আজ আমাদের কতলোকের প্রতি প্রযুজ্য? কিন্তু ইহার ফল কি হইল?

রাবণ মারুতির এই অমৃতাস্বাদতুল্য সুমধুর বাক্য শুনিয়া ভিতরে আনন্দিত হইল; কিন্তু বাহিরে কৃত্রিম কোপে অধীরতা দেখাইল—যেন জ্বলিয়া উঠিল, উঠিয়া আরক্তলোচনে মহাবীরকে বলিতে লাগিল। এখন আর প্রহস্তকে দিয়া বলান নাই। এখন নিজেই শ্রীহনুমানকে বলিল:—

কথং মমাগ্রে বিলপস্য ভীতবৎ
প্লবঙ্গমানাধমোঽসি দুষ্টধীঃ।
ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো
নিহন্মি সুগ্রীব যুতং নরাধমম্॥

রাবণ ভিতরে বুঝিল! বুঝিয়াও দেখিল বলাধিপতি হইয়া বহুদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। তাই বাহিরে বলিল—অরে! আমি রাবণ রাজা! আমার সাক্ষাতে তোর এই প্রলাপ! তুই দুষ্টবুদ্ধি! তুই বানরাধম। কে তোর রাম যাহার তুই নাম করিতেছিস্? কে তোর সুগ্রীব? তুই কি বলিতে চাস্? আমি সুগ্রীবের সহিত তোর

রামকে অচিরেই বধ করিব। আর তোকে, তোর জনকনন্দিনীকে সকলকে বধ করিব।

ভক্তের নির্ভীকতা কতদূর আমরা তাহাই দেখাইতেছিলাম।

শ্রুত্বা দশগ্রীব বচঃ স মারুতি
র্বিবৃদ্ধকোপেন দহন্নিবাসুরম্।
ন মে সমা রাবণ কোটয়োধমা
রামস্তদাসোঽহমপারবিক্রমঃ॥

মারুতি দশাননের মুখে রামনিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়াছেন। অত্যন্ত ক্রোধদৃষ্টিতে যেন রাবণকে দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন—রে অধম! তোর মত কোটি কোটি রাবণও আমার সমান হইতে পারে না। আমি রামের দাস। সেইজন্য আমার বিক্রম অপার।

আমরাও বলি যদি শ্রীভগবানের শরণ লইয়া থাক, তবে কি তুমি ভীরু হইতে পার? তবে কি তুমি কাপুরুষ হইতে পার? তবে কি তুমি কোন বিপদে অস্থির হইতে পারে? সেই অভয় পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়াও কি তুচ্ছ সংসারের ভয় থাকে?

তাই বলি, কতদূর হইল একবার পরীক্ষা কর। না হইয়া থাকে, আরও প্রবলবেগে যাহা করিতেছ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। কেন হইবে না? শাস্ত্র কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।

শুভ কথা।

বাক্য ত্রিবিধ ক, মা, ৪২৩. শ্রুতি বলেন বাক্য ত্রিবিধ। প্রভুসম্মত, সুহৃৎসম্মত ও কান্তাসম্মত। আধিপত্যশালী প্রভু যেমন ভৃত্যকে (১) "ইহা কর" বলিয়া আদেশ করেন, তদ্রূপ শ্রুতি ও স্মৃতি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রভুসম্মত। "বাহিরে ভিতরে শুচি হইবে" প্রভুবাক্য।

(২) ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সুহৃৎসম্মত বাক্য, যেহেতু উহারা সুহৃদের ন্যায় প্রবোধদানে সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করে।

"স্বর্গকামনায় শৌচ পালন করিবে" সুহৃৎবাক্য।

(৩) কাব্যাদি কান্তাসম্মত বলিয়া গণ্য।

বাক্য নামের অঙ্গ ঐ ৪২৬। পূর্ব্বে বিধাতা এই রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। উহা রজ্জুদ্বারা, গাভীর ন্যায় নাম দ্বারা সম্যক্ আবদ্ধ। সেই নাম-প্রপঞ্চ চতুর্ব্বিধ, যথা—ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্য। ধ্বনি নাদময়। বর্ণ অকারাদি। 'শ' 'ব' ইত্যাদি পদ। পদের সমষ্টি—শিব—বাক্য।

পাপ স্থূলে কত প্রকার স্থ, মা, ৪৪০।

(১) পরস্ত্রীসম্ভোগ-সঙ্কল্প; পরদ্রব্যগ্রহণ-সঙ্কল্প; মনে মনে পরানিষ্টসাধন, অকার্য্য করণবিষয়ক সঙ্কল্প—এই চারি প্রকার মানস পাপ।

(২) বৃথা বাক্যপ্রয়োগ; অসত্য-ভাষণ; অপ্রিয়কথন ও পরনিন্দা এই চারিটি বাচিক পাপ।

(৩) অভক্ষ্যভক্ষণ, হিংসাসাধন, বৃথা কামসেবন ও পরদ্রব্যগ্রহণ এই চারিটি কায়িক পাপ।

বাক্য মনঃ কায়ক স্থূল পাপ; নরকের হেতু। ইহাদের অবান্তর ভেদ অনন্ত।

নরগণ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে, মৃত্যুর পর যাতনাভোগার্থ পূর্ব্ব-দেহের ন্যায় অপর একটি শরীর পায়। অতএব নরকসাধক ঐ বিবিধ পাপ পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। ৪৪৩

শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যভিচার স্থ, মা, ৪৪১।

যে মূঢ় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে সেই শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলে, কিম্বা জীবনধারণার্থ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহার সেই কর্ম্ম সুরাপান-সম পাপজনক।

মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ—জীব দেহ আশ্রয় করিয়া আয়ুষ্কর যাহা কিছু করে তাহার ক্ষয় হইলেই আয়ুষ্কয় হইয়া যায়। আয়ুষ্করের চিহ্ন হইতেছে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হওয়া ও অসৎকার্য্য করা। স্বীয় শরীরের অবস্থা ও বল জানিয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু সেবনে যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন মৃত্যু শীঘ্র আসিবে বুঝিতে হয়। মানুষ তখন কোন দিন অতি ভোজন, কোন দিন একবারে ভোজন ত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ এবং পরস্পর-বিরোধী গুরুতর বস্তু ভোজনে আসক্ত হয়।

কোন দিন ভুক্তবস্তু জীর্ণ হইতে না হইতেই আবার ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রা যায়। কোন কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন বাসনায়, মলমূত্রাদির বেগধারণে প্রবৃত্ত হয়। এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া, শরীরস্থ বায়ু পিত্তকফকে প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলে, রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

কেহ কেহ যদিও কুপথ্যাদি না করে, কিন্তু আত্মক্ষয়কর কুচিন্তা ও কুকার্য্য করিয়াও মরিয়া যায়। মহাভারত।

আধি ও ব্যাধির উৎপত্তি ও নাশ যোগবাঃ নিঃ পূর্ব্ব ৮১।১০ হইতে। দৈহিক দুঃখই ব্যাধি, আর বাসনাত্মক মানসিক পীড়াই আধি। উভয়ের মূল অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উভয়েরই ক্ষয় হয়।

আধি-ব্যাধিই দুঃখের কারণ। আধি-ব্যাধি নিবৃত্তিই সুখ। জ্ঞানবলে ইহাদের সমূলোৎপাটনই মোক্ষ।

শরীরে আধি-ব্যাধি কখন এককালেই উপস্থিত হয়, কখন বা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, কখন বা পরস্পর পরস্পরের কারণ হইয়া উপস্থিত হয়।

আধির উৎপত্তি—(১) তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, (২) তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব (৩) হৃদয়ের লঘুতা পরিত্যাগ করিয়া রাগদ্বেষাদিতে যখন মানুষ আসক্ত হয়, তখন ইহা পাইল না, ইহা পাইলাম না—এইরূপ উদ্বেগজনিত কুচিন্তা ও জড়তা আইসে। এই সমস্ত প্রতীকার না করিতে পারিলে, ঘন মোহদায়ী আধি বর্ষাকালে মিহিকার ন্যায় আবির্ভূত হয়।

ব্যাধির উৎপত্তি—মূর্খতা জন্য চিত্তক্ষয়ের অভাব ঘটিলে যখন পুনঃ পুনঃ ইচ্ছার স্ফুরণ হইতে থাকে, তখন দূষণীয় অন্নাহার, দুর্দ্দেশ ভ্রমণ, অসময়ে আহার বিহার, দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান, দুর্জ্জন-সঙ্গ, দুর্ভাবনা করা, অনাগার বা অতিরিক্ত আহারে নাড়ীরন্ধ্র কখন অতিশূন্য কখন বা অতিপূর্ণ—এইরূপ যখন হইতে থাকে, তখন প্রাণবায়ু অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, হইলে শরীরও বিকলীকৃত হয়; তাহাতে সুস্থতার অভাব হয় এবং দেহে ব্যাধি উপস্থিত হয়। বর্ষা বা নিদাঘ সময়ে নদীর মত নানা বিপর্য্যয় ঘটে।

আধি-ব্যাধি নাশের উপায়—প্রাক্তন বা ঐহিক শুভাশুভ মতির মধ্যে যাহার প্রবলতা অধিক তাহাই আধিব্যাধিক্রমে সংযোজিত করিয়া থাকে।

ব্যাধি দ্বিবিধ—সামান্য ও সার।

ব্যবহারিক পীড়াই সামান্য কিন্তু জনন মরণাদির হেতু যাহা তাহাই সার। অভিমত অন্নপান, স্ত্রীপুত্রাদি প্রাপ্ত হইলে সামান্য ব্যাধির শান্তি হয়। আধি-ক্ষয়েও ব্যাধির নাশ হয়; কিন্তু বিনা আত্মজ্ঞানে সার আধির বিনাশ ঘটে না—যেমন রজ্জুবোধ ভিন্ন রজ্জুসর্প জ্ঞানের নাশ হয় না তদ্রূপ।

বর্ষাকাল, নদীতটস্থিত লতাসমূহকে যেমন পাতিত করে, সেইরূপ আধিক্ষয় হইলেই সমস্ত ব্যাধির শেষ হয়। আধি হইতে যে সমস্ত ব্যাধি জন্মে নাই, তাহা দ্রব্য, মন্ত্র, স্বস্ত্যয়ন, চিকিৎসাদি দ্বারা শান্ত হয়। তীর্থাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধী, বৃদ্ধপরম্পরাগত চিকিৎসা ইত্যাদি দ্বারা ব্যাধি দূর হয়।

রোগের মূল কারণ—চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলে দেহও ক্ষুভিত হয়। ব্যাধ-ভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় প্রাণিগণ ক্ষুব্ধ হইলে, সম্মুখের পথ দেখিতে পায় না; প্রকৃত পথ ছাড়িয়া তখন ইহারা বিপথে যায়। ঐ বিক্ষোভে প্রাণবায়ু সমভাব ত্যাগ করিয়া, জলে হস্তী প্রবেশ করিলে জল যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া নিজের প্রবাহ-পথ ত্যাগ করে এবং তটের উপরে উচ্ছলিত হয়—সেইরূপ বিষমভাবে গমনাগমন করে। রাজার যথেচ্ছাচারে যেমন বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলতা ঘটে, সেইরূপ প্রাণের বৈষম্যে নাড়ী সকল বিষম-ভাব ধারণ করে। প্রাণ বায়ুই অন্নাদিকে রসরূপে পরিণত করে: কিন্তু অন্নাদি সকরণ সময়ে যদি নিরুদ্ধ হয়, তবে ধাতুবৈষম্য ঘটে, পরে রোগ জন্মে। যে ক্রিয়ায় বায়ুর সমতা হয়, তাহাতে রোগও নাশ হয়।

অধোগতি স্ক, মা, ২১০।

মৃত্যু যে সকলের মস্তকে অধিষ্ঠিত, জনগণ যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আহারেও রুচি হয় না, অকার্য্যকরণের কথা আর কি বলিব? আহা! সর্ব্বজন্মের দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও, কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া, সেই মানব-জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে! ঐ সকল মূঢ়দিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের জন্ম কিসের জন্য? আর জন্মের লাভই বা কি? অন্তঃকরণের সহিত বিচার করিয়া তাহা বলিতে পার? নারীগণ হইতে জীব-জগতের উৎপত্তি হয়;

সুতরাং আমরা তাহাদিগকে নিন্দা করি না ; পরন্তু যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জ-ভাবে আসক্ত হয় [লোকনিন্দা হইতেছে তবুও ছাড়ে না] কেবল তাহাদিগকেই নিন্দা করি। পদ্ম জন্মা ব্রহ্মা, জগতের বৃদ্ধি নিমিত্ত মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং সেই মিথুনের যথাযোগ্য আচার পালন করাই কর্ত্তব্য ; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। বহ্নির ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে বান্ধব কর্ত্তৃক যে নারী প্রদত্তা হয় তাহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই প্রশংসাজনক ও সর্ব্বসুখ-সম্পাদক। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরস্পরের যত্নে সাধিত হইলেই সুফলপ্রদ হয়, নচেৎ অনিষ্ট সাধনই হইয়া থাকে। ঐ ১অঃ, ২১০পৃঃ। পুরুষ গণের পরদার সেবার ন্যায় আয়ুষ্করকর অপর কোন কর্ম্ম নাই। ঐ ৭অঃ ২৫১পৃঃ।

হায়! কাহাকেই বা বলি, আর কেই বা শুনে। রসরক্তাদি ছয়টি ধাতুর যাহা সার, সেই বীর্য্য যে মূঢ়, যোগ্য যোনি পরিহার পূর্ব্বক কু-যোনিতে নিক্ষেপ করে,—যমদেব তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,সে ওষধিদ্রোগী,আত্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী, সুদীর্ঘ কালের জন্য তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে ঐ ঐ ২১০ পৃঃ।

উত্তম—তপস্যা—কামের উপাসনা —পার্ব্বতী ও মহাদেব [স্ক, মা, ৩২৮, ২৮৪, ৩৩৮, ২১৬, ৩৪১, ৩৮৩]

এই সংসার সতত গমনশীল। ঘোর গুহ্য কালাগ্নিতেই আহিত। ইহাতে যাঁহারা "ইহা অদ্য করিব, ইহা কল্য করিব" ইত্যাকার কল্পনা করে,—কাল, নদীবেগের ন্যায় তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া থাকে।

তপস্যা অপেক্ষা আর কিছুই উত্তম নাই। তপস্যাই মহাজনগণের ধন। তপস্যা দ্বারাই সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মন্মথ! তোমার রূপ তিন ভাগে বিভক্ত। তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক।

মুক্তি ব্যতীত অপর যে কামনা তাহাই তোমার তামস রূপ। সুখ-বুদ্ধিতে যে বিষয়-ভোগ-কামনা, তাহা তোমার রাজস রূপ। কেবল মাত্র উপস্থিত প্রয়োজন সাধনার্থ যে কামনা, তাহা তোমার সাত্ত্বিক রূপ। তোমার এই রূপত্রয়ের কোন একটিরও উপাসনা কে না করে ?

মহাদেব কহিলেন :—

তপস্যা ব্যতীত শরীর শুদ্ধি হয় না। সুতরাং পার্ব্বতী যদি তপস্যাচরণ না করেন, তবে ইহার অশুদ্ধ দেহের সহিত আমার বিশুদ্ধ দেহের সংযোগ সঙ্গত নহে।

যাহারা দান না করে, তাহারা জন্মান্তরে দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, মূর্খ ও পরাধীন রূপে বিবিধ দুঃখভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ধনবান্ হইয়াও যদি দান না করে, এবং দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্যা না করে, তবে তাহাদিগকে কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত করা কর্ত্তব্য।

পার্ব্বতী আরও বলিলেন—এই অস্থায়ী শরীর দ্বারা যদি স্বার্থসাধন না হয়, তবে এই শরীরে ফল কি? তখন তিনি ত্রিসন্ধ্য স্নান ও প্রণবাভ্যাসে সমাসক্ত হইয়া হৃদয়ে ঈশ্বরকে সংস্থাপন পূর্ব্বক মুনিগণেরও সম্মানার্হ হইলেন। ৩৪১।

ছদ্মবেশী মহাদেব পার্ব্বতীকে স্পর্শ করিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে কোন এক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া বলিলেন, যোগাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিব। যেহেতু আমি মহাদেব কৃত-সঙ্কল্প। পরন্তু এক্ষণে উচ্ছিষ্ট হইয়াছি। [একটু ভাবিয়া দেখ, কতবার উচ্ছিষ্ট হইতেছ। এখন আলস্য ত্যাগ করিয়া যোগাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ কর। তবেই পবিত্র হইয়া পবিত্রকে পাইবে] ৩৪৩।

[মহাদেব কে]

মহাদেব সমস্ত জগতের আদি। সমস্ত জগৎই তাঁহার রূপ; সুতরাং তিনি উলঙ্গ। তিনি গুণত্রয়াত্মক শূল ধারণ করেন বলিয়াই তিনি শূলী। এই সংসারই শ্মশান। প্রার্থীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি শ্মশানে বাস করেন। ধর্ম্মই বৃষমূর্ত্তি। তাই তিনি বৃষভবাহন। ক্রোধাদি দোষ সমুদায়ই সর্প। জগন্ময় মহাদেব সেই সকল সর্পকেও সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ভূষণরূপে ধারণ করেন। বিবিধ কর্ম্ম সকলই জটা স্বরূপ। তিনি সমস্তই ধারণ করেন। ভেদত্রয় তাঁহার ত্রিবিধ নেত্র। ত্রিগুণময় শরীরই ত্রিপুর-পদবাচ্য। তাহা তিনি ভস্মসাৎ করেন বলিয়া তিনি ত্রিপুরঘ্ন। যে সকল সূক্ষ্মদর্শী মহাদেবকে এই রূপ জানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভজনা কেনন: করিবেন? ৩৪৪

[মহাদেবের উপাসনা করিলে মহাদেব বলেন, পুনঃ পুনঃ সাধনা দ্বারা আমার কৃপায় আমার মত হইবে]

সুখের অন্তরায়।

বিজলী যদি হ'তো ধীর,
কুসুমে পেত ভাষা।
চাঁদের যেত কালিমা মুছি.—
প্রাণের যেত আশা!
জগৎ চির-জাগ্রত
উষাটী হ'তো বন্ধ্যা।
প্রখর হেসে, দিবস শেষে
প্রসবিত না সন্ধ্যা।
চিত্ত-দ্বারে নিত্য পাখী
গাহিত সুখে প্রভাতী।
বন মধুপ গুঞ্জনে
উঠিত প্রেম-আরতি।
শিশির-মাখা সদ্যঃ ফুলে
ভরিয়া যেত ডালা;
চরন্-সুখে জুড়াত হিয়া
শুকাত না গো মালা।

ছ (নাটোর)

শ্রীগুরু।

তুমি কি আমার গুরু শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ?
অভিনব রসে মগ্ন, কখন সম্পূর্ণ নগ্ন,
গৃহস্থ সন্ন্যাসী চির, শচীর দুলাল।
ত্রিশূল খেটক অসি, কভু ধর চক্র বাঁশী,
গলে দোলে বনমালা চরণে নূপুর।
ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা ওরে, পদচিহ্ন বক্ষোপরে
ললাটে তিলক রেখা মরি কি মধুর।
ভক্ত-চিত্ত রঞ্জন, অজন ভয়-ভঞ্জন,
তুমি কি আমার গুরু যশোদানন্দন ?
গোপেশ গোকুলানন্দ, প্রাণাধিক শ্রীগোবিন্দ
তুমি কি ধরিয়াছিলে রাধার চরণ ?
আপদ-হরণ-কর্ত্তা, অনাথ জনার ভর্ত্তা,
নাগান্তক অঘ বক দুষ্ট-দর্পহারী।
দেবতা কুশলাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বসাক্ষী,
সূর্য্যকুল সূর্য্য তুমি সরযূ বিহারী।
তুমি কি আমার গুরু, জগন্নাথ কল্পতরু,
দুবাহু তুলিয়া জীবে করিছ আহ্বান।
দুস্তর সংসার-ব্যাধি, আমি ছিব মহৌষধী,
এস এস পাপী তাপী লোক মুহুর্মান্।
জাতি-ভেদাভেদ-জ্ঞান, নাহি হেথা মানা স্থান,
তুমি কি আমার গুরু কুল-কুণ্ডলিনি ?
ষড়ঙ্গ শিবের পরে, ভুজঙ্গ বলয়াকারে,
আধার-কমল-স্থিতা শিব-কুটুম্বিনী।
প্রভাষিতা প্রভাবতী, নিত্য মুক্তা আদি সতী,
ত্রেতা, দ্বাপর তুমি কুলকচারিণী।
অতসী-কুসুম-বর্ণা, হাস্যময়ী সুলক্ষণা,
নূতন যৌবনী দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী।
ধরাধর্ম্ম প্রাণরূপা, জ্ঞান নীতি বিশ্বরূপা,
ভূতেশ নয়নানন্দা নমঃ পীতাম্বরী।
সর্ব্বকামফল-দাত্রী, চতুর্ভূজা জগদ্ধাত্রী,
তুমি কি আমার গুরু ত্রিলোক-সুন্দরি ?
প্রিয় পতি-হৃদি মাঝে, দাঁড়াও নির্ল্লজ-সাজে,
তুমি কি আমার গুরু শিবে শবাসনা ?
ভীমরূপা ভয়ঙ্করী, দ্বি-নেত্রা দিগম্বরী।
পরা-বিদ্যা দীপ্তিময়ী প্রসন্ন-বদনা।
গভীর গর্জ্জনে হাসি, এলাইয়া কেশরাশি,
কি কর তাণ্ডব লীলা দানব-দলনি ?
তুলি ধীরে সব্য কর, সন্তান সন্তাপ হর।
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে শিব-প্রসবিনী।
কোমলাঙ্গ শ্যাম তনু, নখরে বিরাজে ভানু,
মধীন কিশোর-রূপ ললিত ত্রিভঙ্গ।
কটিতটে পীতবাস, অধরে জড়িত হাস,
বারিজ ভূষণ-হারে শোভিত শ্রীঅঙ্গ।
বদন নয়ন চারু, তুলি-আঁকা যুগ ভুরু,
তুমি কি আমার গুরু শান্তির নিলয় ?
কপিধ্বজ রথোপরে, অশ্ব রশ্মি করে ধরে,
সারথ্য করিয়াছিলে নিশ্চল অব্যয়।
বাম করে রশ্মি ধরি, ঈষৎ বাঁকিয়া হরি,
ক'রেছিলে ধনুগুণে সীতায়ত দান।
আবার তেমনি ক'রে, বল গুরু ! কৃপা ক'রে,
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।
বহিতে পাপীর ভার, বল এত দয়া কার ?
তুমি কি আমার গুরু রাম রঘুবর ?
প্রাপ্ত-রাজ্য অনায়াসে ত্যেজি, দীন-ধর্ম্মবেশে,
দণ্ডক-কাননে যাও রাজ-রাজেশ্বর ?
ননীর প্রতিম রাম, নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম
ব্রহ্মচর্য্য, ধৃতি, সত্য, আর্জ্জব অক্ষেয়।
নিজে করি আচরণ, শিখাইলে নারায়ণ,
ধাতার বিধাতা তুমি সর্ব্বলোক-গোপ্তা।
রাজলক্ষ্মী দিলে বনে, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জনে,
এখন কর্ত্তব্য তরা কাহার পরাণ ?
বৈরাগ্য-মাধুর্য্য মূর্ত্তি, ন্যায়-ধর্ম্ম-মাখা শক্তি,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নাহি ভেদ ব্যবধান।
পশু পক্ষী গুণ গায়, রাম নামে মুক্তি পায়
তুমি কি আমার গুরু শ্রীরাম চিন্ময় ?
সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী, রাবণারি ধনুর্দ্ধারী,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব অক্ষয় নিশ্চয়।

—

আগমনী।

(১)

রাজপথ পাশে গাহিছে ভিখারী
"আয় মা আয় মা উমা"।
শরৎ এসেছে আয় মা শারদা
আয় আয় হররমা।

(২)

সারাটি বরষ সহিয়াছে কত
বিদারুণ ক্লেশভার।
দীর্ঘ যামিনী পল পল গণি
চেয়েছে মুখ তোমার।

(৩)

চিরদুখতরা বাঙ্গালীর মুখে
ফুটেছে হাঁসির রেখা।
আঁধার রজনী হইয়াছে ভোর
শুকতারা দেছে দেখা।

(৪)

ঐ না বাজিছে বোধন বাজনা
ঐ আগমনী-গীতি।
পূরব গগনে উজল সিঁদুর
প্রকাশে মধুর ভাতি।

(৫)

শেফালিকা রাশি ফুলশয়াপে
গন্ধ বিতরে হরষে।
আসিয়াছে দিন আয় মাতা আয়
পুণ্য নবীন বরষে।

(৬)

তব শুভ্রকান্তি মধুর প্রতিমা
হৃদয়ে বিতরু শান্তি।
তুমি মঙ্গল করে অভয় বাণিয়া
নাশ গো সকল ক্লান্তি।

(৭)

গণেশজননী সন্তান তব
সকল সিদ্ধিদাতা।
ময়ূরপৃষ্ঠে সোতে ষড়ানন
মঙ্গলময়ী মাতা।

(৮)

কমল আসনে বসেন কমলা
ধনধান্য দায়িনী।
বিদ্যাদায়িনী মাতা বীণাপাণি
অজ্ঞানঘোর-নাশিনী।

(৯)

দশ দিক তুমি করিছ রক্ষা
দশপ্রহরণ ধারিণী।
অয়ি মঙ্গলময়ি শুভদে বরদে
মাতা করুণারূপিণী।

(১০)

নয়নে তোমার করুণার ধারা
স্নেহ-ক্ষীরনিধি হৃদয়ে।
পয়োধরে তব ত্রিদিবের সুধা
সন্তান-ক্ষুধা নাশয়ে।

(১১)

বাহুতে তোমার বিপুল শক্তি
মুক্তি চরণে লুটায়ে।
(চির) মুক্তপুরুষ ভোলানাথ যাহা
আদরে ধরেন হৃদয়ে।

(১২)

বক্ষরে অসুর বক্ষ সিংহ তোমা
পেয়েছে পরমপদ।
তবের বাসনা চরণযুগল
ক'রেছ চিরসম্পদ।

(১৩)

সর্প তোমার অনন্ত সকল
করিছ মায়ের কাজ।
বিরাট মহান্ এক নবদুর্গা
দেখিতেছি আমি আজ।

(১৪)

অনের কালিমা ধাওনা ঘ চাহে
অন্ত নয়ন খুলিয়ে।
অপার্থিব হেন রূপরাশি তোর
দেখি যেন মাতা হৃদয়ে।

(১৫)

দিবস রজনী নাহি থাকে যেন
কাল ব'ক কাল পড়।
(তব) চরণের তলে অনন্তের তরে
মস্তক করি নত।

স

বিবিধ।

১

উপাসনা] উপাসনা করিলে ভাবও কত উঠিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যখন বিদেশে যাত্রা করিলে, কান্না পাইল কি? তোমায় ছাড়িয়া মা! কেমন করিয়া থাকিব, কি করিয়া তোমার স্নেহ-মধুর নয়নের আড়ালে যাইব? কে আমায় ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল দিবে? কাহার কাছে আমি দাঁড়াইব? কাহার পানে চাহিয়া আমি জুড়াইব? পরিশ্রান্ত হইলে কাহার স্নেহরসোচ্ছলিত আনন্দধারা আমার দগ্ধহৃদয় শীতল করিবে, ভাবিয়া চ'খে একবিন্দু জল আসিল কি? বাহিরের পিতামাতা ছাড়িয়া দূরদেশে আসিবার যে একটা শূন্য শূন্য ভাব বোধ হয় সেরূপ কিছু হইল কি? যদি না হইল তবে কি করিলে? উপাসনা না অপাসনা?

২

সন্ধ্যা] বন্ধু সন্ধ্যা করিতেছিলেন—সন্ধ্যা শেষ হইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়াই আবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি গবাক্ষের মত খুলিয়া দিলেন। অপর বন্ধু নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, তুমি এতক্ষণ কি করিলে? তুমি যেন আপন মনে কাহার সহিত চুপিচুপি কি বলিতেছিলে? বন্ধু বলিলেন, সে কি! সন্ধ্যা করিলাম। উহা চুপিচুপি কথা নহে উহা সন্ধ্যার মন্ত্র।

বন্ধু] সং করিলে না ধ্যা করিলে! আমি ত দেখিলাম তুমি সং

করিতেছ, তা। করিতে থাকিলে কি এত ইন্দ্রিয়-কোলাহল থাকে? মন্ত্র কি? তাহাও ত গুপ্ত কথা। মন্ত্রি ধাতু হইতে মন্ত্রপদ নিষ্পন্ন। মন্ত্রি ধাতুর অর্থ গুপ্তকথা বলা। পঞ্চভূতে তোমার দেহ ইন্দ্রিয় গঠিত—ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি ভূত, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভৌতিক এই ভূত ভৌতিক—তোমার জ্ঞানরত্ন অপহরণ করিয়াছে, তোমাকে ভূতে পাইয়াছে, তাই ভূতাবিষ্টের মত 'শন্ন আপোধন্বন্বা' ইত্যাদি কত কি অসম্বন্ধ বলিতেছিলে—উহা মন্ত্র নহে, দেহ ইন্দ্রিয়াদির নিকট লুকাইয়া মন্ত্রময়ীর সহিত জ্ঞানরত্ন উদ্ধার বিষয়ক মন্ত্রণার কথাকে মন্ত্র বলে। তুমি এই ভাবে সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ কর—তোমার বিশুদ্ধ হৃদয়-কমলে মন্ত্রময়ী আসন গ্রহণ করিবেন।

৩

তীর্থস্নান] দেহকে ত এতদিন স্নান করাইলে, চিত্তকে কখন স্নান করাইয়াছ? একদিন এই দেহের পাদ্য মহাস্নান, গন্ধ চন্দন, বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভন মালিকা ভোগ না হইলে তুমি পাগল হও—মনের কথা কি তোমার একদিনও মনে হয় না? আহা একবার চিন্তা কর দেখি কি অবস্থা ইহার! হতভাগ্য অনাদিকাল হইতে অস্নাত, আহার নাই, নিদ্রা নাই, আরাম নাই, বিরাম নাই, সর্ব্বদা তোমার জন্য বেচারি খাটিয়া মরিতেছে, যখন দেহ ইন্দ্রিয় ঘুমায় তখনও ইহার অব্যাহতি নাই তখন একাকী এই চিত্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি সব সাজিয়া তোমার তৃপ্তির জন্য কত দৃশ্য তোমার সম্মুখে স্থাপন করে! আহা তুমি একবার ইহার দিকে চাহিবে না? ঐ দেখ শাস্ত্র মানসিক তীর্থস্নানের কথা বলিতেছেন ইহাকে একটু অবসর দাও, ইহাকে লইয়া তীর্থস্নানে যাত্রা কর। শোন, শাস্ত্র বলিতেছেন—

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জব মেবচ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থ মেবচ।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
তীর্থানামপি তৎ তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা॥
এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্!
যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্॥

শাস্ত্রমুখে ভগবান্ বলিতেছেন—দেবি! সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্ব্ব-ভূতে দয়া, সর্ব্বত্র সরলতা, দান, দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) সন্তোষ এই সমুদয় মানসিক তীর্থ, ব্রহ্মচর্য্য পরম তীর্থ, তদ্ভিন্ন প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য-কার্য্য ইহারা মানসিক তীর্থ বলিয়া উদাহৃত। কিন্তু চিত্তের পরমবিশুদ্ধি (অর্থাৎ ভগবদ্ভাবময়তা) ইহা তীর্থেরও তীর্থ। তীর্থ ও ভগবদ্ভাব মধুর মহাপুরুষের সংস্পর্শে তীর্থবাস-সুলভ প্রসাদ ও পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে; এই জন্য ভাগবত-ভাব তীর্থেরও তীর্থ। এই তোমাকে শাস্ত্রমুখে ভগবান্ তীর্থ-স্নানের কথা বলিলেন। তুমি মনকে লইয়া এই তীর্থস্নান করিতে থাক, দেখিবে পরমগতি অনাহূতভাবে ব্রহ্মলোক প্রেরিত অমানব দূতের মত তোমার নিকটে আসিবে।

৪

মিলনের উপায়] বিরহিণী বিরহ-বেদনা দূর করিবার জন্য যদি বাহিরে বিচরণ করে, যদি প্রতিবেশিনীর সহিত অন্য কথায় চাপা দিয়া বিরহ-যাতনা ভুলিতে চায়, তবে ক্রমে তাহার ব্যভিচারদোষ ঘটে, সেইরূপ চিত্ত। যদি ভগবদ্-বিরহ বুঝিয়া থাক, প্রাণের 'হা হতাশ' জুড়াইতে বাহিরে যাইও না, দুঃখ দূর করিতে বাহিরের রূপ রসাদি বিষয়সঙ্গ করিও না ব্যভিচারী হইয়া যাইবে। প্রাণকে প্রাণেশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত কর, তাহার রূপ গুণ স্মরণে ও মানসপূজায় রত কর। তার পর যাহা কর্ত্তব্য তিনিই করিবেন। আপন উদ্ধারের জন্য জনকদুহিতার কার্য্য আপন অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত প্রিয়ভাব স্মরণ ও প্রিয়নাম কীর্ত্তন; সেতুবন্ধন, রাবণবিনাশ প্রভৃতি শ্রীরামের কার্য্য।

৫

ভক্তি ও ভক্ত] ভক্তি রাজ-রাজেশ্বরী, বিশুদ্ধ হৃদয়কমল তাঁহার পবিত্র সিংহাসন। 'আসনে কোথায় আসন দিবে' তুমি তাহারই আয়োজন কর। তিনি ভাব-গ্রাহিণী তিনি আসিবেনই। কপটতা করিও না, সরলপ্রাণে প্রণিহিত মনে আপন কর্ত্তব্য করিয়া চল, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর, ভক্তির সিংহাসন স্থাপন বা সংস্কার কর—তোমার সম্মুখে ভক্তির রাজা উদ্ভাসিত হইবে। পূর্ব্বে জ্ঞানের জন্য প্রলুব্ধ হইও না, কর্ম্ম অনর্থক পরিশ্রম মনে করিও না, জ্ঞান-রসিক বশিষ্ঠাদি মহর্ষির কথা মুখস্থ করিয়াছ বলিয়া আপনাকে যথার্থ জ্ঞানী মনে

করিয়া আত্মপ্রতারণা করিও না। কর্ম্ম কর, বিনা কর্ম্মে ভক্তি আসে না, আসিলে তুমি আসনখানাও দিবে না, মিথ্যা কল্পনা বলিয়া ফুৎকারে উড়াইবে—কে তোমার গৃহে আসিতে চায়? আর ভক্তি? ভক্তি যোগীশ প্রাণবল্লভা, তিনি বিনা আসনে কেন আসিবেন? কোথায় আসিবেন? তাই বলিতেছিলাম কর্ম্ম কর, প্রাণ স্থির কর। প্রাণের চঞ্চলতা, বিষয়কামনায় প্রাণের দীর্ঘশ্বাস। ইহা দ্বারা ভক্তির ঘট চালিত হয়, তাই ভক্তি বসিতে পারেন না। প্রাণ স্থির কর, নাসাদ্বারে প্রাণকে দৌবারিকরূপে স্থাপন কর; আপন অঙ্গজ্যোৎস্নায় তোমার হৃদয়মণ্ডপ উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তি আসিবেন। (ক্রমশঃ)

সহকারী সম্পাদক ৺কাশীধাম।

বিশ্বনর্ত্তকী।

যে মায়া মহৎব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র একটী জীবকেও বাদ দেন না, যাঁহার রঙ্গে এই ত্রিভুবন কোথাও শান্ত নাই সেই, মায়ার বর্ণনা কে করিবে? নির্গুণব্রহ্মে মায়া নাই। চৈতন্যদীপ্তা মায়া সগুণব্রহ্মকে লইয়া জীবভাবে নৃত্য করে।

এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে একমাত্র মায়াই নৃত্য করিতেছেন। ভূতল পাতাল, নভস্তল ঐ নটীর পাদবিক্ষেপ ভূমি। তারকাপুঞ্জ ঐ নটীর গাত্রনিঃসৃত স্বেদবিন্দু। ঐ নটীর গগনরূপ মুখে, চন্দ্রসূর্য্যরূপ কুণ্ডল দোলায়িত। মেঘমালারূপ ঘনা (পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর, ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালার অভিনেত্রীর পরিধেয় বাস। বিবিধ রত্নখচিত সপ্তসাগর ঐ অভিনেত্রীর হস্তবলয়। ঐ অভিনেত্রী প্রহর দিবস পক্ষ প্রভৃতি রূপ নেত্র কটাক্ষপাতে অম্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে। কুলপর্ব্বত সকল ঐ অভিনেত্রীর শিরোভূষণ কিরীটাদি, কিরীট কখন অবনমিত কখন উন্নমিত হইতেছে। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী উহার হারযষ্টি। গগনসলিলে প্রতিবিম্বিত শশী ঐ হারের চন্দ্রকান্তমণি। সান্ধ্যমেঘ উহার করপল্লব, তাহা কখন বাহিরে বিকম্পিত কখন বা তিরোহিত। ভুবনবাসীজনগণ ঐ অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা আবার অবিরত ঝন্‌ঝনায়িত হওয়ায় ঐ নাট্যশালা অতি মনোহর হইতেছে। বলা হইতেছে এই ব্যোমাত্মক

রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিণী নর্ত্তকী নিয়তই জগতের অভিনয় করতঃ নৃত্য করিতেছে। সুখদুঃখ দশা ঐ নাট্যরঙ্গের নটীর রসভাব পরিস্ফুটকরণ। এই সংসার-নাটকের অভিনয়ে, বিবিধ বিকারভঙ্গীপূর্ণ নিয়তিবিলাস বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ব্বদা সাক্ষী হইয়া সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ তিনি উক্ত নটী ও নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন।

এই বিশ্বনর্ত্তকীর নৃত্য অনুসরণ করিতে পারে এই ত্রিভুবনে এমন লোক কেহ নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে? অপরাপ্রকৃতি পরাপ্রকৃতি, ঈশ্বর, সগুণব্রহ্ম সকলকে লইয়া ইঁহার রঙ্গ। কর্ম্মী, বিশ্বাসী-ভক্ত, অর্দ্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের উপর ইঁহার সমান অধিকার। জড়প্রকৃতি চেতনপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই ইঁহার রঙ্গমঞ্চ। আপনিই রঙ্গমঞ্চ, আপনিই অভিনেত্রী, আপনিই দর্শক, আপনিই রঙ্গ। বলা যায় না, ধারণা করা যায় না এ রহস্য কি?

ব্রহ্মে উঠিয়া ব্রহ্মকেই আবরণ ইঁহার প্রথম ক্রীড়া। শুধু তাহাই নহে, পরমশান্ত সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে আবরণ করিয়া অরূপে দেখান ইঁহার দ্বিতীয় রঙ্গ। আপনার গুণে সেই রমণীয় পরমপুরুষকে ভগবান্ করিয়া আপনি মায়াবিনী বিশ্বনর্ত্তকী, আর তিনি মায়াবী বিশ্বনর্ত্তক। নৃত্য করিতে করিতে তিনি আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ ধরিয়া সেই মায়াবী পুরুষের অর্চ্চনা করেন, সেই পুরুষও তাঁহার ন্যায় বিশাল শরীরে নৃত্য করেন।

অব্যক্ত অবস্থায় থাকিয়াও বিশ্বনর্ত্তকীর রঙ্গের বিরাম নাই। পরমশান্ত পরমপুরুষকে লইয়া কোন এক অব্যক্ত দেশে কোন এক অব্যক্ত বেশে আসিতেছেন। পুরুষ আদি প্রেমিক আর তিনি আদি প্রেমিকা।

ইনিই বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে শুকদেবের পশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাইয়াছেন; জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠদেবকে পুত্রশোকে অধীর করাইয়া গলদেশে প্রস্তর বাঁধাইয়া প্রাণত্যাগে ছুটাইয়াছিলেন ইনিই। আবার ইনিই ব্রহ্মহত্যা হইবে ভয় দেখাইয়া বিপাশার অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে ব্যাকুল করিয়া বশিষ্ঠদেবকে শাপমুক্ত করাইয়াছেন। শুভ্রশ্রু পরমভক্ত নারদকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাঁহার গর্ভে বহু সন্তান সন্ততি—আবার তাহাদের পুত্র কন্যা এই সব করাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যে পরিবৃতা মৎস্য-জননীর ন্যায় রঙ্গসলিলে ভাসাইতেছেন, খেলা করাইতেছেন, আবার ভয় দেখাইয়া জলমগ্ন করাইতেছেন—আবার স্ত্রীবেশ

ঘুচাইয়া; দাড়ী পরাইয়া, চমৎকার ভাবে আপনার মূর্ত্তি আপনাকে দেখাইয়া বলাইতেছেন এ কি—অমন সুন্দর কমনীয় মুখে এই কর্কশ কেশরাশি! সাধীব্রাহ্মণকে একক্ষণের চণ্ডাল করিয়া, রাজা করিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতেছেন; আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এক রাত্রির একক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের দুঃখ ভোগ করাইতেছেন—কে ইহার লীলার সংখ্যা করিতে পারে?

বদ্ধ জীবের উপরে ইহার ক্রীড়া কি অদ্ভুত! কাহাকেও রাজেশ্বর করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী করিয়াছেন কাহাকেও আবার বা বৃক্ষতলা সার করিয়া দিনযামিনী দুঃখে কাঁদাইতেছেন, আবার কেহ বা সব শূন্য হইয়া আনন্দে গাহিতেছে—

কেহ সংসারে এসেচে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্যধন রে।
আমার দরিদ্রেরই ধন দু'খানি চরণ
যতনে পরেচি হায় রে॥

এক দণ্ডে হাস্য ক্রন্দন, এক দণ্ডেই শীতে কম্পমান, পরদণ্ডেই গাত্রদাহ—কি এই বিচিত্র রঙ্গ! তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মাণ্ড-রঙ্গমঞ্চে এই বিশ্বনর্ত্তকীর অভিনয় কে বর্ণনা করিতে পারে?

কে এই মায়া? তিনি নৃত্য করেন কি নিমিত্ত?

"যিনি চিদাকাশ শিব তিনিই মহাকাল, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দনশক্তিই মায়া—মহাকালী। মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। পবন ও পবনস্পন্দ যেমন একই পদার্থ, উষ্ণতা ও অনল যেমন একই পদার্থ—সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দনশক্তি সর্ব্বদা এক। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয় সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা শিব নামক নির্গুণ শান্ত চিদাত্মাও লক্ষিত হন। ঐ চিন্মাত্র শান্ত শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা অপ্রমেয়মনসগোচর ব্রহ্ম বলেন। স্পন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছা। নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনিই সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্মে ইচ্ছা নাই সগুণে আছে। আবার ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্যনামে সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া প্রকৃতিনামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত, উৎপত্তি

প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নি জ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া শুষ্কা নাম ধারণ করেন। উৎপল বর্ণ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি চণ্ডিকা; একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া জয়া, সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধা; সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া। বলে ইঁহাকে কেহ আঁটিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম অপরাজিতা। ইঁহার মহিমা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম দুর্গা। প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি—এই জন্য ইহার নাম উমা (উ, ম, অ)। গায়ক অর্থাৎ জপকারীদিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া "ইঁহারই নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম সাবিত্রী। স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী। ইনিই সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে অকারাদিমাত্রা ত্রিতয়শূন্য শব্দ ব্রহ্মনামক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং হৃদয়পদ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহরনামক শিবের মস্তকের ভূষণ বিন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিয়াও ইনি উমা।

আর্য্যগণ ইঁহারই পূজা করিতেন। আর্য্যবংশধরগণ প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ ভাবে ইঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়া শরৎকালে ইঁহাকে দুর্গা ভাবিয়া এখনও পূজা করেন; অমাবস্যায় ইহাকে কালী ভাবিয়া পূজা করেন; অন্যান্য সময়ে অন্য মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা করেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি পূজা নিরর্থক পুতুলপূজা নহে। অজ্ঞানীরা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিমাপূজার নিন্দা করে। যাঁহারা একটু ভিতরে ঢুকিয়াছেন তাঁহারা অজ্ঞানীর শত চীৎকারেও এই রমণীয় পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইতে পারেন না। চিরদিন ইহা আছে; চিরদিনই ইহা থাকিবে। একটু সংযমী হইয়া—ছেলেখেলা করিতেছ না ভাবনা করিয়া একটু ভক্তিভাবে এই জগৎজননীর পূজা করিয়া দেখ দেখিবে ব্রহ্ম উপাসনার এত সহজ উপায় আর নাই হইতেও পারে না। তোমার ব্রহ্ম-উপাসনা বিশ্বাসের ধর্ম্ম আর এই পূজা বিশ্বাসের ধর্ম্মকে অনুভবসীমায় আনয়নের সুন্দর পন্থা!

শ্যামা।

শ্মশানে নাচ আঁধার মেখে
রাজার মেয়ে শ্যামা।
বিজলি হাসি খল খল
উজলে নাহি সীমা।
অন্ত নাই প্রান্ত নাই
একি মা মূরতি!
চিকুর ঘন কাদম্বিনী
আঁধিয়া জড়ে রাতি।
ঘোরা, ভীমা, ভৈরবী
জুড়ি' ভুবন সারা।
বক্ষে শত সন্ধ্যা বহে
শত যমুনা ধারা।
শত চন্দ্র সূরজ-কান্তি
স্থিত বদনে খেলে।
বিশ্ব ভোলা ভব তাই
চরণে পড়ে চলে'।
বন কুসুম তরু লতা
অর্ঘ্য হেন রাজে।
কবি বাঁশরি রিনি ঝিনি
নূপুর তাহে বাজে।

হ (বাটোর)

সন্ধ্যা।

অহরহঃ সন্ধ্যাম্ উপাসীত

ইহার অর্থ কি ?

অহরহঃ অর্থে অহঃ+অহঃ=প্রতিদিন ইহাই শব্দার্থ। কিন্তু ইহার লক্ষ্যার্থে 'সদা সর্ব্বদা'; ইহাই বুঝায় উপাসীত -(উপ্_+আস্+বিধিলাৎ)—বিধি লিঙে বিধি বা নিয়মবোধ জন্মায়। উপ—সমীপে আস্—অর্থে বসা—সমীপে বসা বক্তব্য।

কাহার ?

সন্ধ্যা - সম্+ধৈ+অল্—সম্যক্ প্রকার ধ্যান। সম্যক্ ধ্যান সদাসর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

ধ্যান কাহার ?

ধ্যেয় ভিন্ন ধ্যান নিরর্থক। যেমন পদার্থ দৃষ্টির বিষয়; পদার্থ ভিন্ন দর্শনের যোগ্যতা নাই—দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য নাই, তেমনি ধ্যেয় ভিন্ন ধ্যান নাই। তাই ধ্যান বলিলেই ধ্যেয়ের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। ধ্যেয়ই

ধ্যানকে আনিয়া দেয়। কিন্তু এখানে ধ্যেয় ও ধ্যান অভেদার্থক। ধ্যান ও ধ্যানসাধ্য ধ্যেয় উভয়ে জড়িত হইয়া ধ্যান শব্দের লক্ষ্যার্থ হইয়াছে। যেমন কোন পরিচিত ব্যক্তির বা পরিচিত দ্রব্যের নাম উল্লেখ না করিয়াই তৎসম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলেই সেই পরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তদ্রূপ এ-স্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। লক্ষ্য বলিলেই পূর্ব্ব-পরিচিত কোন ধ্যেয় পদার্থের বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই জন্য 'ধ্যান' করিবে এই কথাই বোধ উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট।

ধ্যান কি? ধ্যান সাধ্য ধ্যেয় ও ধ্যান একার্থ বোধক তখন ধ্যান কোন্ জিনিস?

সমস্ত চিত্তবৃত্তির বিলোপ সাধন করাই ধ্যান। চিত্ত এক সময়ে নানাবিধ তরঙ্গ তুলে, নানাবিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেয় এবং মানস রাজ্যে এক ঘোর আলোচন সৃষ্টি করে যে উপায়ে তাহার সংহার করিয়া স্থিরতা বা সাম্যভাব আনয়ন করা যায় তাহাই ধ্যান।

দেখা যায় একটু চুপ করিয়া বসিলেই কত কি মন চিন্তা করিয়া ফেলে ইহাই চিত্তের মলিনতা; মলিন চিত্তই এককালে বহুচিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের বহুমুখীন বৃত্তি সংহার করিয়া একমুখীন করাই ধ্যানের উদ্দেশ্য। একমুখীন অর্থে একাগ্র করাই ধ্যান। তাহা হইলেই হইল একাগ্রতাই ধ্যান। একাগ্রতাই যদি ধ্যান হয় তবে কোন বিষয়কে অগ্র করিয়া এক হইবে? সেই অগ্র বিষয়টাই কি ধ্যেয়?

হাঁ সত্য বলিয়াছ। সেই অগ্র বিষয়টী ধ্যেয়। বহু অগ্র হওয়াই বিক্ষেপ আর এক অগ্র হওয়াই ধ্যান। এখন দেখ এই একটী কি? যাহাকে লইয়া চিত্ত সাম্যভাবে অবস্থান করিবে সেই একটী কোন জাতীয় পদার্থ? ইহা কোন্ ধর্ম্ম বিশিষ্ট?

দেখ চিত্ত যখন বিষয় সংস্পর্শে বাস করে তখন ইহা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে বহুক্ষণ একদিকে অগ্র হইয়া থাকে না, অন্ততঃ কোন বিশেষ বিষয়ে একদিকে অগ্র হইলে ইহার বিষয় ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।

বিষয় ধর্ম্ম কি? বিষ্কিনোতি যন্ত্রাতি ইতি বিষয়—যাহাতে বদ্ধ করে তাহাই বিষয়; বন্ধন করে কে? বিষয়ের মধ্যে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহা বন্ধন করে? ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জনিত সুখ সাধন, তাহা হইলেই হইল

বিষয় সুখসাধন ধর্ম্মদ্বারা চিত্তকে বদ্ধ করে; এই বন্ধনের নাম আসক্তি; তবেই হইল আসক্তি ধর্ম্ম বিশিষ্ট কোন এক বিশেষ বিষয়ে চিত্ত কখনই বহুক্ষণ ধারণ করা যায় না; ইহা সকলেরই অনুভব যোগ্য। তাই বলা হইয়াছে বিষয় ধর্ম্ম লোপ না হইলে কোন পদার্থে চিত্তকে একাগ্র করা যায় না।

তাহা হইলেই হইল বিষয় আসক্তির নিদান নহে; বিষয়ের কোন বিশেষ ধর্ম্মই আসক্তির নিদান। বিষয়ে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যদ্দ্বারা চিত্ত ক্ষণপ্রভার মত কোন্ বিষয়ের রসাস্বাদন করিয়া বিষয়ান্তরে রসের লোভে ছুটিয়া যায়?

দেখ প্রত্যেক পদার্থের দুইটী করিয়া শরীর আছে একটী লক্ষ্য বা দর্শন যোগ্য অপরটী অদৃশ্য। যাহা লক্ষ্য বা ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই বাহ্য তাহাই স্থূল শরীর; যাহা ইন্দ্রিয়গোচরের অযোগ্য তাহাই অন্তর বা সূক্ষ্ম শরীর। যেমন তোমার শরীরের হস্ত পদ ইন্দ্রিয় আকার ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গোচর; কিন্তু মন, বুদ্ধি ইত্যাদি তদ্রূপ নহে; মন, বুদ্ধি কি দেখা যায়? মন, বুদ্ধি দেখা যায় না সত্য কিন্তু অনুমানে ইহার প্রত্যক্ষ হইতেছে; মন, বুদ্ধি, প্রাণ না থাকিলে এই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য সাধিকা শক্তি থাকে না; প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইহারাই প্রতি নিয়ত শক্তি যোগাইতেছে তাই এই দেহ জীবিত ও ক্রিয়াশীল নতুবা জড়; প্রাণ, মন, বুদ্ধি এইগুলি সূক্ষ্মশরীর আর এই দেহ স্থূল শরীর। সেই জন্য ইন্দ্রিয়ের অপর নাম বহিঃকরণ; আর মন ও বুদ্ধির নাম অন্তঃকরণ। সেরূপ প্রত্যেক পদার্থের বাহিরে যেমন দৃশ্যমান অবয়ব আছে তেমনি ভিতরে প্রাণ মন স্থানীয় অপর একটী সূক্ষ্ম বা অন্তঃশরীর আছে তাহাই এই বিষয়ের মূল। তোমার ইন্দ্রিয়ের সহিত এই বিষয়ের ইন্দ্রিয় স্থানীয় রূপ রস ঘ্রাণই ত আসক্তি জন্মায় আর এই রূপরস ঘ্রাণ ভুলিয়া যাও চিত্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ভুলিয়া যাইবে। ভুলিয়া স্থির হইবে। স্থির হইয়া দেখিবে সর্ব্বজীবে, সর্ব্বভূতে, জড়ে ও চেতনে অলক্ষ্যে থাকিয়া শক্তি বর্ত্তমান আছে, সেই শক্তিই আপন শক্তিতে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও বিভিন্নরূপে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। শক্তি অংশে সর্ব্বজীব এক; পার্থক্য, আকার গত। শক্তি জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র অব্যাহত ভাবে বেগ গতিতে এই বিশাল জগৎ চালন করিতেছে। সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণভূত এই শক্তি ওতঃ প্রোতভাবে বিরাজমান আছে এই শক্তি অংশে চিত্তকে ধারণা কর দেখিবে চিত্ত বিষয়ের বাহ্য অংশ ভুলিতেছে। একমুখীন হইতেছে। শক্তির

অসীমত্ব বিশালত্ব চিন্তা করিয়া চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও কি অপূর্ব্ব রস পাইতেছে। এই বিশালতা চিত্তের রসাস্বাদনকে শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহাও চিত্তের আসক্তির পদার্থ। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নাই। নিখিল জগৎপ্রসবিনী ত্রিলোকপালিনী সর্ব্ব জীবের সর্ব্বভূতের অন্তরবাসিনী শক্তই তোমার একাগ্রতার লক্ষ্য। তাহা হইলে দেখ ধ্যানই দোর আনিয়া দিল।

এই শক্তির উপাসনাই কি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা শক্তির উপাসনা। তবে কিছু বিশেষ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শক্তি অলক্ষ্য বা ইন্দ্রিয়াতীত; এই শক্তির কার্য্য দুই প্রকার। শক্তি, শক্তি অংশে এক হইয়াও কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। একের নাম প্রবৃত্তি অপরের নাম নিবৃত্তি; প্রবৃত্তি নিম্নমুখাভিগামিনী, নিবৃত্তি ঊর্দ্ধমুখাভিগামিনী। প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন প্রকৃতির অধীন হয়—তখন মনও স্থূল এই দৃশ্যাদর্শন-রাজ্যে আসিয়া পড়ে—আর যখন নিবৃত্তির অধীন হয় তখন মন ইন্দ্রিয় ও জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে বিচরণ করে। অধঃ অর্থে ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ; ঊর্দ্ধ অর্থে বিশাল বা অসীম। এই বিশালতাই বা অসীমতাই সুখের মূল। তাই এই নিবৃত্তিমার্গ গামিনী শক্তিই উপাসনীয়া অপরা নহে; অপরের উপাসনা ইন্দ্রিয় ও মন স্বভাবতঃই করে; স্বভাবতঃই মন ইন্দ্রিয়ও বিষয়ে গমন করে; এই স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার জন্যই নিবৃত্তিপথ-গামিনীর আশ্রয় গ্রহণ। এই নিবৃত্তিমার্গ-গামিনী শক্তিই "বরণীয়ভর্গ" বা গায়ত্রী। "বরণীয়ভর্গ"ই বিভিন্নরূপে বিভিন্নমূর্ত্তিতে বিরাজমানা ইনিই দশ-মহাবিদ্যা ইনিই চণ্ডী গীতা; ইনিই সতী, সাবিত্রী, রাধা, দুর্গা, ইত্যাদি মানুষিক দেহধারণ করিয়া লীলা করিয়াছেন এবং বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। তাই গায়ত্রী মূলতঃ শক্তির উপাসনা ইহার উপাসনায় সকলের উপাসনা হয়। স্বরূপে বরণীয়ভর্গ তটস্থে কালী, দুর্গা ইত্যাদিকে উপাসনা কর সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে। চিত্তে পরমানন্দ রসের অনুভব করিবে।

আচ্ছা গায়ত্রী কি তান্ত্রিক না বৈদিকমতোক্ত দেবী ?

বেদ ও তন্ত্রবিরোধী নহে; পরস্পরে বিশেষ একতা আছে। বেদ যাহা বলেন তন্ত্র সমস্বরে তাহাই বলেন তন্ত্র যাহা বলিয়াছেন বেদ তাহা খণ্ডন করেন নাই। উভয়েই জীবের কল্যাণার্থে প্রচারিত।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান বিভিন্ন; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে উভয়ই এক কথা বলিয়াছেন। উভয়েই জ্ঞান ও কর্ম্ম সমকালে অভ্যাসের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব, জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম বাতুলতার অনুষ্ঠান। তবে বৈদিক ও তান্ত্রিককর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের। গায়ত্রী যেমন একদিকে 'ছন্দসাং মাতঃ' বেদমাতা; তেমনি অপর দিকে 'গায়ত্রীতন্ত্রে' গায়ত্রীকে সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপা বলা হইয়াছে। ইনিই কুলকুণ্ডলিণী, ইনিই জীবচৈতন্য ইনিই দুর্গারূপে দশপ্রহরণধারিনী, মহাবিদ্যারূপে অশেষ কল্যাণবিধায়িনী।

এস আমরা সকলে মিলিয়া এই 'ছন্দসাং মাতঃ' 'সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী' মহাশক্তির শরণাপন্ন হই তাহা হইলে আমরা কখন মন বাক্য ইন্দ্রিয় দ্বারা বিপথে যাইব না। প্রতিদিনে তিনবেলায় সানন্দে অহরহঃ ইহাকে আত্মনিবেদন করি বিশেষ উপলক্ষে দুর্গা, বাসন্তী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা ইত্যাকার বিভিন্নমূর্ত্তিতে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া কৃতার্থ হইয়া যাই। ইহাতে আত্মহিতসাধন হইবে আত্মহিতকারীই পরোপকারে সমর্থ। তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা দেশের হিত হইবে। এই উপাসনায় আমরা মনে প্রাণে কর্ম্মে, ধর্ম্মে, এক হইব। এই উপায়ে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমশান্তি লাভ করিবে।

নিত্য ধ্যানের বিষয়—

আত্মস্বরূপ চিন্তাই উপাসনা। উপাসনার উদ্দেশ্য স্বরূপে যাওয়া।

আচ্ছা, স্বরূপের চিন্তা করিব কিরূপে?

কেন, তুমি নিত্য যে কাজ কর, তাহার মধ্যেই স্বরূপ চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। আর্য্যঋষিগণ যেমন বেদ, বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদ্ ইত্যাদি গ্রন্থাদি রচনা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন—তেমনি আবার সেই জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবার জন্য সহজভাবে সাধারণের বোধের অনুরূপ —সন্ধ্যা, গায়ত্রী ইত্যাদি নিত্যক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা, গায়ত্রী—অল্প ও সংক্ষেপ; সহজ ভাবে বুঝিলে সহজ অর্থ; কিন্তু ইহার তত্ত্ব অতি গভীর, এবং এই অল্পাক্ষর মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত তত্ত্বের সন্নিবেশ রহিয়াছে। এক গায়ত্রীর অর্থ ই যথেষ্ট।

আমি বুঝিতেছি না, আপনি বুঝাইয়া দেন।

দেখ, সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এই তিনটী চিন্তার প্রধান জিনিস। সাংসারিক

জীবের দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই চিন্তায় সত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মই এক মাত্র সৎআশ্রয় আর সমস্তই অসৎ; এই সত্যস্বরূপের সৃষ্টি সঙ্কল্পেই সৃষ্টি, স্থিতি সঙ্কল্পে স্থিতি এবং লয়সঙ্কল্পে লয়। সত্যস্বরূপের এই তিনটী গুণময় অসংমূর্ত্তি। এই গুণময়মূর্ত্তি তিনটী সগুণ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। প্রাণায়ামে এই কথাটী আছে। এই তিন দেবতার ধ্যান দ্বারা জগতের এই ত্রিবিধ অবস্থা চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া লও; এবং অন্যান্য চিন্তা বাদ দিয়া এই চিন্তা মননের বিষয় কর। তাহা হইলে মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা স্থান পাইবে না। এই চিন্তা দ্বারা যখন চিত্তের সাম্যভাব আসিবে, তখন পরমতত্ত্বের চিন্তায় অবসর হইবে। ইহাই প্রথম ধ্যানের বিষয়।

যেই চিত্ত, বালকের উচ্ছৃঙ্খলক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিষ হইতে মুক্ত হইল তখনই "অঘমর্ষণ মন্ত্র" চিন্তা কর। ইহাই স্বরূপ হইতে কিরূপে বিকৃতি হইল; কিরূপে স্বরূপের অছন্দ স্পন্দনে জগৎ উৎপন্ন হইল; এই সমুদ্র, দিবারাত্রি, কাল, পৃথিবী নভোমণ্ডল, যাহা আমাদের ব্যবহারিক জগতের জননী—এই চিন্তাই সমতাভাব প্রাপ্ত চিত্তের দ্বিতীয় চিন্তা। ইহার দ্বারা চিত্ত আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার পন্থা পাইবে। সৃষ্টির প্রণালী জানিয়া তাহার বিপরীত পথে স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার উপায় নির্দ্দেশ কর। তাহা হইলে চিন্তায় দুইটী জিনিস পাইলে।

১ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়—

ত্রিবিধ গুণ বৈষম্যের প্রধান কার্য্য।

২। সৃষ্টি স্বরূপ ও স্বরূপের বিকৃতি।

এই দুইটীই সগুণব্রহ্মের উপাসনা।

তৃতীয়—সবিতা প্রসবকর্ত্তা শুদ্ধ তেজঃস্বরূপ সবিতাই এই বৈতময় জগৎব্যাপারের অধিষ্ঠাতা। ইনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অন্তর্যামী চৈতন্য; ইনিই সূক্ষ্মতেজঃরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন ইনি স্থূলরূপে বিশ্বকে আলোক ও তাপদান করিয়া সমস্ত লোককে পালন করিতেছেন ইনি অশেষ কল্যাণপ্রদ মঙ্গলমূর্ত্তি সেইজন্য সকল দেবতাকেই ইহার অন্তর্যামী মনে করিয়া ধ্যান করা হয়। এই সৌরমণ্ডলই স্থূল সাকার দেবতার আসন; এই জগতে ইনিই সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ।

অতএব যে দুইটি চিন্তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা এই স্থূল সবিতা ও অন্তর্যামী তেজস্বরূপ সবিতার মধ্যবর্ত্তী মনে করিয়া ধ্যান করিবে।

চতুর্থ—গায়ত্রী উপাসনা।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয় এবং শেষোক্ত বিষয়টির জন্য অন্তর্জীবের বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তিকে এই শাস্ত্রীয়মার্গ দ্বারা পরমতত্ত্বস্বরূপ গায়ত্রীতত্ত্বে নিবেশ করিতে হইবে; ইহাই এই সন্ধ্যার সঙ্কেত।

গায়ত্রীদেবী সৃষ্টিস্থিতি লয়শক্তির জননীস্বরূপ। গায়ত্রী প্রকৃতির সাম্যমূর্ত্তি; এই পরমাপ্রকৃতির পরেই পরমপুরুষ। পরমপুরুষের অঙ্গবিলাসিনী শক্তিই এই গায়ত্রী; প্রকৃতির শক্তি দ্বারা মুহ্যমান জীবের এই প্রকৃতির উপাসনাই প্রথম প্রয়োজন; যখন গায়ত্র্যা ধ্যান দ্বারা চিত্ত সম্যক শান্তভাব লাভ করে তখন পরমতত্ত্ব আপনিই হৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ করে। এই পরমব্রহ্ম-বোধক পদার্থ প্রণব। এই প্রণব সমস্ত মন্ত্রের মূল বা বীজ এই প্রণব অগ্রে উচ্চারণের বিধান এই জন্য। উদ্দেশ্য ও উপায় একত্র সন্নিবেশ ইহাই শাস্ত্রের কৌশল। জীব যেন উদ্দেশ্যের অন্বেষণে আসিয়া উপায়ের মধ্যেই আপনাকে না হারাইয়া ফেলে তজ্জন্য সর্ব্বত্রই এই ওঁকার বিরাজমান। তাহা হইলেই পাইলে—

১ম। সগুণ দেবগণ।

২য়। স্বরূপ ও বিকৃতি।

৩য়। অন্তর্যামী সবিতা।

৪র্থ। পরমব্রহ্ম প্রতীক গায়ত্রীতত্ত্ব।

প্রভাতে—মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় এই উপাসনাব্রতী হও নিশ্চয়ই পথ পাইবে।

আঃ (মালদহ)

গায়ত্রী।

গান আর ত্রাণ এই দুইটি কথা তোমাতে পাই। গান কেন ভাল বাসে? জগতে কেন গান গায়? বা গাহিতে চায়? গান ছন্দময় শব্দ। সকল গান শব্দ বটে কিন্তু সকল শব্দ গান নহে। ছন্দময় শব্দই গান।

যে গান গায় তারে তুমি ত্রাণ কর, এই জন্য তুমি গায়ত্রী। কোন্ গান? কোন্ গানটি গাইলে তুমি ত্রাণ কর? সেই গানটিই তুমি নও যে সে গানটি গায় তারে তুমি ত্রাণ কর।

কেন এ গানের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? গান গাইলে আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দই তোমায় স্পর্শ করিতে পারে। আনন্দই যেন তোমার সমান বস্তু। সমান না হইলে মিশিতে পারা যায় না। সমান না হইলে মিলন হয় না।

সংগীতের আনন্দ তোমার সমান পদার্থ। সংগীতের আনন্দ চয় সুরে আর ভাবে। যাহারা ভাব বুঝিতে নাও পারে তাহারাও মিষ্টস্বরে আনন্দ পায়। আবার সুরের মধ্যে যাহারা ঢুকিতে পারে না, যাহারা তান লয়মান নাও বুঝে তাহারা কণ্ঠস্বরে আনন্দ পায় বা গানের ভাবে আনন্দ পায়। এমন কি সুর ঠিকমত না হইলেও ভাবযুক্ত হইলে, গায়কের ভাব থাকিলেও গান মিষ্ট লাগে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ তার হয় যার সুর, তান, মান লয় ভাব সকলগুলি অনুভব হয়। না জানি কতই আনন্দ তাহার হয়।

সুর ত আঁকা যায় না। সুরের কথা বলা হইবে কিরূপে? এই গানের অক্ষর ২৪টি। আর ইহাতে তিনটি পদ ৮ অক্ষর করিয়া। এই তিনটি পদ পুনঃ পুনঃ ছন্দমত উচ্চারণ করিলেই এই গান হয়। এই ত্রিপদার আদিতে ও অন্তেও ঘনীভূত স্বর সমষ্টি বা সুর সমষ্টি বা শব্দ সমষ্টি একটি—এবং তাহার যে বিশ্বব্যাপী স্বর-লহরী, যে লহরীতে জগৎ ভরিয়া যায়, সেই বিশ্বব্যাপীর কথা তাহার পরে।

এখন সুর বাদ দিয়া শুধু ভাবের কথা একটু বলিব।

যে মহা সঙ্গীতে জগতের ত্রাণ হয় সেই শ্রবণ মন রসায়ন কথা মধুর করিয়া কিরূপে বলি? গান গাহিতে না জানিয়া শুধু কথায় বলিলে কি তোমার ভাল লাগিবে? তোমার কাছে কি পৌঁছিবে? যদি পাখীর মত কলধ্বনি হয়, যদি অব্যক্ত মধুর ধ্বনি ব্যক্তভাবে শ্রবণে প্রবেশ করে, সে সঙ্গীত ঘন হইয়া স্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে যাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, পশিয়া প্রাণ আকুল করে। না জানি কতেক মধু ঐ নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলগো কেমনে পাইব সই তারে—যদি রসের কথায় রসভঙ্গ না হয়, যদি ছন্দের বিষয়ে ছন্দভঙ্গ না হয় তবেই সুন্দর হয় তবেই ত মধুর হয় তবেই সে ভাব মিলিত স্বরলহরী—সঙ্গীত রাণী তুমি

তোমার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবেই ত সে আকুল সঙ্গীত, সঙ্গীত—মাতৃকার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু ইহা কিরূপে হইবে? রসসম্বন্ধ-পিণী সরস্বতী সরস্বতী তুমি। তুমি জিহ্বাগ্রে না বসিলে কে কবে ভাবের কথা ভাবে বলিতে পারে? কে কবে মধুর ভাবকে মধুর ভাষায় মিলাইতে পারে?

ঐঁকার পঞ্জর শুকি; উপনিষদ উদ্যানকেলীকলকণ্ঠি বীণাস্বাদন উল্লাসপরা সঙ্গীত মাতৃকা—তোমায় বন্দনা করি! তুমি এই বিশ্বসঙ্গীতের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া দাও—তুমি এই গান নিজে গান করিয়া কেমন করিয়া জাগ হয় বুঝাইয়া দাও।

২

আদিতেও প্রণব অন্তেও তাই। মধুময় অমৃতময় ওঙ্কার ঝঙ্কার উঠিতেছে, উঠিয়া বিস্তৃত হইতেছে, দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছে, করিয়া আবার সেই ঝঙ্কার ওঙ্কারে মিশিতেছে। গুঞ্জনময় মধুময় মধুর গুঞ্জন তুলিয়া চারিদিক আপ্যায়িত করিয়া আপনাতে আবার সেই গুঞ্জন টানিয়া লইতেছে। সুন্দর বীণা ত্রিতন্ত্রীতে নাচিয়া নাচিয়া সঙ্গীত উদ্গীরণ করিয়া তন্ত্রীবদ্ধ বীণায় মিশিয়া রহিতেছে। মধুর প্রভাতে সূর্য্যরশ্মি জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যেই পশিতেছে। বিশ্বনর্ত্তকী বিশুদ্ধ তালমানে নৃত্য করিয়া, নৃত্য জড়িত সুখ সঙ্গীতে পৃথিবী আকাশ পরিপূরিত করিয়া, আপন নৃত্য-গীত আপনাতে গুটাইয়া, আপন কমনীয় অঙ্গ ঈষৎ আপনমনে কাহাকে যেন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আবার স্থির হইয়া আপন ভাবে দাঁড়াইতেছে। সৃষ্টি উঠিয়া স্থিতি লাভ করিয়া আবার লয় হইতেছে। প্রণবে সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখাইতেছে। শুধু সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যাপারটি মাত্র নহে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আছেন। প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে; কর্ম্ম ও কর্ত্তা এক সঙ্গে। সৃষ্টি কর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টি কর্ম্ম।

সৃষ্টাদির কর্ত্তা কে? যিনি সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করেন। যিনি কর্ম্ম করেন তিনি কর্ত্তা। পাছে ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তাকে দেখা না হয় তাই কর্ত্তা সর্ব্বদাই ক্রিয়া সঙ্গে। শুধু সৃষ্টি নহে স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত। প্রণবের এই ভাবের মূর্ত্তি, সমষ্টি ভাবে এই অপূর্ব্ব জগৎ আর ব্যষ্টি ভাবের মূর্ত্তি রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংশ দেবাদি-দেবের বক্ষে মেঘশ্যামা গলিতচিকুরা ব্রহ্মাণ্ডকোটিমুণ্ডাভিরামা বরাভয়প্রদা গিরিবালিকা। কোথাও বা নবীন জলধরমণ্ডিত তড়িৎলতিকা, দুই এক।

প্রণবটি আকারে এই সমষ্টি বিশ্বরূপ এবং ব্যষ্টি ইষ্টদেবতা. কিন্তু ভাবে ইহা সীমাশূন্য. কোন আকার নাই, কোন মূর্ত্তি নাই। পাছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকার দেখিয়া সীমাশূন্য ভাবটি ছাড়িয়া যায় সেই জন্য ভাষার যতদূর সামর্থ্য তাহাতে বলা হইতেছে ইহাই মহাব্যাহৃতি—এই প্রণবই ভূর্ভুবস্বা এই মহাব্যাহৃতিই সপ্তব্যাহৃতি. ইহাই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে!

এই জল-স্থল, তরু-লতা. পশু-পক্ষী, পর্ব্বত, সমুদ্র যাহার উপরে তাহাই ভূলোক পৃথিবীমণ্ডল। ইহার উপরে একটা অবকাশ-যাহাকে আমরা আকাশ বলি যাহা এই পৃথিবীর মত কত সৌরজগত ধারণ করিয়া আছে। এই আকাশ, এই অন্তরীক্ষই ভুবলোক। ইহার উপরে দেবতাদিগের রাজ্য স্বর্গ। তাহার উপরে আবার আমাদের দৃশ্য অবকাশ অপেক্ষা আর এক বৃহৎ অবকাশ ইহাই মহ লোক। ইহার উপরে জনলোক। এই লোকে মহাপ্রলয়ের পর সমস্ত সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে, উঠিয়া স্বর্লোক. ভুবলোক ও ভূলোক ব্যাপিয়া পড়ে। ইহার উপরে তপোলোক—যে লোকে নিত্য সন্ন্যাসী চিরব্রহ্মচারী সনক সনন্দ সনাতনাদি তপস্যা করেন। ইহার উপরে সত্যলোক যেখানে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমপুরুষ সর্ব্বদা আপন ভাবে অবস্থান করিতেছেন যাঁহাকে সেই বিশ্ববাসী পরম পদ বলে। শরীরের মধ্যে ষট্‌চক্রের উপর সহস্রার সপ্তব্যাহৃতির প্রতিকৃতি।

কে এই প্রণব? ইনিই মহাব্যাহৃতি। ইহার পরেই ত্রিপদা গায়ত্রী। "ছন্দসাংমাতঃ"

ছন্দ তাহার নাম যাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিলে সবই অসচ্ছন্দ হইয়া যায়, সমস্তই রোগরূপে পরিণত হয় কিছুই আর সুস্থ থাকে না, স্বচ্ছন্দে থাকে না।

গায়ত্রীর অক্ষরগুলির একটিও যদি যথাস্থান চ্যুত হয় তবে আর ইঁহার গানে ত্রাণ হয় হয় না। কাজেই যেমন বর্ণ বিন্যাস আছে সেইরূপ অর্থই হইবে।

গায়ত্রী কে? সেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তার বরণীয় ভর্গ—উপাসনীয় শক্তি। "তৎ" এই জন্য তত্ত।

শুধু শক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে পাছে শক্তিমানে দৃষ্টি না পড়ে—শুধু জগতের ব্যাপারে দৃষ্টি দিলে পাছে জগৎ কর্ত্তাকে ভুল হয় সেই জন্য সেই প্রসবিতার শক্তি বলা হইয়াছে।

এই ভর্গের, এই শক্তির স্থূল অংশটির ধ্যান করা হইবে না, শক্তির ইন্দ্রিয়

গ্রাহ্য ব্যক্ত ব্যাপারটি ধ্যানের বস্তু নহে, কিন্তু বরণীয় ভর্গটি ধ্যেয় বস্তু। শক্তির যে অন্তর্ভাগটি সেই সবিতার দিকে ছুটিয়াছে, সূর্য্যের যে রশ্মিগুলি বাহিরের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ প্রকাশ করে, ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে প্রেরণ করে, বিষয়কে প্রকাশ করে, তাহা ইহার বরণীয়ভর্গ নহে। যে শক্তি কল্যাণ পথে, ঊর্দ্ধপথে প্রধাবিত হইয়া পরম পদকে প্রকাশ করে তাহাই উপসনার বস্তু।

ভর্গই মহাশক্তি। ইহা একদিকে দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকাশ করে। ইহা পাপ পথ। আবার অন্যদিকে এই ভর্গ ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী। ইহা বিষয়াতীত পরম পদের দিকে প্রবাহিত। ইহা ইহার কল্যাণ পথ। আপ, জ্যোতি, রস, প্রাণ বা অমৃত সকলের ভিতরে রহিয়া ইহা ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপ্ত ওঁকার। ভর্গ একমূর্ত্তিতে ঘোরা রজস্তম ভাবে দৃশ্যপ্রপঞ্চে প্রকট অন্যভাবে অঘোরা শান্ত সত্বভাবে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত।

লতিকা বৃক্ষকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছে। স্থূল দৃশ্যটি বিষয় কিন্তু ইহাতে শক্তি শক্তিমানের দিকে ছুটতেছে এই ভাবটি সাত্বিক। দৃশ্য-প্রপঞ্চের সর্ব্বত্রই একটি মহাশক্তি স্থূলে দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হইয়াও সূক্ষ্মে আপনি শক্তিমানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বীজগত শক্তি বৃক্ষরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইয়াও নিঃশেষ হইতেছে না। আর কিছু যেন করিতেছে। প্রস্তর খণ্ডে শক্তি প্রয়োগ করিলে প্রস্তর দৌড়িয়া যায় পরে শক্তি ফুরাইলে থামিয়া যায়। বীজ গত শক্তি সে ভাবে থামিয়া যায় না। বৃক্ষ ফল ফুলে পরিণত হইয়া, আবার কিছুদিন জগৎ প্রপঞ্চে স্থিতি লাভ করে, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মে আবার বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মাইয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া শেষে মহাপ্রলয়ে কোন্ শক্তিমানে লয় হইয়া যায়।

শক্তির বাহিরের প্রকাশমান প্রবাহটি পরিত্যাজ্য কিন্তু ভিতরের প্রবাহমান প্রবাহটি উপাসনীয়।

সেই সবিতার বরণীয় ভর্গ বলিয়া পাছে ভর্গ বা শক্তি মাত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া যায় তাই ভর্গ বলিয়াই বলিতেছেন দেবস্য। আদিতে তস্য সবিতুঃ অন্তে দেবস্য। শুধু শক্তিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না। দেবস্যটি, লক্ষ্য করিতে হইবে। দেবের শক্তি—শক্তি জড়িত শক্তিমানটিকে ধ্যান করি। শুধু দেবতাটি চিন্তার বিষয় নহেন—পায়া যায় না তাই। যত্র বেদাঃ বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি। শুধু ব্রহ্ম—যখন শক্তির সহিত

যুক্ত নহেন তিনি আপনি আপনি। তখন সৃষ্টি নাই। অন্য কিছুই নাই। কে কাহার উপাসনা করিবে? তাই শক্তি জড়িত শক্তিমানই উপাসনার বস্তু। তাই সবিতুর্দেবস্য বরেণ্যংভর্গঃই উপাসনার বস্তু। এই বরণীয় ভর্গকে ধ্যান করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

হিমালয় ভ্রমণ। পরিব্রাজক শ্রীগুণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থান এ, এল বোস এণ্ড কোং। ৭৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ বড় বাজার পোষ্ট আফিস। কলিকাতা। যাঁহারা হিন্দুর প্রধান তীর্থ বদরিনারায়ণ, কেদার, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দর্শনে গমন করিবেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শক। তীর্থযাত্রার সংবাদ এখানিতে আছে। ঠিক হিন্দুভাবে লেখা এরূপ পুস্তক আর একখানিও আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই পুস্তকখানি লিখিয়া তীর্থযাত্রীর একটি অভাব দূর করিয়াছেন। তীর্থ-যাত্রী মাত্রকেই আমরা এই পুস্তকের এক একখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ১ম ও ২য় ভাগ। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান লোটাস লাইব্রেরী ২৮।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বাবু বঙ্গসাহিত্যে এক জন প্রধান লেখক ছিলেন। এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধেই বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কি, কিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম, তত্ত্বমসী, বেদ সম্বন্ধে কথা, প্রকৃতি, নিরামিষ ভোজন, ভালবাসা, সতীতেজ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাশীল গ্রন্থকার ধর্ম্ম ও সমাজের জটিল প্রশ্ন সমূহ সহজ করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মটি কি বুঝাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে এক জন কর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান শূন্য কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন না এবং কর্ম্মশূন্য জ্ঞানকেও আদর করিতেন

না পুস্তকের সর্ব্বত্রই আমরা তাহার আভাস পাই। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে।

৺কৃষ্ণধন বাবু শুধু নির্গুণ ব্রহ্ম মানিতেন। এই জন্য সগুণ ব্রহ্ম ও অবতার বাদের কথা তাঁহার নিকটে কল্পনারূপে দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রে দেখি ব্রহ্মের রূপ মানুষে কল্পনা করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন মায়াই ব্রহ্মে ঈশ্বর ও জীব ভাব কল্পনা করে। শ্রুতি মতে এবং যুক্তিতেও নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম ও অবতার ইহার কোন একটি অবিশ্বাস করিলে আর্য্যঋষিদিগের অভিপ্রায় বুঝা যাইবে না। এই একটি বিষয় ভিন্ন এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই অমূল্য রত্ন ছড়ান আছে। শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই পুস্তকের ভূমিকায় ৺কৃষ্ণধন বাবুর ধর্ম্ম পিপাসা, ৺কৃষ্ণধন বাবুর অন্তর্দৃষ্টি, ৺কৃষ্ণধন বাবুর সাধনা ও আন্তরিকতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞান পিপাসুর নিকট পুস্তক খানি বিশেষ আদরের ইহা বলাই বাহুল্য। মূল্য ২৲ টাকা।

ব্রহ্মবিদ্যা।—এখানি একখানি মাসিক পত্রিকা। মূল্য বার্ষিক ২৲ টাকা। রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এমএ, বিএল, এই পত্রিকার সম্পাদক। উপযুক্ত সম্পাদক মহাশয় দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকা যে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা গত বৈশাখ হইতে ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত পাঁচ সংখ্যা পাইয়াছি। সকল সংখ্যাতেই জ্ঞান ও ভক্তির প্রবন্ধে এই পত্রিকা বিশেষ পাঠ্য। এইরূপ মাসিক যত অধিক বাহির হইবে ততই মঙ্গল। আমাদের প্রার্থনাঃ—এই সাধনাহীন দেশে জ্ঞানের অবস্থা বা ভক্তির অবস্থা বলিয়া যাহাতে সেইরূপ অবস্থা লাভ করা যায় তাহার সাধনার আলোচনা আজ কাল কার দিনে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পন্থা।—(নবপর্য্যায়) মূল্য ১৷৷০ এই প্রাচীন পত্রিকা আবার নূতন ভাবে বাহির হইতেছে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএল, শ্রীযুক্ত বারানসী মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএল, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ—ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। বলা বাহুল্য এই পত্রিকা খানি ও সুন্দর রূপে পরিচালিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত, হর গৌরী, মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা, দীক্ষা, অদ্বৈত বাদ, তীর্থদর্শন, রথ যাত্র, নির্গুণ ভক্তি, বৃন্দাবন লীলা প্রভৃতি প্রবন্ধে এই পত্রিকা সুশোভিত।

বহু প্রবন্ধই সুখপাঠ্য এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাতে পূর্ণ। এইরূপ মাসিক পত্র দ্বারা যে সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে নানা কারণে আমরা পুস্তক ও সংবাদ পত্র গুলি মনোমত করিয়া সমালোচনা করিতে পারিলাম না। বারান্তরে সংবাদ পত্রের সমালোচনা বিশেষরূপে করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তাম্বল ব্রাহ্মণ।

প্রস্তাবনা।

রামোনাম বভূব হঁ তদবলাসীতেতি হঁ তৌ পিতুঃ
বাচা দত্তকাননে নিবসত স্তামাহবদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণেনেতি পুরাতনীং নিজকথা মাকর্ণ্যমাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক্ষণমুর্ধ্বমু ধুঁমুরিতি প্রোক্তাগিরঃ পান্তবঃ॥

গোপাল বড় চঞ্চল, বড় অশান্ত। গোপালের জন্ত সমগ্র বৃন্দাবন অস্থির-ব্রজবাসিগণ কেহ ভয়ে কেহ ভালবাসায় সর্ব্বদা ব্রজরাজ শিশুর চিন্তায় ব্যস্ত। যশোমতী? আর আহার নাই নিদ্রা নাই অন্ত গৃহকার্য্য করিবার উপায় নাই যশোদা সর্ব্বদাই কৃষ্ণগত প্রাণা কৃষ্ণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে প্রণিহিতনয়না, জননী একটু অন্তমনস্ক হইলেই শিশু অনর্থ করিয়া বসে।

কিন্তু আজ গোপাল বড় শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জননী বলিয়াছেন বাবা, আজ তুমি দৌরাত্ম্য করিও না আমি তোমাকে অতি মধুর পুরাণকথা বলিব, গোপাল উপকথা শুনিবার লোভে শান্ত হইয়াছে মার কোলে বসিয়া শতসাধমাখা মায়ের চখের উপরে কমলদলতুল্য আপন লোচনদ্বয় স্থাপন করিয়া সময় অপেক্ষা করিতেছে যশোদা বলিতে আরম্ভ করিলেন কোমল করপল্লবে গোপালের কুসুম সুকুমার সুঅঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে যশোদা স্নেহময় বচনে বলিলেন—"বাছা গোপাল, শোন—

যশোদা] রাম নামে এক রাজপুত্র ছিলেন।

গোপাল] হুঁ।

যশোদা] তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল সীতা।

গোপাল] হুঁ

যশোদা] তাঁহারা উভয়ে পিতার আজ্ঞায় দণ্ডকাননে নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করিতেছিলেন এই অবস্থায় দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করে।

শিশু এতক্ষণ আনন্দ-মুকুলিত নয়নে জননীর কথায় হুঁ দিতে দিতে অপূর্ব্ব রামলীলা শুনিতেছিলেন, কিন্তু সহসা শিশুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল 'দুরাত্মা রাবণ সীতাহরণ করিল' এই কথা শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই দণ্ডকারণ্যবাস প্রিয় সহচরী আদরিণী সীতা, সেই জানকীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, সীতাহরণ, রাবণের দৌরাত্ম্য. যুগপৎ দণ্ডকাবাসের চিত্র গোপাল-হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে মাতৃক্রোড় হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরিধানে পীতাম্বর আপন অঞ্চলের সহিত মাথার চূড়া ময়ূরপুচ্ছের সহিত যশোদা আপন হৃদয়ের সহিত কম্পিত হইলেন। ব্রজশিশু সহসা বলিয়া উঠিলেন কই লক্ষ্মণ ধনু কই ধনু কই শাঙ্গ ধনু দাও ধনু দাও।

বৎস! সীতার এই দুরবস্থার স্মৃতি ও তৎসহচরী ভগবানের এই বাণী তোমাদিগের রক্ষার কারণ হউক।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! এ চিত্র বড় মধুর, তদপেক্ষাও মধুর ভগবানের হৃদয়ে মাধুর্য্যের নিকটে ঐশ্বর্য্যের পরাজয়। ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর, মায়া তাঁহার চরণাশ্রিতা সেবিকা. ভগবান্ বৈকুণ্ঠের জ্ঞানশক্তি অকুণ্ঠীত তথায় ভ্রম সম্ভবে না, তথাপি ভগবান্ আদরিণীর মান বাড়াইতে ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া মাধুর্য্যের মাধুরী প্রদর্শন করিলেন, প্রাণাধিকা সীতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করিতে যাইয়া নিত্য প্রকাশময় বিমল ঐশ্বর্য্যকে আত্মবিস্মৃতি দ্বারা যেন কলঙ্কিত করিলেন। এ উদাহরণ বড় মধুর। কিন্তু এখানে উহা বলিলেন কেন? এখন ত উপনিষদ্ বলিবেন সঙ্কল্প ছিল।

আচার্য্য] বৎস উপনিষদ্ই বলিব, কিন্তু বিদ্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ আবশ্যক। কেন না বিনা পাপক্ষালনে হৃদয়ে বিদ্যাপ্রতিভাত হয় না ভগবানের এই মধুর রূপস্মরণাত্মক মঙ্গলাচরণে হৃদয়সংবত ও প্রক্ষালিত হইয়া বিদ্যাধারণার উপযুক্ত হয় এই জন্য পরমবিদ্যার প্রারম্ভে এই চিত্র তোমার শুশ্রূষু হৃদয় সমীপে অঙ্কিত হইল।

এতদ্ভিন্ন এই চিত্র তোমার নিকটে অঙ্কিত করিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই:—

তুমিও আপনাকে জগজ্জননী উপনীষদ্‌দেবীর ক্রোড়শায়ী শিশু মনে কর, তাঁহার শ্রীমুখে স্বীয় মধুর পুরাণ কথা শ্রবণ করিবার লোভে শান্ত হও আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হও তুমি যে মায়াকল্পিত সংসারমৃগতৃষ্ণায় আত্মবিদ্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছ, এবং কামরূপী রাবণ যে তোমার আত্ম-বিদ্যা অপহরণ করিতেছে তুমি যে পথের কাঙ্গাল হইয়া কতকাল কাটাইয়াছ শ্রুতিমুখে জীবের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিতে শুনিতে তোমার চিত্তেও প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত হউক, তুমি কামরূপী রাবণের বিনাশে বদ্ধপরিকর হও, এবং প্রণবধনুর অনুসন্ধানে প্রণিহিত হও।

ব্রহ্ম] গুরুদেব! এ আবার কোন্ মধুর অবস্থার কথা আমাকে বলিতে-ছেন। আমি অজ্ঞান তিমিরে জন্মান্ধ, আপনি এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যের চিত্র আমার নিকট আনয়ন করিতেছেন, মহারাজ দুষ্মন্ত অভিসম্পাতবলে অপগত স্মৃতি হইয়া মহর্ষি লালিত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার পর হংসবতীর বর্ণ-পরিচয়কালীন গীতিকা শ্রবণে যেমন কাহারও জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন আমার অন্তরাত্মাও যেন ঠিক তদ্রূপ কাহারও জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে আপনি যে আত্ম-বিদ্যার কথা বলিলেন কে ইনি আমি জানি না কেমন এই অনবদ্যাঙ্গী আমি জন্মান্ধ কখনও দেখি নাই কিন্তু আপনার প্রদর্শিত এই অস্ফুট সুখস্বপ্নে আমার অন্তরাত্মা বড়ই আকুল হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞান লাভে রাজর্ষি দুষ্মন্তের পুনরায় স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ভগবান্ কোন্ অভিজ্ঞান লাভে আমার হৃদয়ে স্মৃতিলাভ ঘটিবে? আমি কি পুনরায় হারানিধির দর্শন লাভ করিতে পারিব?

আচার্য্য] বৎস! উপনিষদ্ বিদ্যাই আত্ম বিদ্যা-লাভের অভিজ্ঞান অঙ্গুলি মুদ্রা। এই বিদ্যা অধিগত হইলেই তোমার চিত্ত অভিজ্ঞান প্রাপ্ত দুষ্মন্তের ন্যায় স্মৃতির মুর্ম্মর দহনে দগ্ধ ও বীত মল হইয়া জ্ঞান প্রসাদ বা পর বৈরগ্য লাভ করিবে, এবং এই ইহারই পরে স্বর্গাগত মাতলির ন্যায় ব্রহ্ম লোকাগত অমানব পুরুষ তোমার আত্ম-বিদ্যার সহিত চির মিলিত করিয়া দিবেন।

ব্রহ্ম] ভগবান্ আমি যে বড়ই অপরাধী আমি কর্ম্ম চণ্ডাল, আমার কি এই উপনিষদ্ বিদ্যা শ্রবণে অধিকার আছে?

আচার্য্য] যাঁহার চিত্ত বেদাদি অধ্যয়ন, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বীতমল হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মই নিত্য তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য পরোক্ষ ভাবে ইহার বিবেক লাভ করিয়াছে, এবং যাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত বনিতাদি

ক্রমশঃ

উৎসব

আত্মারামায় নমঃ।

অস্থৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

নিত্য অভ্যাস ও শুভ কথা।

উত্থানে—প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সৎচিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎস্বপ্নজাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥ শ্রীশঙ্করঃ

প্রভাতে হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ স্মরণ করি। এই আত্মতত্ত্বই সৎচিৎ আনন্দ। ইহাই তুরীয় ব্রহ্ম। ইনিই পরমহংসদিগের গতিস্বরূপ। ইনিই প্রত্যহ স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি অবস্থায় যাথা যাথা করেন। এই কলাতীত—অংশ-শূন্য ব্রহ্মই আমি। আমি ভূতসমষ্টি নহি। [আত্মতত্ত্বই ব্রহ্ম। ইহাই শক্তি শক্তিমান্—হরপার্ব্বতী, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব] ইহার স্মরণ ও অনুভবেই মানুষের মুক্তি।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ বেদ। কেন উপনিষদ্ ॥

সেই আত্মতত্ত্ব ব্রহ্ম শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের

প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। ইহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে, ধীরগণ বিষয়াভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোক হইতে গমন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন॥

যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশবিনা কল্পকোটিভি স্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ বেদ॥ ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্॥

জন্মান্ধ ব্যক্তির রূপজ্ঞান যেমন হয় না, সেইরূপ গুরূপদেশ ভিন্ন কোটি-কল্পেও তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ শ্রীভাগবত

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র বায়ু অনুপম স্তব দ্বারা যাঁহাকে মহামহিমান্বিত বলেন, সামগানকারী ঋষিগণ অঙ্গপদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদে যাঁহাকে গান করেন, যোগিগণ ধ্যানযোগে তদ্গতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতাকে নমস্কার।

ত্বং ব্রহ্মা ত্বং চ বৈ বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নিবরুণো বায়ুস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং নিশাকরঃ॥ বেদ॥

বেদ আবার বলিতেছেন, তুমি ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি বায়ু, তুমি ইন্দ্র, তুমিই চন্দ্র॥

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ্ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায়জগতাং তং জানকীশং ভজে॥
বিশ্বোদ্ভব স্থিতি লয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।

আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥

যে অব্যয় চিন্ময় প্রভু পৃথিবীর পাপভার হরণ জন্য দেবতাগণ কর্ত্তৃক সম্যকরূপে প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীতলে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাবণাদি রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করিয়া এবং জগতের পাপহরা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় যিনি আত্ত ব্রহ্মরূপ গ্রহণ করেন, সেই জানকীপতিকে আমরা ভজনা করি। একমাত্র এই প্রভুই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গের হেতু—মায়াকে আশ্রয় করিয়াও ইনি মায়াতীত, ইনি অচিন্ত্যমূর্ত্তি, আনন্দঘন নির্ম্মল নিজ বোধরূপ; ইনিই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, এই সীতাপতিকে আমি নমস্কার করি। [যিনি আত্মতত্ত্বব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বরূপ এবং তিনিই মায়া-মানুষ বা মায়া মানুষী]

শয়নমন্ত্র—সপ্তর্ষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্তরক্ষন্তি
সদমপ্রমোদম্। সপ্তাপঃ স্বপতো
লোকমীয়ুস্তত্রজাগৃতোঽস্বপ্নজৌ
সত্রসদৌচ দেবৌ ॥ বেদ ॥

ভৃগু অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষি এই শরীরে (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ এই সপ্ত অবয়বে) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। জাগ্রত অবস্থায় ইঁহারা স্বতঃ প্রমোদ-শূন্য এই দেহরূপ দেবযজন ভূমি রক্ষা করেন। স্বপ্নকালে ইঁহারা সুপ্তজীবের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই অবস্থায় অস্বপ্ন (হিরণ্যগর্ভরূপ দেবতা) জাত-প্রাণ-অপানরূপ এই যজ্ঞভূমিস্থিত দেবদ্বয় জাগ্রত থাকেন।

স্কন্দপুরাণ হইতে।

১। নারী আসক্তি—সর্ব্বজন্মের দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া সেই মানব জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে। [নারীজনে আসক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইলেও লোক সমাজে বিখ্যাত লোকদিগের নিকটে আপনাকে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র অনুভব করে এবং ভিতরে নিজের নীচত্ব অনুভব করে] ঐ সকল মূঢ় দিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য তোমাদের জন্ম কিসের জন্য ?

নারী হইতে জীব জগতের উৎপত্তি, সুতরাং আমরা তাহাদের নিন্দা করি না। কিন্তু যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জ ভাবে আসক্ত হয়, তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করি।

জগতের বৃদ্ধি জন্য ব্রহ্মা মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং সেই মিথুনের যথাযোগ্য আচার পালন করাই কর্ত্তব্য; তাহাতে কিছু মাত্র দোষ নাই। বহ্নি ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে বান্ধব কর্ত্তৃক যে নারী প্রদত্তা হয় তাহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই প্রশংসাজনক এবং সর্ব্বসুখ সম্পাদক।

রক্ত রসাদি ছয়টি ধাতুর যাহা সার, সেই বীর্য্য যোগ্য যোনি পরিহার পূর্ব্বক যাহারা কু-যোনিতে নিক্ষেপ করে—অথবা অন্য উপায়ে বৃথা নষ্ট করে—যমদেব তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে ওষধিদ্রোহী, আত্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী। সুদীর্ঘকালের জন্য তাহাদের অধোগতি হইয়া থাকে।

২। মৃত্যু যে সকলের মস্তকে অধিষ্ঠিত, জনগণ যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আহারেও রুচি হয় না, অকার্য্য করণের কথা আর কি বলিব?

৩। এই সমগ্র জগৎ ছায়ার ন্যায় উৎপত্তি-লয়যুক্ত। ধন, আয়ু, যৌবন বারনারীর ভ্রূবিলাস সদৃশ ক্ষণস্থায়ী।

৪। দুঃখই সংসার-সাগরের আবর্ত্ত, অজ্ঞান ইহার প্রবেশ-পথ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার জল, ক্রোধ ইহার পঙ্ক, মদ ইহার কুম্ভীর, লোভ ইহার বুদ্‌বুদ্, অভিমান ইহার পাতাল সমান গভীরতা, প্রাণিবর্গ ইহার শোভাসম্পাদক যানশ্রেণী; ঈদৃশ সংসার-সাগর-মগ্ন জনগণকে একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

৫। বিত্ত অসার, যদি তাহার সার দান তাহাতে না থাকে। ঐরূপ বাক্য অসার যদি তাহাতে সত্যরূপ সার না থাকে; আয়ু অসার যদি তাহাতে কীর্ত্তিরূপ সার না থাকে এবং কলেবর অসার যদি তাহা দিয়া পরোপকার রূপ সার উদ্ধার না করা হয়।

৬। দেবাসুর সকলের পক্ষে মনুষ্য-জন্ম অতীব দুর্লভ। সেই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া এমন আচরণ করিবে যাহাতে নরকে যাইতে না হয়।

মনুষ্য জন্মে পরম লাভ।

মনুষ্য-জন্মে পরম লাভ কি ?

"অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ" মৃত্যুকালে নারায়ণ স্মরণই পরম লাভ।

এ কথা বলেন কে ?

রাজা পরীক্ষিৎ মুমূর্ষু। জীবন আর সাতদিন মাত্র থাকিবে। রাজার পূর্ব্ব-পুণ্যফলে জীবন্মুক্ত পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব, যদৃচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-ব্রতধারী মুমূর্ষু রাজার নিকটে আগমন করিলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন যে, মুমূর্ষু অথচ মুমুক্ষু তাহার কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশুকদেব বলিতে লাগিলেন :—

রাজন্! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্নই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ। গৃহী ব্যক্তি পঞ্চসূনা পাপেই তৎপর। আত্মজ্ঞানশূন্য গৃহী, গৃহ-কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া পঞ্চ প্রকার প্রাণিহিংসা কার্য্যেই রত থাকে। আমরা কে, কি করিতেছি, উত্তরকালে আমাদের কি হইবে, কি প্রকারেই বা নিস্তার পাইব—ইহারা এই সমস্ত আলোচনা করে না। ইহাদিগের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে।

কিন্তু ইহারা বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় করে। রাত্রিকালে নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গে রঙ্গরসে যাপন করে। দিবাভাগের পরমায়ুঃ, ধনোপার্জ্জনের উদ্যম ও কুটুম্বাদি ভরণে ব্যয় করে।

প্রত্যহ স্পষ্টই দেখিতে পায়—দেহ নশ্বর, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ কাহারও থাকে না; তথাপি আসক্তি বশতঃ ইহারা দেখিয়াও দেখে না। যদি দেখিত, তবে মোক্ষার্থীর কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির স্মরণ, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন তাহার অনুষ্ঠান ভুলিত না।

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর আত্মা কি, অনাত্মা কি ইহার বিচার, পরে একান্তে অষ্টাঙ্গ যোগ—এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যে শ্রীহরির স্মরণ তাহাই মনুষ্য-জন্মের লাভ। পরে অন্তিমে নারায়ণের স্মরণই পরম লাভ। "অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ" এই বাক্য মুমূর্ষু পরীক্ষিতের প্রতি ভগবান্ শুকদেবের উক্তি।

শাস্ত্রে আর কোথাও কি এই উপদেশ আছে ?

"ভৃগুদত্ত স্তুতিস্তব" পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইলে, তিনি শ্রীভগবান্‌কে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি জ্ঞানের কথা বলিয়া বলিলেন—

তস্মাৎ তদ্‌ভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তিশঙ্কা বিজ্ঞান শঙ্কানৈব সুখং তথা॥
অতস্তৎপাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি।
স্যাৎ তদ্‌ভক্তিমতাং সঙ্গোঽবিদ্যাবাধ্যাং বিনঙ্ক্ষতি॥

হে ভগবান্! তোমাকে যাহারা ভক্তি করে না, তাহাদের শতকোটি কল্পেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাহাদের জ্ঞানও হয় না, সুখও হয় না। অতএব তোমার শ্রীপাদপদ্মে জন্ম জন্ম যেন আমার ভক্তি হয়, তোমার ভক্তসঙ্গ যেন হয়, ইহাতেই অবিদ্যার নাশ হয়।

ভগবান্ তাঁহার স্তবে প্রসন্ন হইলেন বলিলেন—

প্রসন্নোঽস্মি তব ব্রহ্মন্! যৎতে মনসি বর্ত্ততে।
দাস্যে তদখিলং কামং মা কুরুষাত্র সংশয়ম্।

তোমার যাহা প্রার্থনা তাহাই পূর্ণ করিব, সংশয় করিও না; তখন ভগবান্ পরশুরাম বলিতে লাগিলেন:—

যদি মেঽনুগ্রহো রাম! তবাস্তি মধুসূদন!
তদ্ভক্তসঙ্গস্তৎ পাদে দৃঢ়াভক্তিঃ সদাস্তুমে॥

হে রাম! হে মধুসূদন! যদি আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে তবে এই কর যেন সর্ব্বদা তোমার ভক্তের সঙ্গ আমার লাভ হয় আর সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্মে আমার দৃঢ়াভক্তি থাকে।

প্রভু! আমার আর এক প্রার্থনা;—

স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ যস্তু ভক্তিহীনোঽপি সর্ব্বদা।
যদ্‌ভক্তি স্তস্য বিজ্ঞানং ভৃগুদত্তে স্তুতিস্তব॥

এই স্তোত্র যে পাঠ করিবে, সে ভক্তিহীন হইলেও যেন তোমার প্রতি সে ভক্তি-লাভ করিতে পারে; তাহার জ্ঞান যেন লাভ হয়, আর অন্তিমে তোমাকে সে যেন স্মরণ করিতে পারে।

শাস্ত্র বলিতেছেন—অন্তিমে তোমার স্মরণই পরম লাভ।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে শ্রীকৌশল্যাদেবীকে বলিয়াছিলেন—মাতঃ, তোমার এই স্তব ও আমার সহিত তোমার কথা—যে ইহা পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে,

সে "মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ"—সে মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে, পারিলেই তাহার পরম লাভ হইবে।

সমস্ত জীবন ধরিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে "অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ" হইবে?

যে ব্যক্তি সকল চিন্তা, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য শ্রীভগবানের অনুমতি লইয়া করিতে অভ্যাস করিতেছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা রূপ কার্য্যটিকে প্রধান কর্ত্তব্য জানিয়া অন্যান্য যথা-প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়াও অন্য কর্ম্মের আদিতে, বিরামকালে এবং অন্তে ভগবান্‌কে লইয়াই থাকিতে হইবে ইহা বুঝিয়াছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা করিবার কার্য্যটি জানিয়া এক মুহূর্ত্তও বৃথা সময় নষ্ট করে না—সেই ব্যক্তিই অন্তিমে তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে স্মরণ করিতে সমর্থ।

সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিবার অভ্যাস প্রথমে প্রাতে, স্নানান্তে (মধ্যাহ্নে) এবং সন্ধ্যায় নিয়ম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইবে। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যিনি যাহা পাইয়াছেন, তিন সন্ধ্যায় তাহা করিতে হইবে। অন্য সময়ে যেমন যেমন অবসর পাইবে, তখনও ভগবানের নাম জপ বা ধ্যান বা আত্ম-বিচার লইয়া থাকিতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় তাহার ভিতরেই ইষ্টদেবতা আছেন সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে। যখন যাহা ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইতেছে, তাহাই শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত ইহা বুঝিয়া অচঞ্চল থাকিতে হইবে। যদি দুঃখের তাড়না আইসে- সেই সময়ে শ্রীভগবানের নাম জপ করিয়া করিয়া, তাঁহারই চরণ চিন্তা করিয়া, তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। লোকসঙ্গে যখন থাকিবে, তখন সবই তিনি ভাবিয়া সকল ব্যাপার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সকল মনোবেদনা তাঁহাকেই জানাইতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস প্রবল হইলে তবে মরণ সময়ে যে তাঁহার স্মরণ হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করিতে অভ্যাস করেন না, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার কৃপা কিরূপে লাভ করিবেন?

সর্ব্বদা নাম জপ, রূপ ধ্যান; সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কথা কওয়া; শাস্ত্র পাঠ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া—ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া ফেল; অন্তিমে চিন্তামণির চরণ-চিন্তা তাঁহারই কৃপায় আসিবেই। যতক্ষণ জাগিয়া থাক তাঁহাকে স্মরণ

করিতে চেষ্টা কর, তবেত নিদ্রাকালেও তাঁহার স্মরণ থাকিবে; নতুবা কখন কখন একবার করিয়া প্রার্থনা মাত্র করিলে—বলিলে হে ভগবন্ অন্তিমে যেন তোমায় দেখা পাই—এইরূপ মৌখিক প্রার্থনায় কিছুই হইবে না জানিও। এইরূপে যে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা তাহাও আত্ম-প্রতারণা। যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা বিষয়েরই সেবা করেন; তাঁহারা বিষয় লাভের জন্যই যেন ভগবান্‌কে এক একবার স্মরণ করেন মাত্র—ইহাতে কখনই মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ করা যাইবে না।

যখন শরীর সুস্থ থাকে তখনই যখন তাঁহাকে স্মরণ করিতে যাও তখন কত বিঘ্ন আইসে—আর সেই মৃত্যুকালে যখন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকিবে, তখন কি তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিবে?

নিত্যকর্ম্ম কখন শিথিল করিও না, সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব বাক্য, সর্ব্ব ভাবনা, তাঁহাকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস কর—ইহাতে আলস্য করিও না; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—অন্তিমে শ্রীহরির স্মরণ-রূপ পরম লাভ তোমার হইবেই।

আর আত্ম-প্রতারণা করিও না। লোকের মুখে বা শাস্ত্রে তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব শুনিয়া—তিনিই একমাত্র সত্য ইহা লোকমুখে শুনিয়া যদি মনে কর তোমার আত্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে; যদি মনে কর তুমি সোঽহং হইয়াছ, তবে তোমার মত ভ্রান্ত আর কে?

এ কথাও সত্য যে, যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহাদের মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না; তাঁহারা এই জীবনেই এই জগতেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যান। যেমন সুষুপ্তিকালে সকল মানুষই বা সকল জীবই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু এই মিলন প্রকৃতি দ্বারাই হয়; ইহা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াই হয়। সেই জন্য আবার সুষুপ্তিভঙ্গে পূর্ব্বসংস্কার জাগে, জাগিয়া আবার এই দেহে তাহাদিগকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে; কিন্তু জীবন্মুক্ত, সাধনা দ্বারা জ্ঞাতসারে সেই পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান চৈতন্যের সহিত অন্তিমে মিশিয়া যান। তাই বেদ বলিতেছেন,—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে।

জীবন্মুক্তের যে মুক্তি তাহাই সদ্যোমুক্তি; কিন্তু অন্তিমে যে ইষ্টদেবতার স্মরণ ইহাতে ক্রমমুক্তি হয়। সদ্যোমুক্তির কথা শুনিয়া আমি জীবন্মুক্ত হইয়াছি, সোঽহং জ্ঞানী হইয়াছি আমার আর জপাদি করিতে হইবে না—ইত্যাদি মনে ভাবা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। জীবন্মুক্তির সাধনা করিয়া তবে প্রত্যক্ষ

কর—জীবন্মুক্ত হইলে কিনা ? যতদিন না জীবন্মুক্তির সমস্ত অবস্থা লাভ করিতেছ ততদিন কপট জীবন্মুক্ত না হইয়া সর্ব্ব ভাবনা, সর্ব্ব বাক্য, সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে মনে থাকে কি না দেখ ; সমস্ত ব্যাপার তাঁহার অনুমতি লইয়া করিতেছ কি না দেখ, সতী-স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করাকে ব্যভিচারিণী হওয়া মনে করেন—তুমিও সেইরূপ কোন ব্যভিচার করিতেছ কি না দেখ। যদি এই সমস্ত দেখিয়া বুঝিতে পার জীবন্মুক্তি হয় নাই তবে অন্তে নারায়ণ স্মরণের জন্য কর্ম্ম কর। কারণ যাঁহারা ক্রমমুক্ত হইতেও পারিলেন না তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিতে হইবে। কিন্তু এই জন্মে যাহা ছিলেন তদপেক্ষা নিকৃষ্ট যোনিতে গমন করিতে না হয় এই জন্য উপায় কি ?

কোন ধর্ম্মে বলা হয়, একবার মানুষ হইয়া গেলে আর নীচ যোনিতে নামিতে হয় না। ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধের কথা। শাস্ত্রপ্রমাণে এবং যুক্তিতে ইহা প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিতে দেখা যায় যাহারা রিপুর প্রশ্রয় দেয়, এই জন্মেই তাহাদের মুখে পশুর ভাব আসিয়া যায়। ভিতরে পশুভাব আসিয়া গেলে এই দেহের অন্তে মানুষটি যে পশু হইয়াই জন্মিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

আবার শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়, পাপকর্ম্মকারীকে নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট যোনিতে যাইতে হইবে। "কপূয়চরণা" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদ ইহা দেখাইতেছেন। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ইত্যাদি শ্লোকে গীতা ইহার সমর্থন করিতেছেন ; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণও তাহাই বলিতেছেন। ভাগবত দৃষ্টান্ত দিতেছেন, ভরতরাজা মৃগশিশু চিন্তা করিয়া মৃগদেহ প্রাপ্ত হয়েন। নহুষ রাজা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সর্প হইয়াছিলেন ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রমাণ থাকিতে যাঁহারা বলেন একবার মানুষ হইলে আর পতন নাই তাঁহাদের এই আত্ম-প্রতারণায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বলিতে চাই অন্তকালে যদি নারায়ণ স্মরণ হয়, তবে মনুষ্যকে আর অধম যোনিতে যাইতে হয় না। এরূপ ব্যক্তি ক্রমমুক্তি লাভ করেন। জীবন্মুক্তের সদ্যোমুক্তি যদি না হয়, তবে যাহাতে ক্রমমুক্তি হয় তাহার আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অন্তে নারায়ণের স্মরণ" এই কলিযুগে কি কোথায় হয় ?

অনেকের হয় শুনিয়াছিলাম। কখন পূর্ব্বে স্বচক্ষে দেখি নাই। সম্প্রতি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম নানা কারণে তাহাই উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

বহু পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লেখা ছিল। যাহা পরে ঘটিবে পূর্ব্ব হইতে যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি সেইজন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিলেন, ঘটনার পরে ইহা বোধ হইল।

সন ১৩১৯ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ বেলা ৮ টার সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধের দেহান্ত হইল। ৺প্রবোধ বিবাহ করে নাই। বয়স বোধ হয় ৪০ হইয়াছিল। চিরদিনই ব্রহ্মচর্য্য করিতেছিল। সাধনা জন্য নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া শেষে হরিদ্বারে গমন করে। ইচ্ছা ছিল, হৃষীকেশ ও উত্তরকাশী এই দুই স্থানেই থাকিবে। কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালার সমস্ত ভার পূজনীয়া ৺মাতাজী তপস্বিনী প্রবোধের হস্তেই দিয়া যান। মহাকালী পাঠশালা ত্যাগ করিয়া সাধনার জন্য হরিদ্বারে থাকিতেই থাকিতেই জ্বর হয়। পরে কলিকাতায় চিকিৎসা জন্য আনা হয়। জ্বর কালাজ্বরে পরিণত হয়। গত জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণের ৪ দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া দেহান্ত হয়। যাঁহারা পূর্ব্বে প্রবোধকে ভাল অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনিয়াছি প্রবোধকে ঋষির মতই বোধ হইত। কিন্তু ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া অস্থি মাত্র সার হইয়াছিল। শেষ অবস্থায় কথা প্রায় কহিত না। কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যে ভাবে নারায়ণের স্মরণ করিতে করিতে তনুত্যাগ হইল, তদ্দৃষ্টে বুঝিলাম শাস্ত্রবাক্য সম্পূর্ণ সত্য। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান যাঁহারা করেন ভগবান্ অন্তিমে তাঁহাদিগকে কখনও ত্যাগ করেন না।

প্রবোধের শেষ সময়ে সীতারাম নাম ডাকান হইতেছিল। একদিকে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন; অন্যদিকে আমি শ্রীগীতার এক অধ্যায় ও নাম রামায়ণ সম্পূর্ণ পাঠ করিলাম। সীতারাম সীতারাম বলান হইতেছে। প্রবোধ আপনিই ধরাগলায় নারায়ণ নামও বলিতে বলিল। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম সীতারাম এই নাম বলা হইতেছিল। ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ঠিক হইতেছে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি নিকটে আনা হইল। হস্ত তখন কাঁপিতেছে সেই অবস্থাতে শ্রীভগবানের চরণ স্পর্শ করিল এবং জানাইল চরণোদক দেওয়া হউক। গঙ্গাজল চরণে লাগাইয়া মুখে দেওয়া হইল। তাহাই পান করিল। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, নাম ডাকান হইতেই ছিল, চরণোদক পান হইল, শ্রীগীতা ও রামায়ণ পাঠ শেষ হইল। ইহার দুই মিনিট পরে দেহান্ত হইল। মুখের বিকৃতি হইল না। গলায় ঘড়ঘড়ানি হইল না। চক্ষুর বিকৃতি হইল না। স্থির সহজ দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতে দেখিতে—যেন কাহারও সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইল। এই জীবনের সব শেষ হইল।

স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম। এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। অন্তে নারায়ণঃ স্মৃতি যাঁহাদের হয় তাঁহারা সারূপ্য লাভ করিয়া ভগবানের লোকে গমন করেন শাস্ত্র বহুস্থানে ইহা দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রমত মনুষ্যজীবনে ইহা অপেক্ষা পরম লাভ আর নাই। তাই বলি, দিন থাকিতে থাকিতে নিরন্তর যথাসাধ্য ডাকিয়া যাও। শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

সমস্ত সাধনা।

যখন বসিতে যাইতেছ তৎপূর্ব্বে আপনাকে আপনি দুঃখী করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

দুঃখী করিব ?

কেন দুঃখ কি কখন কর নাই ? দুঃখ কি কখন পাও নাই ? দুঃখী কি কখন হও নাই ?

কি বলিতেছ ?

যখন শোক পাইয়াছিলে তখন যেমন লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলে তখন যেমন বলিয়াছিলে আর যে সহ্য করিতে পারি না—এ যাতনা যে আর দেখা যায়না—সত্য সত্যই প্রাণ যেন আর রাখিতে পারি না—দেখিতে দেখিতে শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিয়া অকথ্য যাতনা দিতেছে। এই সমস্ত দুঃখ ত ভোগ করিয়াছ, তবে সেই দুঃখের স্মরণে বাধা কি ?

স্মরণে কি হইবে ?

স্মরণে বৈরাগ্য আসিবে। আর কোন কিছুতেই রুচি হইবে না। আপনাকে আপনি দুঃখী ত বল, কিন্তু কেহ তাস খেলিতে ডাকিলে লোভ সম্বরণ কর না। সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলে বেশ যাও। হাসি ঠাট্টাও ত বেশ আছে। তবে নিরন্তর ত দুঃখ লইয়া নাই।

তাই বলিতেছি হৃদয় ত সত্য সত্যই শ্মশান হইয়াছে। স্মৃতিতে এই হৃদয়-শ্মশানে প্রিয়জনের চিতা জ্বাল। তাহাদের শেষকালকার কাতর ভাব স্মরণ কর; করিয়া দুঃখী হও। দুঃখী হইয়া বিচার কর তোমারও এই দিন আসিবে কি না? তখন কি করিবে? অনাথের নাথ ভিন্ন কোন জীবের গতি নাই। তাঁহাকে নিত্য স্মরণ ভিন্ন গতি নাই, গতি নাই।

নিত্য স্মরণ করিব কিরূপে ? মনে যে থাকে না ?

তাই ত বলিতেছি দুঃখ জাগাইয়া দুঃখী হও। হইয়া শরণাপন্ন হও। তথাপি মন এমনই বস্তু এ অবস্থাতেও নানা কথা তুলিবে। যাহা ভাবনা তুলিবে তুমি তাহা লক্ষ্য কর, করিয়া প্রতি ভাবনাটি উঠিবার সময় তাঁহাকে জানাও। সেইরূপ কথাটি যখন মুখ হইতে বাহির হইতে যাইতেছে তখনও জানাইও এবং কর্ম্ম যাহা কিছু করিতে যাইতেছ প্রথমেই তাহা জানাও। জানাইতে অভ্যাস করিলে কি হইবে? কি হইবে? তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িবে।

দৃষ্টি পড়িলে কি হইবে?

তাহার চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিবে।

তার পর?

তারে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে এত শান্ত হইলে কিরূপে? আমি কি শান্ত হইতে পারিব?

আমার মত হও। পারিবে।

কিরূপে হইব?

আমি যে ব্যবহারিকী লীলা দেখাইয়া আসিয়াছি তাহা প্রতিজীবের মধ্যে যে বাস্তবী লীলা হইতেছে তাহাই। তুমিও মন কর্ত্তৃক মায়াসাগরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে আনীত হইয়াছ। কপট দুর্ব্বৃত্ত তোমায় তোমার রমণীর দর্শনের নিকট হইতে ছলনা করিয়া অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। তোমার উপর আসক্ত বলিয়া, এখনও তোমাকে বিনাশ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মন তোমাকে তোমার প্রিয় ভুলাইতে চায়, ভুলাইয়া তোমায় ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে চায়।

কত লোভ দেখাইতেছে, কত কাকুতি মিনতি করিতেছে। তুমি কি আমার মত ব্যভিচার-ভয়ে কম্পিত হও? হইয়া নিরন্তর আমার প্রভুকে স্মরণ কর? অনাহারে অনিদ্রায় সর্ব্বদা স্মরণ কর? পাছে অসাবধান হইলে অনিষ্ট ঘটায়।

আমি সর্ব্বদা ডাকি একবার এস। এত যে ভাল বাসিতে, একবার দেখ আমার দশা কি হইয়াছে! এস, আমাকে এই মায়াসাগর হইতে উদ্ধার কর; এই মায়াপুত্রের হস্ত হইতে উদ্ধার কর। তুমিও নিরন্তর এই রূপ কর; শেষে আমার মত তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবে?

আহা! বড় সুন্দর। আর যাহা যাহা করিতে হইবে সব বলনা।

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান তিনই আবশ্যক। যত প্রকার কর্ম্ম হইতে পারে, কি মানসিক, কি বাচিক, কি কায়িক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম শ্রীভগবান্‌কে জানাইয়া করিতে অভ্যাস করাই প্রথম অবস্থার সাধনা। ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। সকলেই ইহা পারে। বলিতে গেলে ইহাই ধর্ম্মমন্দিরের ভিত্তি। যিনি কর্ম্মার্পণ অভ্যাস করেন নাই, তিনি উচ্চ সাধনা লইয়া থাকিলেও ব্যভিচার করিতেছেন।

(১) লোকসঙ্গে লৌকিক কর্ম্মকালে তাঁহার অনুমতি লইয়া কথাটি পর্য্যন্ত কহার অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাতে সুখ অত্যন্ত অধিক। তার

পর কর্ম্মফল একবারে চিন্তা না করিয়া, তাঁহাকে মনে ভাবিয়া, সর্ব্ব ফলকামনা তাঁহাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ক্রমে ঈশ্বর যে সন্তুষ্ট হইতেছেন তাহা নিজে নিজেই বুঝা যাইবে। ইহাই হইল লোকসঙ্গে লৌকিক কর্ম্মকালে ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করার অভ্যাস। ইহা প্রথম।

(২) একান্তে বৈদিক-কর্ম্মকালে যাহা যাহা সঙ্কল্প উঠিবে তাহাই তাঁহাকে জানান। ইহা হইল সমস্ত ভাবনা তাঁহাতে অর্পণ। চিত্ত যাহা যাহা ভাবনা তুলিবে, শোকতাপ তুলিবে, সুখদুঃখ তুলিবে, তাহা জ্যোতির অভ্যন্তরবর্ত্তী তোমাতে অর্পণ চাই। রজস্তমও সে সত্য; কিন্তু এ তাহার সংসার-মূর্ত্তি। রজ ও তমের আবির্ভাব কালেও তাহাতে ব্যাকুল না হইয়া, তাহার এই মূর্ত্তি মনে করিয়া, নিত্যসত্ত্ব মূর্ত্তিতে ঐ সমস্ত অর্পণ করিতে অভ্যাস ইহাই দ্বিতীয়।

(৩) ইহার পরে উপাসনা। জপকালে নারায়ণাভিন্ন স্বয়ং [শ্রীমহাবীর যেরূপে প্রথম দর্শনকালে লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপে] মস্তকে ধারণ করিতেছি স্মরণ করিয়া করিয়া জপকালে সর্ব্বার্পণ আরও প্রবল করা। এই পর্য্যন্ত কর্ম্ম, প্রার্থনা ও উপাসনা হইল। উপাসনাকালে খণ্ড অখণ্ডে মিলিত হইতেছে স্মরণ করিয়া শান্ত হইয়া তাহাই দেখা।

(৪) শান্ত হইয়া গিয়া আত্মচৈতন্য অনুসন্ধান করা হইল শেষ। খণ্ড-চৈতন্যকে অখণ্ড চেতনে মিলাইবার জন্য যে উপাসনা তাহার পরে চৈতন্য সর্ব্বত্র ভাসিতেছেন ইহার ভাবনা করা। প্রথমে বিশ্বাসে ইহা করিতে হয়। পরে চিত্ত যত যত একাগ্র হইবে, ঘটমধ্যস্থ আকাশ যত যত ঘট ছাড়িয়া আপনাকে আপনি দেখিতে পারিবে, ততই ইহা বুঝিতে পারিবে যে ঐ ঘটাকাশখণ্ডই অনন্ত সীমাশূন্য মহাকাশ মাত্র। কেবল ঘট উপাধিতে মন রাখা হইয়াছিল বলিয়া খণ্ডমত বোধ হইতেছিল। আমিও অখণ্ড-চৈতন্য ইহা অনুভবে আসিলে দৃশ্য-দর্শন আর থাকিবে না, জগৎ দর্শন ও দেহ-দর্শন ভুল হইয়া যাইবে। সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকিয়াও আর কিছুই দেখা হইবে না—সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও ব্যবহারিক কার্য্য অবুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া যাইবে। ইহাই মুক্তি।

প্রতিদিন মানুষের দুঃখনিবৃত্তি হয়; প্রায় সকলেরই হয়।

যত ভীষণ ঘাতনাই হউক না কেন, অত্যন্ত প্রিয়জনের বিনাশজনিত যে

শোক, অথবা ভীষণ ব্যাধিজনিত যে শোক তাহাও মানুষ ভুলিয়া যায়। সকলেই যায়।

যখন স্থূল দেহে স্থূল জগতে থাক তখন সবই থাকে; যখন নিদ্রায় সূক্ষ্ম জগৎ লইয়া থাক তখন সব থাকে না। থাকে স্থূলের সূক্ষ্ম সংস্কার। আবার যখন স্বপ্নশূন্য নিদ্রা হয়, যখন সুষুপ্তি হয় তখন কোন কিছুই থাকে না। হয়ত সমস্ত দুঃখই থাকে, কিন্তু যে ভোগ করিবে সে থাকে না, সে থাকে না বলিয়া কিছুই থাকে না। কিছুই থাকে না বলিয়া কোন দুঃখও থাকে না।

মানুষ তখন কোথায় যায়? দেহটা থাকে অন্য লোকে দেখে। কিন্তু যে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছিল সে যেন কোন একটি বস্তুর সঙ্গে এক হইয়া যায়। এক হইয়া গেলে আর শোকতাপ থাকিবে কিরূপে? এক হইয়া গেলেই বুঝি পরমানন্দ-প্রাপ্তিতে মানুষ স্থিতিলাভ করে। বিন্দু, সিন্ধুর সহিত মিশিয়া গেলেই, এক সিন্ধু মাত্র থাকে।

তবেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় পাওয়া গেল। জানা গেল জাগ্রৎ অবস্থায় সব থাকে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে, আর সুষুপ্তি অবস্থায় আর কিছুই থাকে না। জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে, পরে তুরীয়ে সজ্ঞানে স্থিতিলাভ করাই সমস্ত সাধনা।

যোগকা বারমাসা।

প্রথম মহিনা আষাঢ় লাগো শোবো কায়াকো,
বাহর দৃষ্টি পবন নহি আবে ভীতর ছায়াকো;
পঞ্চ তত্ত্বকা নগর বসায়া নখ শিখসে নিকো,
নয়ন নাসিকা করন্ মুখনসে কাম চলা যাকো।
উস্‌কা খোজ করো যাসা।
(ধ্রুপদ) সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা॥ ১॥

শিখসে—শিখা পর্য্যন্ত।
নিকো—উৎকৃষ্ট।
যাকো—যাহার।
যাসা—মনুষ্য।

আষাঢ় মাস। তোমার শরীর শুদ্ধ কর। বহির্মুখ দৃষ্টি ও বাহিরে প্রবাহিত বায়ু, অন্তরস্থ পরমপুরুষের ছায়াকে স্পর্শ করুক। পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা গঠিত নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট নগর। এই নগরের কার্য্যসমূহ নয়ন, নাসিকা, কর, মুখ ইত্যাদির দ্বারা হইয়া থাকে। হে মনুষ্য! তুমি উহার অনুসন্ধান কর। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ১ ॥

শাঁবন নাম সারকো জপ্‌লে অজপা জপ মনমে,
কর নহি হিলে, জিভ্‌ ন ডোলে সোহং জপ্‌নেমে,
ইঙ্গল পিঙ্গলকে মারগ্‌মে ডোর গহো তন্‌মে,
কাল না ব্যাপয়, সদা সুখী হো রহো সুষুম্নামে,
কি সোহং নাম হয় খাসা,
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পুরন্‌ হো আশা ॥ ২ ॥

শ্রাবণ মাস। ভিতরে মনে মনে সর্ব্বজপের সার অজপা জপ কর। এই সোহং জপে করমালার আবশ্যক নাই, জিহ্বাও নাড়িতে হয় না। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়া চল। কাল তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বদা সুখে সুষুম্নার মধ্যে অবস্থান কর। অতি উৎকৃষ্ট এই সোহং জপ। সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ২ ॥

ভাদো ভরম মিটাবো গুরুকি সেবা কছু করনা,
গগনগুফাকে মারগ্‌মে তুম্‌ ধীরজসে চলনা,
খুলা এক কেঁওয়াড়ী দাদশ জিস্‌মে ইঁয় লাগি,
বৈকুণ্ঠপুরী বো দশম্‌ দ্বারা জঁহা জ্যোতি জাগি,
ন লাগে ওঁহা কাল ফাঁসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পুরণ হো আশা ॥ ৩ ॥

ভাদ্র মাস। শ্রীগুরুর কিছু সেবা করিয়া ভ্রমসমূহ দূর কর। ধৈর্য্য সহ-

---

হিলয়=নড়া।
ডোলয়=নড়া।
মারগ্‌=মার্গ।
খুলা=মুক্ত।
কেঁওয়াড়ী=দ্বার।
ডোরগহো=চলো।
তন্‌মে=শরীরে।

কায়ে গগন গুফার ভিতর দিয়া চল। ইহাতে একটি গুপ্ত ও বাদশটি দ্বার আছে। ইহার ভিতরে বৈকুণ্ঠপুরী ও তাহার উপরে দশম দ্বার—যেখানে সর্ব্বদা চৈতন্যময় জ্যোতি বিরাজমান। এই স্থানে আসিলে যমের ফাঁসি লাগিবে না। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৩ ॥

কুধার কুমতি বিসরাবো কোই অন্তর ধ্যান ধরে,
নাভিকমলমে সুরতি লগাকে আতম্ নয়ন পরে,
অমর অডোল পুরুষ এক রহতা শূন্য অঠারিমে,
স্বয়ং প্রকাশা, আপহি ঝলকা দশ্ম দ্বারেমে,
ন লাগে ওঁহা ভূখ পিয়াসা,
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা ॥ ৪ ॥

আশ্বিন মাস। সমস্ত কুচিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্তরে তাঁহার ধ্যান কর। নাভিকমলে ধ্যান কর, তাহা হইলে আত্মদেবের উপর দৃষ্টি পড়িবে। এক জন অমর অচল পুরুষ ভিতরের উর্দ্ধতন শূন্যস্থ প্রকোষ্ঠে থাকেন; তিনি স্বয়ং প্রকাশ, দশম-দ্বারে তাঁহার জ্যোতি সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। সেখানে ক্ষুধা পিপাসা লাগে না। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৪ ॥

কার্ত্তিক কমল অষ্টদল ভিতর অগম জ্যোতি দরশে,
চমকে বিজুলি, মেঘ গরজতা, অমৃত জল বরষে,
উল্টা কমল মূলকে নীচে বহেঅমীকা ধারা,
চাঁদ সুরয্কা তেজ ন যাবে ওঁহা গগন দ্বারা,
ওঁহা হম দেখা তামাসা,
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা ॥ ৫ ॥

কার্ত্তিক মাস। ভিতরে অষ্টদল-কমল প্রস্ফুটিত হইলে উহাতে নিরুপম জ্যোতি দৃষ্টি-গোচর হয়। বিদ্যুৎ চমকিত হয়, মেঘ গর্জ্জন করে, পরে অমৃত ধারা বর্ষিত হয়। অধোমুখ এই কমলের নীচে অমৃতময় নদী প্রবাহিত। সেই

কুধার—আধির।
বিসরাও—বিস্মৃত হও।
সুরতি—ধ্যান।
অমীকা—অমৃতের।
অডোল—অচল, স্থির।
অটারি—উপরের প্রকোষ্ঠ।

গগনে চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। আমি সেখানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৫ ॥

অগহন আশা লগি হমারি গগনগুফা মাহি,
বজ্র কেঁওয়াড়ী লগি ডগরমে সহজ খুলে নাহি,
গুরু কৃপাসে ওঁহা করো কোই হিকমতকে কাজা,
উলট্ পবনকি ঠোকরমারো খোলো দরবাজা,
ওঁহা পর শুনো শব্দ খাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা ॥ ৬ ॥

অগ্রহায়ণ মাস। আমার গগনগুফাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল। পথে বজ্রময় দ্বার অতিক্রম করিতে হইবে। উহা সহজে খোলে না। ঐ দ্বার খুলিবার জন্য কৌশল আবশ্যক। বিপরীত পবনের ঘা মারিয়া দ্বার খুলিয়া ফেল। তাহার পর সেখানে এক অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সচ্চিদানন্দস্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৬ ॥

পুব পিয়া পরদেশ আপনা খোঁজ করো ভাই,
জনম্ জনম্কা সংশা তেরা সভি ছুটি যাই,
ঘট্ বিচ্ দেখো গুরুরূপসে অলখ্ পিয়া ছায়া,
পূরণ কৃপা করকে ব্রহ্ম ঋষিকো বতলায়া কিয়া ভরমোকা নাশা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হো আশা ॥ ৭ ॥

পৌষ মাস। আমার প্রিয়জন বিদেশে আছেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি পাই, তবে জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইবে। নিজ শরীর মধ্যে গুরুরূপী প্রিয়জনের অলক্ষ্য ছায়া দর্শন কর। তিনি নিরতিশয় কৃপা করিয়া, ব্রহ্মঋষিকে সমস্ত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, সমস্ত মোহ দূর করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৭ ॥

মাহি — মধ্যে।
হিকমতকে — কৌশলের।
সংশা — সংশয়।
ঘট্‌বিচ্ — ঘটমধ্যে — শরীরের মধ্যে।
পূরণ — পূর্ণ।
ডগরমে — পথে।
সভি — সমস্ত।
বতলায়া — বলিয়াছেন।

লাগত মাঘ অগমকি বাণী শুনো সমুঝ্‌বারে,
ভরমজাল ভবসাগরসোঁ তুম সদা রহে ন্যারে,
উসি কানসে শুনো গগনমে অনহদ্‌ বাজত হয়,
শূন্য মহলকে ভিতরমেঁ শিবশক্তিবিরাজত হয়,
বনায়া খুব কৈলাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৮ ॥

মাঘ মাস। হে বুদ্ধিমান্‌, তুমি ঐ অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহ-জাল ছিন্ন কর এবং ভবসাগর হইতে দূরে অবস্থান কর। শূন্যস্থিত প্রকোষ্ঠে শিব শক্তি সদা বিরাজমান। আহা, কি সুন্দর কৈলাস সৃষ্টি করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ৮ ॥

ফাল্গুন ফাঁস লগে নিজ মন্‌মে লিয়ে হাথ ডোরি,
পাঁচ চোরবা বসে দেহমে সদা করয়ঁ চোরি,
বহুত করো কোট যতন কিসীকে কাবু না আবে,
নর নারী বা সকল দেবতা সবকো ভরমাওয়ে,
জিন্‌হোকা সারা পরগাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥ ৯ ॥

ফাল্গুন মাস। দেহস্থ কামাদি পঞ্চ চোর রজ্জুহস্তে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে, সুবিধা পাইলে ইহারা মনের গলায় ফাঁসি দেয়। বিশেষ চেষ্টা করিলেও ইহারা কাহারও বশীভূত হয় না। ইহারা দেবতা মনুষ্য সকলকেই ভুলাইয়া

লাগত—আরম্ভ হইল।
অগম—অগম, বেদ।
সমুঝবারে—বুদ্ধিমান্‌।
ন্যারে—দূরে।
ডোরি—রজ্জু।
কাবু—অধিকার বশ।
ভরমাওয়ে—ভুলাইয়া দেয়।
সারা—সর্ব্বত্র।
পরগাশা—প্রকাশযুক্ত, পরাক্রমশালী।

দেয়। ইহারা সর্ব্বত্র পরাক্রমশালী। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক।

চৈত্র চেতকে বগিয়ামে তুম্ খোঁজো দিনরাতি,
শূন্য মহল্‌মে দীপক্ জলতা বিনা তেল বাতি,
যতন করয় বহুতেরে দরশ কোট যোগীজন পাবে,
ষট্ চক্র কি খোল কেঁওয়াড়ী উপর চড় যাবে,
জিনহোকা ছুটা ভব ত্রাসা।
ন লাগে ওঁহা কালকা ফাঁসা
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হোয়ে আশা ॥ ১০ ॥

চৈত্র মাস। চিত্তরূপ উদ্যানে তুমি দিবারাত্র অনুসন্ধান কর। সেখানে শূন্যগৃহে তৈল ও বর্ত্তিকাবিহীন প্রদীপ জ্বলিতেছে। বিশেষ যত্ন করিলে যোগীজন ইঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন। এই গৃহে ষট্‌চক্ররূপ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উপরে উপরে উঠিলে ভবভয় দূর হয়। সেখানে কালের ফাঁসি গলায় পড়িতে পারে না। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক ॥ ১০ ॥

বৈশাখ বাত এক শুনো চরণকো গুরুকে শরণকো হো রহনা,
ছাড় বাসনা সকল জনোসে ছোটে হো রহনা,
ত্যাগো মান গুমান গরিবী হিয়দে ধর লেনা,
হো ভলাই উতনি দীনপর দয়া কর দেনা,
বনো তুম্ দাসনকো দাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্হারা পূরণ হোয়ে আশা ॥ ১১ ॥

বৈশাখ মাস। একটি কথা বলি শ্রবণ কর। সর্ব্বদা গুরুর শরণাপন্ন থাকিও। সর্ব্ববাসনা ত্যাগ কর, সর্ব্বাপেক্ষা অণু হইয়া থাক, মান অভিমান ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে দীনতা আনয়ন কর, দীনজনের প্রতি দয়া কর। তোমার ভাল হইবে। তুমি তাঁহার দাসের দাস হও। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার বাসনা পূর্ণ হউক ॥ ১১ ॥

গুমান—অভিমান, অহঙ্কার।

চেতকা বগিয়া—চিত্তরূপ উদ্যান

জেঠ জাগ্‌তি জ্যোতি কি মহিমা চার বেদ গাবে,
গুরুগৌরীসুত কহে তুম্‌হারা পার নহি পাবে।
নেতি ধৌতি বস্তি করকে দেহশুদ্ধি করলেহ্‌
খানা পিনা চলনা ভাষণ থোড়াসা রাখলেহ্‌
বার্থ মত্‌ শ্বাসেদে শ্বাসা।
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তমে কাকতুণ্ডিসে বায়ু পিয়ো ভাই,
শেষনাগকে তুল্য তুম্‌হারি আয়ু বড় যাই।
বিষয় বেদ গ্রহভূমি সম্বৎ মাঘ কৃষ্ণ মানো
সোমবার পঞ্চমী যোগ কি যুক্তি লিখি জানো
আগে ইয়হ সংসার কি ঝাসা।
সত্যনামকা ধ্যান তুম্‌হারা পূরণ হো আশা ॥১২॥

জ্যৈষ্ঠ মাস। চতুর্ব্বেদ চৈতন্যময় জ্যোতির মহিমা গান করেন। শ্রীগণেশ বলেন ইঁহার অন্ত পাওয়া যায় না। তুমি সম্প্রতি নেতি, ধৌতি, বস্তি ক্রিয়া দ্বারা দেহ শুদ্ধ কর। পান, ভোজন, ভ্রমণ, কথন অল্প করিয়া কর। বৃথা শ্বাস প্রশ্বাস ব্যয় করিও না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কাকতুণ্ডে বায়ু পান কর, অনন্ত নাগের তুল্য তোমার আয়ু বাড়িয়া যাইবে। সংবৎ ১৯৫০ মাঘ সোমবার পঞ্চমী—যোগের সমস্ত বিষয় উক্ত হইল। ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া, সংসার-জাল অতিক্রম কর। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের ধ্যান করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হউক।

ইতি শ্রীগৌরেন্দ্রব্রহ্মর্ষি বিরচিত।

জাগ্‌তি—জাগরণশীল, চৈতন্যময়।
গুরুগৌরীসুত—শ্রীগণেশ।
বিষয়—৩৬ প্রকার, বেদ—৪, গ্রহ—৯, ভূমি—১
বিষয়+বেদ+গ্রহ+ভূমি—৫০
শ্বাসা—মোহজাল।

নামনামী অভেদ।

গুরু আনুগত্য ব্যতীত কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া, অথবা অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধি থাকিলেও কখন সাধ্য-সাধন বস্তুর নির্ণয় করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র এই জন্যই গুরু আনুগত্যের এত প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। শুধু কেবল মাত্র গুরুমন্ত্রটি কর্ণে গেলেই যে, সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন বা সর্ব্বার্থ লাভ হইয়া গেল এমন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু-উপদেশ-অনুযায়ী কর্ম্ম ব্যতিরেকে কখনই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারা যায় না। এই গুরু আনুগত্য গ্রহণ না করিয়া, সাধ্য-সাধন তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়া এবং তদ্বিষয়ক অনুশীলন করিয়া পরিশেষে অনেকে নাস্তিকতাই লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু অতি সামান্য মাত্র জ্ঞান থাকিলেও, এক মাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই তদীয় উপদেশানুসারে অভিলষিত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজসাহির অন্তর্গত রামপুর গ্রাম নিবাসী তপনানন্দ মিশ্র একজন অসাধারণ পণ্ডিত, এমন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত গুরু অভাবে তিনি কোন বিষয়ই সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। "শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়াই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য"—এই বিষয় সর্ব্বদাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল; মন ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, একদিন রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখিলেন।

"অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে প্রভাতে পদ্মানদীর কূলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

এই স্বপ্ন দর্শনান্তে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অতি কষ্টে সপ্তাহ-কাল অতিবাহিত করিলেন।

তপনানন্দ পদ্মানদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিছুক্ষণ পরেই মহা-ভাগবৎ লক্ষণসম্পন্ন এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। সেই অলোকসামান্য রূপ দেখিয়াই তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, কোন কথা না বলিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তপনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—

সাধ্য সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥

বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কেমনে জুড়াই প্রাণ কহ দয়াময়॥

প্রভু! আমি স্বপ্রাবিষ্ট হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপন বুদ্ধিতে এতদিন জগৎপিতা হইতে দূরেই আসিয়া পড়িয়াছি। আমার এক্ষণে উপায় কি? তখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কহিতেছেন,—

নামী-নামে ভেদ নাই তাই বলি অবিরাম,
কুটিনাটি পরিহরি জপ কর সদা নাম।
ভক্তি-লাভ হবে নামে, সে ভক্তির পরিণাম,
প্রেম,—সে প্রেমেতে কৃষ্ণ, তাই বলি জপ নাম।

তদ্বিষয়ক শাস্ত্র প্রমাণ।

যথা,—

নাম্না চ লভ্যতে ভক্তি স্তক্ত্যা চ প্রেম লভ্যতে।
প্রেম্না গোবিন্দলাভস্যাৎ অতো নাম পরং নহি॥

মহাপ্রভু আরও বলিলেন,—

আর এক উপদেশ শুন সাবধানে,
জ্ঞান-বুদ্ধি বাক্যে যাঁর না পাও সন্ধানে।
তাঁর তরে বিচার বিতর্ক নাহি ক'রে,
দয়া কর ব'লে সদা কাঁদিবে কাতরে।
বিশেষ বলিনু এই বিচার ক'রো না;
রোদন ব্যতীত কভু শ্রীপদ মিলে না॥

শ্রীনিতাই চাঁদ শীল।
ফিয়ার লেন, কলিকাতা।

আমারে ক'রো না উদাসী।

সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী,
তুমি, আমারে ক'রোনা উদাসী।
গাহে পাখী বনে,
প্রভাত গগনে—
ঐ যে অরুণ হাসি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
অনিমিষে আমি চাহি কতবার,
ফুটে যবে ধীরে কিরণ উষার,
সান্ধ্য-গগনে তেমনি আবার
ছড়ান কনক রাশি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
ভোর বেলা নিতি ঘুম থেকে টেনে,
পুনঃ যেন নব-জীবন দানে,
কে যেন ছুটায় পবন গহনে—
করম ক্ষেত্রে আসি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
পাতায় ঘোমটা টানি' দিয়া মুখে,
কাঁপে ফুল ঐ কানন বুকে,
ছড়ায় গন্ধ থেকে থেকে থেকে—
মৃদুল মলয়ে ভাসি'।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।
জীবন আমার নহেত স্বপন,
চিরদিন আমি নিত্য নূতন,
কি কায সাধিতে কোন প্রয়োজন,
বুঝেছি কেন বা আসি।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।

সন্ধ্যা যখন পড়িবে হেলে,
আমার সুখের মরণ কোলে,
কোন্ ফাঁকে আমি যাইব চলে,
রাখিয়া সাধের বাঁশী।
সখা, আমারে ক'রোনা উদাসী।

শ্রীহ (নাটোর)

বিবিধ।

স্বরূপ স্মরণ] রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় শ্রীসীতাদেবী স্বয়ং অগ্নি গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া, অপহরণের জন্য আপন ছায়া-মূর্ত্তি পর্ণ-কুটীরে রাখিয়াছিলেন। পরে যথা সময়ে রাবণ-বিনাশের পর ছায়া সীতা পরীক্ষাচ্ছলে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, এবং অগ্নি হইতে প্রকৃত সীতার উদ্ধার হইয়াছিল।

ইহা অধ্যাত্ম-রামায়ণের কথা। অধ্যাত্ম-রামায়ণ কি জান? অধিষ্ঠাতা আত্মরামের কথাকেই অধ্যাত্ম-রামায়ণ বলে। তোমার আত্মরূপী রামের আজ্ঞায় তুমি তোমাকে ছায়াময়ী করিয়া কামরূপ রাবণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ; আর প্রকৃত তুমি প্রকৃত নিষ্কাম প্রকৃতি আত্মরামের চিরসঙ্গিনী। জ্যোতিরভ্যন্তরে যেখানে আত্মরাম সর্ব্বদা বিহার করেন সেইখানেই প্রকৃত তুমি রহিয়াছ। তাই বলি সর্ব্বদা মনে রাখিবে এই দেহরূপ আকাশ-কানন তোমার সুখের নহে, কেবল রাম ভুলাইবার উপকরণ মাত্র। ইহা বুঝিয়া প্রতিদিন জ্যোতিরভ্যন্তরে উপস্থিত হইবার জন্য এই ছায়া-মূর্ত্তি ভূত-শুদ্ধির বহ্নি-যোগ দগ্ধ কর চিত্তশুদ্ধি-ময় বিশুদ্ধ বেশ ধারণ কর, দেখিবে তোমার আত্মরাম সর্ব্বদা তোমাকে ওতপ্রোত ভাবে আলিঙ্গন করিয়াই আছেন, তাহারই কোলে ঘুমাইয়া তুমি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলে, স্বপ্নভঙ্গে স্বামিক্রোড়-সুপ্তা সতীর মত তোমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে।

সহঃ সম্পা
৺কাশীধাম।

উৎসব

আত্মারামায় নমঃ।

অন্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।]　　১৩১৯ সাল, পৌষ ও মাঘ।　　[৯ম ১০ম সংখ্যা।

"সত্যং পরং ধীমহি।"

পরমেশ্বর তুমি। তুমিই আবার হৃদয়েশ্বর। রাজার রাজা তুমি। তুমিই আবার হৃদয়ের রাজা। সকল হৃদয়ের রাজা তুমি। ধনী দরিদ্র, বৃহৎ ক্ষুদ্র, যেখানে যে আছে যত বড় হউক বা যত ছোট হউক—কাহারও বিলাপ করিবার কিছু নাই—কাহারও বলিবার নাই যে তুমি আমার প্রাণেশ্বর নও। আর আমি! অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণিত, শতবার প্রতিজ্ঞা করি শতবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। শতবার বলি আর অপরাধ করিব না, শতবার কর্ম্মদুরাচার হইয়া পড়ি। শতদুঃখে জর্জ্জরিত অনন্ত পদস্খলনে অনুতপ্ত—রাজার রাজা তুমি তোমাকেও আমি বলিতে পারিব আমার তুমি? স্বামীগৃহ হইতে যে বাহির হইয়া গিয়াছে, যে শতশতবার ব্যভিচার করিতেছে সেও কি আজ সতীস্ত্রীর মত বলিতে পারিবে আমার প্রাণেশ্বর তুমি?

বুঝি পারে বলিতে। তুমি যে ক্ষমাসার। তুমি সাধুর সাধু। তুমি যে ক্ষমা কর। করিয়া আবার তোমার করিয়া লও। এই ত সাহস। এই ত ভরসা। তবে এস পাপীতাপী একবার নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া, নিজের ব্যভিচার স্বীকার করিয়া—আর বেশ্যাবৃত্তি করিব না বলিয়া, ক্ষমা চাই। আর ইন্দ্রিয় সুখকে সুখ বলিব না বলিয়া, আর ক্ষণিক সুখকে সুখ না

ভাবিয়া—ইন্দ্রিয়ারাম হওয়াই যে আত্মারামকে ত্যাগ করা ইহা স্থির জানিয়া—একবার তাঁহারে জানাই, তাঁহারই কাছে শক্তি চাই। চাহিয়া একবার সেই স্বামীর স্বামীকে দেখি একবার সেই রাজার রাজাকে হৃদয়ের রাজা বলিয়া ভালবাসি, একবার সব অভিলাষ ছাড়িয়া সেই চরণের অভিলাষ করি, একবার অন্য কাঙ্গালিনী না হইয়া কেবল কৃষ্ণকাঙ্গালিনী হইয়া তারে দেখি।

আহা কেমন তুমি! তুমি ঈপ্সিততম, তুমি দয়িত তুমি রমণীয়দর্শন। তুমিই বিশ্বব্যাপী, তুমিই বিষ্ণু তুমিই আমার ভিতরে তুমিই আমার বাহিরে। তুমি সর্ব্বস্থানে উদয় হইতে পার। পটের ছবিতেও তুমি, মাটির ঠাকুরেও তুমি, অনলে অনিলেও তুমি, আকারেও তুমি নিরাকারেও তুমি, তুমি বড় সুন্দর, তুমি অতি মনোহর।

আহা কেমন তুমি! কেমন করিয়া বলিব? তুমি আপন মহিমায় আপনি মহিমান্বিত, তুমি আপন গরবে আপনি দাঁড়াইয়া আছ। তোমার কাছে কাহারও কুহক খাটে না। যে মায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশকেও কুহকে ফেলে, সেই মায়ার সমস্ত কুহক তুমি নিরস্ত করিয়া আপন সত্যস্বরূপে, আপন পরমরূপে, তুমি আপনিই আপনি। তাই ঋষিরা বলেন ধীমহেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি। তুমি একবার চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে এস। তুমি ত অনেকের কাছে আসিয়াছ অনেক মূর্ত্তিতে আসিয়াছ, একবার এস। এই যে প্রাণশূন্য মূর্ত্তি—তুমি এস, আসিলেই ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। এস, আসিয়া জানাইয়া দাও তুমি আসিয়াছ। একটিবার দেখা দাও—দিয়া আমাকে চিরতরে দাসী করিয়া দিয়া যাও। আর তোমায় কিছুই বলিব না।

তুমি আর দ্বিতীয়বার না আসিলেও আমি তোমার জন্য প্রায়ক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, সুখ দুঃখ সমস্ত ভুগিব—তোমার জন্য সকল চক্ষুর অন্তরালে গিয়া কাঁদিব। কাহাকেও আর কিছু বলিব না—কাহাকেও আর মন্দ ভাবিব না—কিছুই ভাবিব না।

কবে আসিবে? কবে আমায় দেখা দিবার মতন করিবে? আমি প্রলাপ বকিতেছি। তুমি কি আসিবে? আছই ত। দেখা কি দিবে? সে তুমিই জান। আমাকে আশা দাও। আমি তোমার অপেক্ষায় রহিলাম।

পাওয়া।

১। বিশ্বাসে পাওয়া। ৩। ভাবে পাওয়া।
২। কর্ম্মে পাওয়া। ৪। সত্যে পাওয়া।

১। বিশ্বাসে পাওয়া : তুমি সর্ব্বত্র আছ এই বিশ্বাস আসিল কিরূপে? এই বিশ্বাসের মূল শ্রুতি। যুক্তি দ্বারাও শ্রুতির সত্যতা প্রমাণ হয়।

শ্রুতি বলেন একমাত্র তুমিই সত্য অন্য সমস্ত মিথ্যা। শ্রুতি আশ্রয়ে ভাগবত বলেন ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইয়াও যে সত্যমত দেখায় সে কেবল মূলে তুমি আছ বলিয়া। যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।

একমাত্র সত্যস্বরূপ তুমি সকলের মূলে আছ কোন্ প্রমাণে ইহা জানা যায়?

আমার কাছে যে জগৎটা আছে ইহা কোন্ প্রমাণে জানা যায়? না এটা আমার অনুভবে পাই—ইহাই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ। যখন ইহার অনুভব থাকে না তখন বলি ইহা নাই। তবে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে হইলে তাহা কাহারও অনুভবে পাওয়া চাই। কাহারও অনুভবে নাই এমন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে বা অতল সমুদ্রতলে যদি কিছু থাকে তবে তাহা কাহার অনুভব আছে?

তোমার আমার অনুভব সেখানে না থাকিতে পারে; কিন্তু যখন বলিতেছ তাহা আছে তখন কাহারও অনুভবে উহারা আছে। বিনা অনুভবে কাহারও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই জন্য বলা যায় যখন জগৎ আছে বলিতেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছি যে তুমি মূলে আছ বলিয়া মিথ্যা জগৎও সত্যমত দেখাইতেছে। তুমি সর্ব্বত্র আছ ইহার একটা যুক্তি দেওয়া গেল। আরও কত যুক্তি কত লোক দিতে পারেন।

আচ্ছা মনে করা হউক তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে আছ। যে যুক্তি জানে না সে যেন ইহা বিশ্বাস করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার লাভ কি?

যাহা বিশ্বাস করিল তাহার ব্যবহার করুক—তবেই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে তাঁরে স্মরণ রাখিতে পারিবে। একবারও তাঁরে ভুল হইবে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ভাল করিয়া বল।

শ্রবণ কর। মনে কর সম্মুখে এই নারিকেল গাছটি তুমি দেখিতেছ।

গাছটি দেখিয়া তুমি ভাবিতেছ তুমি আছ তাই গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। তুমি গাছটিকে দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ, জানিতেছ; কিন্তু বৃক্ষটি তোমায় দেখিতেছে না, অনুভব করিতেছে না, জানিতেছে না। তুমি সকলকে জানিতেছ, তোমায় কেহ জানিতেছে না।

আচ্ছা গাছটি ত তোমাকে অনুভব করিতেছে না। কিন্তু তুমি ত গাছকে অনুভব করিতেছ। আর আমিও ত গাছকে অনুভব করি। সব সময়ে অনুভব করি না সত্য কিন্তু যখন এখানে আসি, যখন দেখি, তখন ত অনুভব করি। গাছকে তবে এক সঙ্গে তুমি আমি উভয়েই অনুভব করি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে আমার অনুভবে গাছের যে অস্তিত্ব আছে আর তোমার অনুভবে গাছের যে অস্তিত্ব, এই দুই অস্তিত্ব—কি এক প্রকার না ভিন্ন ভিন্ন?

যাহার জ্ঞান যেরূপ তাহার অনুভবও সেইরূপ। তুমি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ কাজেই তুমি সমস্তই জানিতেছ, আমি সকল বিষয় জানি না কাজেই গাছের যেটুকু জানি বা আমার ইন্দ্রিয় জানে আমি সেটুকুই অনুভব করি।

তুমি সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে সমস্ত বস্তু জান আমি দর্শনকালে আমার ভাবে জানি—এই পার্থক্য।

প্রেমিক যেমন পৌর্ণমাসী রজনীতে চাঁদ পানে চাহিয়া চাহিয়া পিয়ার মুখ মনে ভাবিয়া বলে—হে চন্দ্র! আমিও যেমন তোমায় দেখিতেছি সেও তেমনি তোমায় দেখিতেছে, তোমাতে আমাদের চারি চক্ষু মিলিত হইয়াছে, তুমি তাহা দেখিতেছ, আমিও তাহা দেখিতে পাই না, সেও তাহা দেখিতে পায় না। তাই আমরা এত জ্বলিতেছি। তুমি তোমার শীতল করে তাহাকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ কর, আবার আমাকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে স্পর্শ কর, তবে তোমার সাহায্যে আমরা, উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল হইব; ভক্তও সেইরূপ যদি বলিতে পারেন—হে বৃক্ষ! যাহার অনুভবে তুমি সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া আছ, আর আমার এই ক্ষণিক অনুভব যে সেই অনুভব সমষ্টির এক কণা মাত্র, আমাকে এইটি যদি তুমি দেখাইয়া দাও তবে আমার বিন্দুপরিমাণ অনুভবকে সেই অনুভব-সিন্ধুতে একবার নিমজ্জিত করিয়া দেখি কি হয়? একবার দেখি এইরূপ করিলে তাহার কোন সংবাদ মিলে কি না?

প্রতি বস্তু দর্শনে বা প্রতিবাক্য শ্রবণে বা প্রতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে যদি এইরূপ একটা চিন্তা আইসে আর অন্য চিন্তা না আইসে তবে ত সর্ব্বদাই

তোমাকে মনে রাখা যায়। বিশ্বাসে পাওয়া তাহাই যাহাতে সর্ব্বদাই ঈশ্বরচিন্তা লইয়া থাকা যাইতে পারে। তুমি ত সর্ব্বদা সকল বস্তুকে দেখিতেছ,ইহারা তোমায় কিন্তু দেখিতে পাইতেছে না—এই ভাবে বিশ্বাসে পাওয়ার কথা বলা গেল। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ফুলফল আবার আকাশ, বায়ু, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, নদী, তরঙ্গ, জল, অগ্নি, পৃথিবী এই সমস্ত দেখিয়া যখন পূর্ব্বের মত ভাবনা সর্ব্বদা চলে তখন বিশ্বাসে পাওয়ার ফল হয়।

(২) কর্ম্মে পাওয়া। বিশ্বাসে পাওয়াটি সর্ব্বদা থাকে না, যদি তাহার সহিত কর্ম্মে পাওয়াটি না থাকে। মোটা কথায়—যাহা ভাবি, যাহা বলি, যাহা করি তাহাতে যদি তোমার ভাবনা না থাকে কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত সময়ে গাছ দেখিয়া তোমায় ভাবনা হয় মাত্র ইহাতে কিন্তু একপ্রবাহ থাকিবে না।

কর্ম্মে পাওয়া বলে তাহাকে যখন প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যকথন পূর্ব্বে, এবং কখনও বাক্যকথন সময়ে এবং হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম করিবার সময়ে, যখন ভাবনা, বাক্যকথন ও হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম—সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিয়া করা হয়, সর্ব্বকর্ম্ম তোমার অনুমতি লইয়া করা হয়—তোমার প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া করা হয়—যখন আর কোন কর্ম্মকালে—ভাবনায় বাক্যে বা কর্ম্মে একবারের জন্যও তোমায় ভুল হয় না তখন কর্ম্মে তোমায় পাওয়া হইল।

(৩) ভাবে পাওয়া। বিশ্বাসে পাওয়া ও কর্ম্মে পাওয়া ইহাতে যদিও তোমার স্বরূপ কিছুই জানা গেল না; কেবল বিশ্বাস করা হইল তুমি সর্ব্ব-ব্যাপী, তুমি সমস্তই জান, তুমি সমস্তই করিতে পার, আমায় দেখাও দিতে পার। যাহা কিছু আমার করার থাকে—কি ভাবনা কি বাক্য কি হাতে পায়ে কর্ম্ম, এই সমস্ত তোমাকে জানাইয়া করিলে ভাব হয়। তোমাকে জানাইলেই কেমন একটা ভাব যেন আইসে, এই ভাবে বড় আনন্দ হয়। সতীস্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করিতে পারে না—ব্যভিচারিণী হইবার ভয়ে নিজের ভাবনা পর্য্যন্ত স্বামীর গোচর করিতে চায়, ভক্তও সেইরূপ সকল ভাবনা, সকল কথা, সকল কার্য্য, তাহাকে জানাইয়া করিতে করিতে সর্ব্বদা তাহার একটা সঙ্গ লাভ করে সেই সহবাসে একটা সুখ হয়। ক্রমে এই সুখ ঘনীভূত হইলে উভয়ে উভয়ের সঙ্গ করিয়া, উভয়ে উভয়ের সহিত কথা কহিয়া এক অতিশয় সুখ পাওয়া যায়; তাহাই ভাবে পাওয়া।

(৪) সত্যে পাওয়া। ভাবে পাওয়াটা ঘনীভূত হইলে সত্যসত্যই পাওয়া

যাহার নাম তাহাই হয়। ইহা নিজ বোধরূপ। এ সম্বন্ধে বলাটা "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ" র অধিক কি।

হিন্দুশাস্ত্রে তন্ত্রমত।

(কোন রাণীর লেখা)

[আমরা তন্ত্র সম্বন্ধে যে লেখাটি প্রকাশ করিতেছি তাহা একজন স্ত্রীলোকের লেখা। তিনি কুলবধূ—বড় ঘরের মেয়ে—রাণী। রাণী হইয়াও নিতান্ত কঠোরতা অবলম্বনে সাধনা করেন। আজকাল সমাজে ইহা বিরল। কোন প্রকারে লেখাটি আমাদের হস্তগত হয়। যিনি লিখিয়াছেন তিনি যদি উৎসবে এই লেখা না দেখেন তবে তাঁহার লেখা যে প্রকাশ হইল, তাহা তিনিও জানিবেন না। অনেক সাধক পণ্ডিতের লেখায় আমরা এরূপ শাস্ত্র সমন্বয় দেখি নাই। অথচ যিনি পূর্ণমাত্রায় অন্তঃপুরচারিণী এ লেখাটি তাঁহার]

নমঃ বিশ্বগুরবে॥

"ঋষিগণ সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তন্ত্রেরও তাহাই অভিমত; [তবে] তন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে উহা কোন জাতি বা সমাজ বিশেষের বা বর্ণ-বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উহাতে মানব জাতি মাত্রেরই ব্রহ্ম প্রাপ্তির পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

তন্ত্রমতে যাঁহারা গুরুমুখে দীক্ষা ও উপদেশ পাইয়া ব্রহ্ম-বিদ্যা সাধনপূর্ব্বক নির্দ্বিনাত্ত করিয়া থাকেন তাঁহারা স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন অথবা যে কোন জাতিই হউন, তাঁহাদের পার্থিব স্ত্রীপুরুষাদি ভেদ, স্থূল দেহাভিমান এবং জাতি বর্ণ অভিমানাদি (কিছু থাকে না) সমস্ত অভিমানাদি রহিত হইয়া তাঁহারা এক নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। ঐভাবযুক্ত ব্যক্তিকে "শিব" বলা যায়।

তন্ত্রের চরম জ্ঞান শিবোহহং এবং প্রার্থনীয় (লক্ষ্য) পরামুক্তি বা মোক্ষ। উহা হওয়া সাধন সাপেক্ষ। চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তিই সমস্ত সাধনার মূল সোপান। তবে উহা কেবল কঠোরতা দ্বারা হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-যোগের আবশ্যক হয়। পূর্ব্বকালে যাঁহারা গুরুগৃহে ছাত্রাবস্থায় থাকিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতেন তাঁহারা সকলেই "ভক্ত" ছিলেন; গুরুই তাঁহাদের উপাস্য ছিল।

গুরুভক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া গুরুর মধ্য দিয়া তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেন। তন্ত্রেও সেই গুরুভক্তি করিবারই উপদেশ আছে। ইহা প্রথমাবস্থা। এই প্রথমাবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাকে পাশব কর্ম বা পশ্বাচার বলে। পশ্বাচার প্রথমে অবলম্বন না করিলে কোন আচারই স্থির বা সংযত ভাবে আচরিত হয় না। এবং চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই হেতু ভক্তিযোগ বিশিষ্ট হইয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করিয়া পশ্বাচারে গুরুর উপদেশমতই চলিতে হয়।

তৎপরে গৃহস্থ হইবার ইচ্ছা হইলে যিনি উক্ত পশুভাবে শ্রদ্ধাশীল তিনি ঐ নিয়মে থাকিয়া ভক্তিপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস ও যবন হরিদাস প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় পশ্বাচারী হইয়া কঠোর ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দিব্যাচারে প্রবেশ লাভ করিয়া ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা পশ্বাচার কঠোরতা পালনে অক্ষম তাঁহারা স্মৃতি-মত বিধিতে পশু ও বীর মিশ্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুবাক্য অনুসারে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যাঁহারা যোদ্ধা তাঁহারা কেবল বীরভাব ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সিদ্ধ। অথবা যাঁহারা একেবারে সংসার বা ইহজগৎকে অস্বীকার করেন তাঁহারাও কেবল জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হন।

দিব্যভাবই চরমভাব। যে আচারই অবলম্বন করা হউক শেষে চিত্তনির্ম্মল হইয়া দিব্যাচারে প্রবেশ না করিলে ফলোদয় নাই। এবং অভক্তের বা অবিশ্বাসীর কোন আচার অবলম্বনেই উপকার হয় না। ভক্তি বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সদ্‌গুরুই তান্ত্রিক বা বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি দিতে পারেন। তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রের সকল বিধিরই চরমফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। বিশেষ এই—ভক্ত ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে পান আর জ্ঞানী নিজ ও পর প্রত্যেকের আত্মাতেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার দর্শন প্রাপ্ত হন। ফল কথা গীতাতে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহাই সারতম। বিবিধ শাস্ত্রের বিবিধ প্রকার পন্থা। প্রত্যেকেরই মূলতত্ত্ব ভক্তি, বিশ্বাস ও ভগবানকে আত্মসমর্পণ করা। অধিকারী ভেদে ও অবস্থা ভেদে ক্রিয়া ভেদ হইয়া থাকে। তন্ত্রেও বিবিধপ্রকার ক্রিয়া অনুসারে বিবিধ প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাগযজ্ঞাদি এবং ব্রতাদিতে পুণ্য ও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাধনপথ ছাড়া মোক্ষ হয় না।

পুনশ্চ :—তন্ত্রমতে যতক্ষণ জীব ও ব্রহ্ম এই ভেদজ্ঞানের অনুভব থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে কোন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন পথে থাকিতে হইবে। যখন জীব ও ব্রহ্ম অভেদ অনুভব হইয়া প্রতিবস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে সেই অবস্থাকে দিব্যভাব বলে। দিব্যভাবে সিদ্ধি হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয় এবং ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া এক অখণ্ড ভাব প্রাপ্ত হন। ভক্ত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের ভাব লইয়া সেই জ্ঞানে ভগবানকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভগবানের মধ্যেই বিশ্বদর্শন করেন। এবং জ্ঞানীগণ "সোঽহং" এই মহাবাক্যের ভাব লইয়া নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ভগবদ্দর্শন পাইয়া থাকেন।

ভক্তেরাও জ্ঞানী, জ্ঞানীরাও ভক্ত। জ্ঞানীগণ প্রথমে জ্ঞানপথ ধরিয়া হন জ্ঞানী এবং ভক্তগণ প্রথমে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া পরে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। ভক্ত ভগবানের মধ্যেই জগৎ ও জ্ঞানী জগতের মধ্যে ভগবানদর্শন করিয়া থকেন এই পার্থক্য। তন্ত্র এই দুইয়ের এক পন্থা লইয়া ভগবানের বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া লয় হইতে বলেন।

উতলা।

হিয়া মাঝে কার যেন বাঁশী শোনা যায়।
কে যেন গভীর সুরে—
ডাকিছে হৃদয়-পুরে,
আকুল প্রেমের ভাবে—"আয় সখী আয়"।
গৃহকাজে আনমনা—সখির পরাণ;
বসি হৃদি-উপকূলে—
মন-কদম্বের মূলে,
কে গো সে বাজায় বাঁশী হরষে গোপাণ!
ঘন ডাকে মন বাঁশী—"বেলা বহে যায়"।

কেমনে যাইব কাছে,
কর্ম্ম-বন্ধ টানে পাছে ;
শত বাধা পায় পায় জড়াইয়া যায়।
পথের রেখাটী ওই দ্রুত মুছে যায়।
আঁধারিয়া আসে নিশি,
কেমনে পাইব দিশি !
উদাসী পরাণ যে গো করে—হায় ! হায় !
বাজায়ে মোহন বাঁশী পথপানে চায়—
হৃদয় কুটীরে রাধা
প্রাণ বাঁধা মন বাঁধা,
বাঁশীও বলেছে ডেকে বেলা বহে যায় !
সারাটী পরাণ সখি ! কেড়ে নিতে চায় !
সে কি মানে কুল-লাজ—
সে বোঝে না গৃহকাজ,
সেতো জানে হিয়া তারি চরণে লুটায় !
তারো কি সহেনা কাল—বেলা বহে যায় !

মৃঃ—

উপাসনা-তত্ত্ব।

(১)

উপাসনা করা কি ঠিক ? লোকে বলে খোসামুদি।
সর্ব্বদা ছুটিয়া বেড়ান কি ঠিক ?
সর্ব্বদা ছুটিয়া বেড়াইতে ত কেহই পারে না।
না পারিয়া কি করে ?
বসিতে চায় ; বিশ্রাম করিতে চায়।
ছুটিয়া বেড়ান ও বসা বা বিশ্রাম করা উভয়েই তবে স্বাভাবিক।
নিশ্চয়ই।

উপাসনাও তবে স্বাভাবিক।

উপাসনা কি তবে বসা বা বিশ্রাম করা ?

তা ছাড়া আর কি ? পরমশান্ত পরমরমণীয় যিনি তাঁহার সমীপে বসা বা বিশ্রাম করাই উপাসনা। সেই পরম-রমণীয়দর্শনের সমীপে বসিতে বসিতে তাঁহাকে ছুঁইতে ইচ্ছা করে। চুম্বকের সমীপে লৌহ আনীত হইলেই যেমন চুম্বক লৌহকে টানিয়া লয়, সেইরূপ সেই রমণীয়দর্শনের সমীপে বসিতে পারিলে তিনি এমন আকর্ষণ করেন যাঁহাতে তাঁহাকে স্পর্শ করা হইয়া যায়; হইয়া গেলে তিনি যেমন শান্ত সেই শান্তভাবে স্থিতিলাভ করাও হইয়া যায়।

উপাসনা তবে সমীপে বিশ্রাম এবং স্বরূপে স্থিতি ?

হাঁ উপাসনার এই দুই অর্থ। (১) উপ-সমীপে, আসন-বসা বা স্থিতি। (২) ক্রমে যখন সমীপ আর থাকে না তখন একেই যে স্থিতি, আপনি আপনি ভাবে যে স্থিতি তাহাই উপাসনার শেষ অর্থ, শেষ ফল।

(২)

কাহার উপাসনা করা উচিত ?

প্রতি ছুটিয়া বেড়ানার কোলে কোলে যে বিশ্রাম আছে, প্রতি কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে অকর্ম্ম বা বিশ্রাম আছে সেই বিশ্রামটি ধরিতে পারিলে সেই বিশ্রাম যে চিরশান্ত জ্ঞানময় আনন্দময় পরমবিশ্রামকে দেখাইয়া দেয় সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপের উপাসনাই কর্ত্তব্য।

আমরা কি ইঁহারই উপাসনা করি ?

হাঁ যিনি জলে স্থলে; অনলে অনিলে; যিনি অম্বরে অবনীতলে; যিনি সর্ব্বব্যাপী; পরম শান্তিই যাঁহার স্বভাব; যাঁহার পরমপদ সতত গমনশালিনী স্পন্দনাত্মিকা এক পরমাশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত; সর্ব্বগতির ভিতরে যে পরম স্থিতি, আমরা তাহা ধরিয়াই সেই চরমস্থিতির উপাসনা করি।

এই স্থিতির নাম কি ?

শুধু স্থিতির কোন নাম নাই। তবে গতিজড়িত স্থিতির, শক্তিজড়িত মঙ্গলময়ের—পরমশিবের প্রিয় নাম প্রণব, ওঁকার।

আমরা কি ওঁকারের উপাসনা করি ?

হাঁ। আমরা "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—সেই পরমশান্ত সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু-নামাখ্য পরমমঙ্গলময়ের পরমপদ যাহা তাহারই উপাসনা করি।

সকল ভাল লোকে কি ইঁহারই উপাসনা করেন ?

হাঁ—সদা পঙক্তি সুরয়ঃ। যাঁহারা সুর—যাঁহারা দেবতা—যাঁহারা বাহুবলের উপরেও চিত্তজয়রূপ যে পরমবল আছে সেই বলে বলশালী, যাঁহারা ষড়্রিপু জয়জনিত পরমবলে বলীয়ান্, যাঁহারা মন ইন্দ্রিয়াদি অসুর জয় করিয়া সুর হইয়াছেন, যাঁহারা প্রাণজয়ে প্রকৃত সুর, সেই সুরেরা সেই তত্ত্বজ্ঞানিগণ যাঁহাকে প্রতিনিয়ত দর্শন করেন; সুরগণ যাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তৎকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া তাঁহার পরমপদে স্থিতিলাভ করেন, আমরা সুরদিগের প্রদর্শিত ওঁকার নামাখ্য মায়াজড়িত ব্রহ্ম, গতিজড়িত পরমস্থিতির উপাসনা করি। চরম লক্ষ্য জ্ঞানানন্দে পরমস্থিতি।

সর্ব্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণুর পরমপদের সমীপে উপবেশন করিতে হইলে কি করিতে হয় ?

ওঁকারই সেই পরমপদ। যে মহাশক্তির খেলায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতেছে —অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে বিন্দুস্থানে উঠিয়া উঠিয়া, স্থিতিলাভ করিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে; যে প্রবণরূপ মায়াশবলিত সগুণব্রহ্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিজড়িত, যাঁহার অঙ্গে অ উ ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত, যে ওঁকারের মধ্যে সেই পরমপদের বিন্দুস্থানে প্রকৃতিপুরুষজড়িত অর্দ্ধনারীশ্বররূপী পরম দেবতা সদা বিরাজিত, ষড়্চক্রের শেষ চক্রের ভিতরে ওঁকাররূপী সগুণব্রহ্মের শিরোভাগে যে বিন্দু, যে বিন্দু সেই পরমপদে প্রবেশ করাইতে সমর্থ, যে বিন্দুতে পৌঁছিলে মায়ার তরঙ্গ আর বিমোহিত করিতে পারে না, আমরা সেই পরমপদের উপাসনা করি।

(৩)

কিরূপ সাধনায় এই উপাসনা বা সমীপস্থিতি ও আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হয়।

সমীপস্থিতিই ভক্তিমার্গ এবং আপনি আপনি স্থিতিই জ্ঞানমার্গ।

উপাসনা-তত্ত্বে এই দুই মার্গের কথা বলিয়া আমার চিরতরে তোমায় কর, এই আমার—

এই তোমার চিরসাধ। যতদূর সরল ভাবে বলা যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ—

আস্তিক ও নাস্তিক।

আস্তিক—ঈশ্বর আছেন, তিনি জীবকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন—বলেন তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ—বলেন সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব, ইত্যাদি বাক্যে আমার প্রাণ ভরিয়া যায়, আমি বড় আনন্দ পাই।

শ্রুতি যখন অমরত্বের কথা বলেন তখন "বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি" "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" যে কৈবল্যের নাম মুক্তি, যে কেবল ভাবে থাকার নাম আপনি, আপনি আপনি ভাবে স্থিতির নাম মুক্তি—মৃত্যু অতিক্রম করা—এই অমরত্বের কথা আমার বড় ভাল লাগে। [যাহারা পরকাল মানে না শাস্ত্রমতে তাহারাই নাস্তিক। আমরা সাধারণ অর্থই আলোচনা করিতেছি।

নাস্তিক—আমারও লাগে কিন্তু যদি মৃত্যু অতিক্রম করা কথাটা কথার কথা না হইত। শাস্ত্র বলেন বটে "জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" জরামরণ হইতে মুক্তিলাভ যিনি আমার আশ্রয় লাভ করেন—শ্রুতিও বলেন বটে—জ্ঞানলাভে মানুষ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে, কিন্তু জরা আইসে নাই, বৃদ্ধত্ব আইসে নাই এমন সাধকও কই দেখিলাম না। শাস্ত্রে শুনি বটে চির বালক, কখন কোন রোগ নাই; কিন্তু এত সাধক দেখি, কেহ কি ঐ অবস্থায় গিয়াছেন তুমি দেখিয়াছ? যোগীরা বলেন যোগের নানা ব্যাপারে অমর হওয়া যায়, কিন্তু এত লোক যোগ করে অমর হইতেছেন এ চিহ্নও ত কাহাতেও পাই নাই। না পরীক্ষা করিয়া কিরূপে কথাগুলি মানিয়া নি বল।

আস্তিক—বলিতে পার নাস্তিকতার কথায় দুঃখ কেন আইসে?

নাস্তিক—দুঃখ ত কতই হয় কিন্তু হইলে কি করিব বল? তুমিও ত কত শোক পাইয়াছ—কতবার শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়াছ; নিতান্ত প্রাণের বস্তু যাহারা তাহাদিগকে সঙ্কটে পড়িতে দেখিয়া কত তুলসী দেওয়াইছ, কত মৃত্যুঞ্জয় জপ করাইয়াছ, কত স্তব স্তুতি নিজেও করিয়াছ, কত প্রার্থনা করিয়াছ—বল শ্রীভগবান কি তোমার সে কথা শুনিলেন? বল তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিবে? যদি একজন লোককে

তুমি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখ—কাতর হইয়া যদি কেহ তোমার নিকট উদ্ধার কর বলিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করে, তুমি স্থির থাকিতে পার না! আর তিনি? তুমি না হয় সংসারী, তুমি না হয় পামর বিষয়ী, কিন্তু যাঁহারা সংসারে সাধু বলিয়া পরিচিত, শত শত লোকে যাঁহাদের কথা শুনিতে যায়, যাঁহাদের একটু আদর পাইলে লোকে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, যাঁহারা যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী একাধারে সব; বিপদে পড়িয়া রক্ষা জন্য তাঁহাদিগকেও ত ডাক দিয়াছ, কত কাতর হইয়া তাঁহাদেরও শরণাপন্ন হইয়াছ, কিন্তু কি ফল ফলিয়াছে বল? নাস্তিকতায় দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু বল দেখি সাধু, সন্ন্যাসী, ভাল লোক, যে যাহা বলিলেন তাহা করিয়াও তুমি কি মুমূর্ষুর দুঃখ কিছু নিবারণ করিতে পারিয়াছিলে? সকল সাধুই ত তোমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন "মরিবে না" কিন্তু সাধুর কথাও মিথ্যা কেন হইল? এই সমস্ত দেখিয়াও কি বলিতে চাও পরীক্ষা করা উচিত নহে? অবিশ্বাস যে আপনা হইতে আইসে।

আস্তিক—এইরূপ ঈশ্বর অবিশ্বাসী লোক কি অনেক?

নাস্তিক—অনেক বল কি? আজ কাল প্রায় লোকই এইরূপ। আবার ইহার নজীর দেখাইবার পুস্তকও অনেক।

আস্তিক—শাস্ত্রে কি এইরূপ দেখিয়াছ?

নাস্তিক—চার্ব্বাকাদির যুক্তি শাস্ত্র খণ্ডন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মত খণ্ডন করিলে কি হয়—সেই সব মত বহুলোকের হৃদয়ে রাজত্ব করে। কত ইংরাজী পুস্তকে—এবং তাহার অনুবাদ পুস্তকে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস প্রচারিত হইতেছে।

Goethe calls him—the founder of Christianity—Jesus—a Schwarmer, a fanatic; he may much more rightly be called an opportunist. But he is an opportunist of an opposite kind from those who in politics, that wild and dream like trade, of insincerity, give themselves this name.

ম্যাথিউ আরণল্ড গেটে সম্বন্ধে যাহা বলেন অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। W. B. Ronfeldt গেটের জীবনী-লেখক বলেন Goethe continually declares war against the doctrine of self-denial on self-abstinence—that is to say in all cases where no special end is to

be gained thereby—and pronounces false and blasphemous the maxim "All is vanity". ঐ লেখক বলিতেছেন that all is not vanity is indeed almost the substance of Goethe's philosophy অনেক বিষয়ে Mathew Arnold গেটের শিষ্য। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ইঁহার মত এই :— Our religion, parading evidences such as those on which the popular mind relies now; our philosophy pluming itself on reasonings about causation and finite and infinite being; what are they but the shadows and dreams and false show of knowledge? The day will come when we shall wonder at ourselves for having trusted to them, for having taken them seriously; and the more we percieve their hollowness, the more we shall prize the breath and finer spirit of knowledge offered to us by poetry.

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহার মূলে নাস্তিকতা আছে। আমরা Edwin Arnold এর Light of Asia হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাস্তিকতা দেখাইতেছি।

I am like all these men
Who cry upon their gods and are not heard,
Or are not heeded—yet there must be aid!
For them and me and all there must be help!
Perchance the gods have need of help themselves,
Being so feeble that when sad lips cry
They cannot save: I would not let one cry
Whom I could save! How can it be that Brahma
Would make a world and keep it miserable,
Since, if, all-powerful, he leaves it so,
He is not good, and if not powerful, He is not god?

প্রাণ প্রয়াণ সময়ে মানুষের যে অসহ্য যাতনা হয়, তাহা দেখিয়া কোন মানুষই স্থির থাকিতে পারে না। ঈশ্বর তাহা দেখিয়া সাহায্য না করিয়া স্থির থাকেন কিরূপে? অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া যে তোমার শরণ লয়, তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তখনই তুমি তাহার দোষাদোষ বিচার না করিয়া ক্ষমা কর। আর ঈশ্বর?

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি আবার দয়াময়, তিনি অকথ্য, অসহনীয়, যম-যাতনায় অধীর ব্যক্তির কাতর প্রার্থনাও ত শ্রবণ করেন না। ঐরূপ ব্যক্তির জন্য তাহার আত্মীয় স্বজন, বা সাধু সজ্জনের কাতর প্রার্থনাতেও এই পরম করুণাময় পরমেশ্বর কর্ণপাত ত করেন না? ইহাতে কি বুঝা যায়? বলিতে হইবে না কি মৃত্যু যাতনা নিবারণের শক্তি তাঁহার নাই, মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে তিনি পারেন না। অতএব তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন।

অথবা যদি শক্তি থাকিয়াও তিনি দয়া না দেখান, তবে তিনি দয়াময় নহেন, তিনি উত্তম পুরুষও নহেন।

আস্তিক—ভাই নাস্তিক! তোমার কথায় আমি বড়ই ব্যথিত হইতেছি। তুমি মানুষভাবে ঈশ্বরকে বুঝিতে গিয়া যে ভয়ানক বিষ উদ্গীরণ করিতেছ তাহাতে তুমি জগতের অনিষ্টই করিতেছ। তোমার সঙ্গ—

নাস্তিক—সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু আমার নাস্তিকতা খণ্ডন কি তুমি করিতে পার?

আস্তিক—অত্যন্ত কথাঘাত না খাইলে তুমি ফিরিবে না।

নাস্তিক—তুমি ঠিক করিতেছ না। আমিই কি শুধু এই কথা বলিতেছি? চার্ব্বাক, বুদ্ধ সকলেই ত এই শিক্ষা দিয়াছেন।

আস্তিক—সেই জন্যই ত এই কর্ম্মভূমি ভারতে চার্ব্বাক-মতের এবং বৌদ্ধ নাস্তিকতার স্থান হয় নাই। ইহারা ভোগভূমিতে তাড়িত হইয়াছে।

নাস্তিক—তা হউক। তুমি কি ঐ সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধিগম্য বিচার দ্বারা আমাকে বুঝাইতে পার যে, নাস্তিকের অবিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আস্তিক—পারি, শ্রবণ কর। একজন প্রণয়ে আর একজনকে টাকা ধার দেয়। ক্রমে প্রণয় কিছু শীতল হইলে, প্রণয় ফুড়াইয়া গেলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন টাকাটা চাহিল তখন একটা বিরোধ লাগিল। উভয় ব্যক্তিই একই প্রভুর ভৃত্য। প্রথম ব্যক্তি যখন প্রভুর কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ করিল—বল দেখি তুমি যদি সেই প্রভু হও, তুমি কি করিবে?

নাস্তিক—সহজ উত্তর। সকলেই যাহা করে আমিও তাহাই করিব।

আস্তিক—সকলে কি করে?

নাস্তিক—প্রভু বলিবেন যখন টাকা ধার দিয়াছিলে তখন কি আমাকে জানাইয়া দিয়াছিলে? আমি ত শত শত বার বলিতেছি, যে যাহা করিবে আমাকে

জানাইয়া করিও। যদি না কর, তবে তজ্জন্য তোমরা আপন পাপে আপনি বদ্ধ হইবে এবং বিষম যাতনা পাইবে।

আস্তিক—শ্রীভগবান্‌ও সেই ভাবে সতত জীবকে বলিতেছেন—যাহা কর, যাহা ভাবনা কর, আমাকে জানাইয়া কর। যদি জ্ঞানভক্তি এখনও তুমি লাভ করিতে নাও পারিয়া থাক তথাপি বিশ্বাসে সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে উদ্ধার করিবই। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"। "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" শ্রীভগবান্ ত এই সমস্ত আশ্বাস বাক্য দিয়া রাখিয়াছেন, এখনও দিতেছেন; বল তোমার নাস্তিকতার স্থান কোথায়? তুমি বলিতেছিলে তিনি রক্ষা করেন না। পৃথিবীর বিপদ যখন যখন হয় তখন দুষ্টকে দমন করিয়া সাধুকে কে রক্ষা করে? ধ্রুব প্রহ্লাদকে কে রক্ষা করিয়াছিল, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ কে করিয়াছিল, তুমি আজ পর্য্যন্ত জীবনে যত কিছু কদর্য্য কার্য্য করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিয়া কে তোমায় এখনও জীবিত রাখিয়াছেন? ভাই! বৃথা বাক্যে ফল নাই। তুমি শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত ভক্তি-যোগ ও তাহার ব্যাখ্যা অগ্রে পড়িয়া আইস। পরে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তবে আবার কথাবার্ত্তা কওয়া যাইবে।

ভুলিয়া যাওয়া ভাল না নিত্য স্মরণ ভাল?

পতিপ্রাণা বিধবার বিস্মরণ প্রয়োজন না সর্ব্বদা স্মরণ প্রয়োজন?

ভুলে যাও। হাড় মাস চিন্তায় কি হইবে? ঈশ্বরচিন্তা কর শান্তি পাইবে।

ভুলিতে ত পারি না। জীবনের উজ্জ্বল সময়ে যাহা যাহা করিয়াছি তাহাই যে তাহার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। আমি যখন কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া থাকি তবে মনে হয় সে যেন আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একান্ত ভালবাসিত। আমাকে কতবার একান্তে লইয়া একান্তের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিয়াছে। বায়ু স্পর্শ করিলে মনে হয় সেই স্পর্শ করিল। আকাশ দেখিয়া তাহাকে মনে হয়—অগ্নি দেখিয়া, সূর্য্য দেখিয়া, যেন সে তাহাদের মধ্যে লুকিয়া রহিয়াছে, মনে হয়—সে যে আমায় শিখাইয়াছিল সূর্য্য, অগ্নি,

ভ্রূমধ্য, হৃদয়পদ্ম এই সকল স্থানে তাহাকে ধ্যান করিবে। আমি ভুলিব কিরূপে? সে যখন কোথাও যাইত, তখন আমি তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম—কাহারও পায়ের শব্দ হইলে সে আসিল বলিয়া ছুটিয়া যাইতাম। এখন সে নাই, এখনও যে তাই হয়। আমি একা শুইয়া থাকি, মনে হয় সে কাছে শুইয়া আছে। ইহা যে নিত্যই হয়। বিছানা করিতে গেলেই মনে হয় সে শুইবে, তাই ভাল করিয়া শয্যা প্রস্তুত করি—আমার তখন মনে থাকে না যে সে নাই। আহার প্রস্তুত করিতে গেলেও তাই হয়। এই গৃহের প্রতি বস্তুতে সে মিশিয়া রহিয়াছে। আমার পরিচিত জগতের সর্ব্ব-বস্তুতে সে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাকে ভুলিব কিরূপে? তুমি বল হাড় মাস চিন্তা করিয়া কি হইবে? আমি বলি হাড় মাস কি? আকাশে, পর্ব্বতে, সমুদ্রে, পুষ্পে, বৃক্ষে প্রতিমাতে, বায়ুতে, বিদ্যুতে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, তারায় কেনায় সর্ব্বত্র মিশিয়া থাকিতে পারে? এত হাড় মাস নয়। হাড় মাস শ্মশানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। এ যাহা আমি সর্ব্বত্র দেখি তাহা যে মনোময় মূর্ত্তি। ইহা ভুলিব কিরূপে?

আচ্ছা যদি ইহা হয় তবে তুমি ইহাই নিত্য স্মরণ কর। ভুলিও না।

তবে যে তত বড় সাধু আমায় বলিলেন—ঐ চিন্তা ভুলিয়া যাও। ঈশ্বর-চিন্তা কর। নতুবা গতি লাগিবে না?

তিনি জ্ঞানী পরমহংস। তিনি জ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন। জগতে সমস্ত নামরূপই মিথ্যা। এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য। তোমাকে একবারে সেই সত্য-ব্রহ্মে যাইতে বলিয়াছেন। তুমি কিন্তু জ্ঞানমার্গে সেখানে যাইতে পারিবে না। তোমাকে ভক্তিমার্গ ধরিয়া তথায় যাইতে হইবে।

জ্ঞানমার্গে সেখানে কিরূপে যাইতে হয়?

জ্ঞানপথটি বড় কঠিন। এক মাত্র বিচার অবলম্বনে সে পথে উঠা যায়।

জ্ঞানপথটি কি?

এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য। অন্য সমস্ত মিথ্যা। তুমি চেতন, তুমি জড় নহ। যিনি চেতন তিনিই আত্মা। তিনিই ব্রহ্ম। তোমার দেহ, তোমার মন—এই দুইই মিথ্যা। এক মাত্র সত্যস্বরূপ তোমাতে এই মিথ্যা মন, এই মিথ্যা দেহ ভাসিয়াছে। মরীচিকাতে যেমন জল ভাসে, রজ্জুতে যেমন সর্প ভাসে সেইরূপ। ফলে মরীচিকা ও রজ্জুই আছে—জল ও সর্প আদৌ নাই। মায়াই এক মাত্র

সত্যস্বরূপ চৈতন্যে এই মিথ্যা তরঙ্গ তুলিয়াছে। জ্ঞানী এই মিথ্যাকে বিচার দ্বারা মিথ্যা জানিয়া—মিথ্যার আত্যন্তিক অভাব জানিয়া মিথ্যা মুছিয়া সত্যস্বরূপে অবস্থান করেন। জগৎও নাই, জগতের কোন কিছুই নাই। একমাত্র সত্যস্বরূপ চৈতন্যই আছেন। আর কিছুই নাই। ইহা বিচার দ্বারা অনুভব করিয়া জ্ঞানী আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করেন। তুমি যেমন সুষুপ্তিকালে সব তুলিয়া আপনি আপনি থাক সেইরূপ। এই স্থিতিলাভ করিলেই জীবন্মুক্তি হয়।

এই স্থিতি কি আমার পক্ষে অসম্ভব?

সম্ভব কি অসম্ভব তুমি আপনি ঠিক কর। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে তোমার পক্ষে ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব কি অসম্ভব।

কি বল।

তুমি যখন নৌকা করিয়া কোথাও যাও—নৌকা তীরবেগে যখন চলে, তখন তুমি তীরতরুকে কিরূপ অবস্থায় দেখ?

দেখি তীরতরু ছুটিতেছে।

সত্যই কি তীরতরু ছুটিতে থাকে?

না। তা ত ছুটে না। তরু এক স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকে মনে হয় যেন ছুটিতেছে।

হাঁ। তীরতরু কোথাও যায় না। মনে হয় ছুটিতেছে। কিন্তু ইহা মিথ্যা। তুমি সত্য কথাটি জান তথাপি মিথ্যা ব্যাপারটি মন হইতে তাড়াইতে পার না। সেইরূপ গতিশীল জগৎটি মিথ্যা। এই মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া যখন তুমি ইহা নাই নিশ্চয় করিয়া কিছুই আর দেখিবে না, তখন তুমি জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিবার উপযুক্ত হইবে।

ইহা কি পারিবে?

ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তবে কি করিব?

নিরোধ সমাধি ভিন্ন জ্ঞানে স্থিতি হইবে না। নিরোধ না পার, একাগ্র হইতে অভ্যাস কর। স্বামীবিয়োগে তোমার একাগ্রতা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র স্বামীর ভাবনা ভাবিতে পারিতেছে।

ইহাতে কি ঈশ্বর-ভাবনা হইবে?

হাঁ হইবে। একটু মিলাইয়া লইতে হইবে।

কিরূপে ?

হিন্দুমহিলার পতিনারায়ণ ব্রতই ইহা।

আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। শাস্ত্রযুক্তি দিয়া বুঝাইতে হইবে।

শোন। তুমি যাহাকে স্বামী বলিতে, তাহা জড় নহে তাহা চেতন। তাহা দেহ নহে আত্মা। দেহটা জড়, সেটা ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এখন যে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, খেলা করিতেছে তুমি যে মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতেছ তাহাও দেহ বটে, কিন্তু স্থূলদেহ নহে ইহা লিঙ্গদেহ ; ইহা ভাবনাময় দেহ। ইহা আতিবাহিক দেহ। ইহা চিত্তশরীর। এই চিত্তশরীর ব্রহ্মে মিশিয়া গেলেই তুমি জ্ঞানময়ে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে।

ইহাকে তাঁহাতে মিশাইবার যে কৌশল সেই কৌশলটি জানিয়া সর্ব্বদা তাহার অভ্যাস করিতে পারিলেই তোমার ভক্তিমার্গের সাধনা শেষ হইবে।

কিরূপে মিলাইতে হইবে তাহাই বল।

চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। জড় যাহা তাহা একটা মায়ার ইন্দ্রজাল। কাজেই দেহটা গেলেও চৈতন্যের কোন অনিষ্ট হয় না। এই চৈতন্য জড়ের উপর অভিমান করেন বলিয়া তিনিই বহুরূপে বহুনামে অভিহিত হয়েন। জগতে একমুহূর্ত্তে যত শব্দ উত্থিত হইতেছে, তাহা সেই একমাত্র চেতনপুরুষের সহস্রমুখের কথা মাত্র। তোমার মনে যে শত সহস্র সঙ্কল্প উঠিতেছে তাহাও সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষের বাক্য মাত্র। কাজেই যে মৃতস্বামীর স্মৃতি তুমি চিন্তা কর তাহা সেই পরমপুরুষেরই এক মূর্ত্তি বটে। স্থূলদেহ নাশ হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। এখন তিনি তোমার অন্তরে অতিবাহিক দেহে—ভাবনাময় দেহে—বা চিত্ত শরীরে খেলা করিতেছেন। ইহা তোমার বড়ই সুযোগের সময়। তুমি তোমার সহিত তাঁহার জড়দেহ অবলম্বনের লীলা নিত্য স্মরণ করিতে থাকে। তোমার চিত্ত ত তাঁহাকে চিন্তা করিতেই রস পায়। কিন্তু তাঁহার স্থূলদেহ ধারণের সময় অসংযমী হইয়া তোমরা বহু ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর কোন ব্যভিচার নাই। এখন তুমি শান্তমনে রিপুইন্দ্রিয় শান্ত করিয়া একমাত্র স্বামীকেই চিন্তা কর। এই যে হৃদয়ে স্বামীকে আতিবাহিক দেহে চিন্তা কর সেইরূপে তাঁহাকে শ্রীভগবানের দেহে প্রবেশ করাইয়া স্বামীমূর্ত্তি যে ভগবানের মূর্ত্তি তাহা ভাবনা কর। আর ইহাও সত্য, যে চেতনপুরুষের তুমি উপাসনা কর তিনি সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপীত্বই তাঁহার

স্বরূপ। কেবল তোমার চিন্তানুসারে তিনি তোমার স্বামীমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া তুমি ভাবনা করিও—তুমি যাঁহাকে হৃদয়ে পূজা কর, তিনিই কিন্তু সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনিই পুরুষে স্ত্রীতে, কুমারে কুমারীতে, যুবাতে বৃদ্ধে, সর্ব্বজীবের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হইয়া তিনিই আছেন। তিনিই অগ্নিতে, তিনিই সূর্য্যে, তিনিই বিদ্যুতে, তিনিই আকাশে, তিনিই তারায়, তিনিই চন্দ্রে, তিনিই আলোকে, তিনিই অন্ধকারে, তিনিই বায়ুতে, তিনিই সমুদ্রে নদীতে, তিনিই সর্ব্বস্থানের জলে, তিনিই বৃক্ষলতা, মণিকাঞ্চন সর্ব্বপদার্থে সর্ব্বজীবে। হৃদয়ের রাজা যিনি তিনিই জলেস্থলে অন্তরীক্ষে। এই ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবনা কর। আবার যখন আপন হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি ভাবনা করিবে, তখন তাঁহাতেই সমস্ত দেবতা, সমস্ত দেবী, সমস্ত ভূত, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, ভাবনা কর। মানসে তাঁহার পূজা কর, মালা পরাও, সাজসজ্জা কর, তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত কর, তাঁহার জন্য বিবিধ আহার প্রস্তুত কর। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা কথা কও। প্রতি ভাবনাতে, প্রতি বাক্য উচ্চারণে, প্রতি দৈহিক ব্যাপারে সমস্ত মানসিক বাচিক দৈহিক-কর্ম্মে তাঁহাকে উগ্রভাবে স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া, সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাক। লক্ষ্য রাখিও তাঁহাকে গোপন করিয়া যেন কিছু না হয়। ইহাই শ্রীভগবান-স্বামীতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। প্রথমেই সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করিতে তোমার মনে থাকিবে না। এই জন্য, তিনবেলা আহ্নিককালে সমস্ত ভাবনা সর্ব্বদৈনিক কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর। আবার প্রতি ব্যবহারিক কার্য্যকালে নাম জপ কর, করিয়া সমস্ত ভাবনা, সমস্ত বাক্য, সমস্ত কায়িক কার্য্য তাঁহাতে অর্পণ কর। কোন কিছু,—স্নান, আহার, শয়ন, নিদ্রা, আলাপ কোন কিছু যেন তাঁহাকে না ভুলিয়া হয়। ইহাতেই তোমার পতিনারায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। অধিক কি।

কালীকৃষ্ণ নষ্টামি তোর বুঝেছি মা সব কারসাজি,
গিরিরাজার বেটী তুমি জান কত ভোজের বাজী॥
কভু পতি হৃৎসরোজে, শিব্ কেটে মা দাঁড়াও লাজে,
কভু বৃন্দাবননাঝে তুমি গোধন চরাও গোপাল সাজি॥
কভু অযোধ্যামণ্ডলে, সহস্রদলপত্রতলে,
পতিসনে কুতূহলে, থাক বিন্দুরূপে সাজি।
নির্গুণ নিরবয়ব, সগুণে ধর রূপ সব
কভু শিব কভু কেশব হয়ে তোষ ভক্তরাজী;—
তুমা কি শিব কেশব যেরূপে বাসনা তব,
সেইরূপে হও আবির্ভাব, দ্বিজ শশধর তাতেই রাজী।

চিতারোহণ কালে—শেষ দর্শনে।

১

কেন ধর? ধরিও না। যেতে দাও এখন।
একবার দেখে আসি জন্মের মতন॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আমি গেলাম যখন।
দেখিনু বসনে ঢাকি করিছে বন্ধন॥
চাহাকার করি আমি করিনু বারণ।
সংসার পারেনি ওঁরে করিতে বন্ধন॥
কঠিন মায়ার বাঁধ কেটেছে যে জন।
কেন আর মিছা তাঁরে করিছ বন্ধন॥

২

ও যে খালি বাঁধা ছিল মহামারী সনে।
আপনি যাইছে তাই মাতৃ-দরশনে॥
ফিরিয়া আসিয়া আমি পড়িনু ধরায়।
আঁধার আঁধার সব সব শূন্য-প্রায়॥
কে যেন তখন আসি কহে মম কাণে।
চেয়ে দেখ ভাই! তব সন্তানের পানে॥
নয়ন খুলিয়া আমি যা দেখিনু হায়।
বলিতে পারিনি তাহা বুক ফেটে যায়॥

৩

স্থির নেত্রে চেয়ে বাছা না বহে নিশ্বাস।
দেখিয়া বসিনু আমি হইয়া হতাশ॥
তাড়াতাড়ি জল আমি দিনু তার মুখে।
"কোথা গেল বাবা" ব'লে রৈল অধোমুখে॥
আঁখি মুদে করি তারে বুকের ভিতর।
পড়িয়া রহিনু আমি ধরার উপর॥
অহো কিছুতেই প্রাণ নাহি রহে স্থির।
স্মৃতি তুলে সব কথা করয়ে অধীর॥

৪

শোয়ায়োনা শোয়ায়োনা চিতার উপরে।
এখনও অনেক কাজ বাকী এ সংসারে॥
অজ্ঞান বালক ওঁর খেলিছে কোথায়।
এখনি ছুটিয়া সে যে আসিবে হেথায়॥
বাবা কোথা ব'লে মোরে শুধাবে যখন।
কি বলিয়া নিবারিব তাহার রোদন॥
কি বলিয়া ভুলাইব সেই স্মৃতি তার।
এ চিতায় শেষ কিয়ে হ'বে হাহাকার॥

৫

না না তুলিও না ওঁরে চিতার উপরে।
আরও এক জন ওঁর আছে এ সংসারে॥
আমি একা শুধু আজ নহি অনাথিনী।
আমারি মতন সেও আজ অভাগিনী॥
শোয়ায়োনা শোয়ায়োনা চিতার উপরে।
এখনও অনেক কাজ আছে এ সংসারে॥
দশের জনক। শুধু নয়ত দশের।
পাঁচটি তনয়া ওঁর হ'য়েছে পরের॥
নিদারুণ বার্ত্তা তারা স'বে কোন্ প্রাণে।
কেমনে ও দেহ হায়। পোড়াবে আগুনে॥

৬

মিনতি বচন কেহ শুনিল না কাণে।
তুলিল সে দেব-দেহ ভীষণ আগুনে॥
আমার সৌভাগ্য সুখ চিরদিন-তরে।
ওই দেখ পুড়িতেছে চিতার উপরে॥
মান অপমান আর মনুষ্যত্ব জ্ঞান।
সকলি পুড়িছে ওই—দেখ বিদ্যমান॥
দেখ সব বন্ধুজন, দেখ দেখ ভাই।
নিমেষের মধ্যে পুড়ে হ'ল শুধু ছাই॥

ওহো-হো আমার প্রাণ বড়ই কঠিন।
এখনও বাঁচিয়া তুমি রবে কত দিন॥

৭

ফুরায়েছে সুখ তব আজি রাজরাণি!
ত্যজি ও সধবা বেশ সাজ ভিখারিণী॥
স্নান করি সীমন্তের মুছিয়া সিন্দুর।
সুবর্ণের অলঙ্কার কর সব দূর॥
ম'রেছে যে জন সে ত পুড়েছে চিতায়।
আদরে আনন্দময়ী কোলে নেছে তায়॥
তোমারি হইবে এবে পরীক্ষা ভীষণ।
সংসার-অনলে চিত্ত হইবে দহন॥
গিয়াছে তোমার পতি সব হয় লীন।
ভাস অশ্রুজলে তুমি হওরে মলিন॥

৮

নহিয়ে বিধবা! পতি মরে কি কখন?
মরে কি দেবতা? শুধু হ'লে অদর্শন?
আমার দেবতা আজ ছাড়ি নর-দেহ।
মিলেছেন নারায়ণে তবু একি মোহ॥
স্থির কর চিত্ত প্রভু! দেব নারায়ণ।
পতি-নারায়ণ ব্রত হ'ক উদ্‌যাপন॥
নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে আমি সেবিব তাঁহায়।
পরীক্ষায় অন্তে লীন হ'ব তাঁর পায়॥

———(গিরিডি)।

প্রবোধের স্মৃতি।

কাকা। যখন আস্‌তেন তখন এইখানে দাঁড়িয়ে ডাক্‌তেন "খুঁকিরে"। আর কে তেমন্ ক'রে ডাক্‌বে কাকা?

কেঁদোনা মা! এখনও সে প্রেত অবস্থায় আছে, চক্ষের জলে তার ক্লেশ বৃদ্ধি হয়।

না কাকা! আমি আর কাঁদবো না। কিন্তু—

মা! এ কিন্তুর আর শেষ নাই। আমি তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি তোমার কাকাকে আবার তোমার কাছে আন্‌তে চাও, না তার কাছে যেতে যাও।

না কাকা। আর আন্‌তে চাই না। বড় দুঃখময় এই সংসার। কাকা! নিরবধি এখানে দাগা খাইতে হয়। বড় যাতনা এখানে! তুমি একবার দেখ দেখি আর কে রইল? সব গিয়াছে। তোমার দিকে চাইলেও স্থির থাকিতে পারি না। কাকা! কত যাতনা তিনি ভোগ করিলেন। অথচ জীবন তাঁর কত নির্ম্মল! তিনি ব্রহ্মচারী। এই কালে তেমন নিষ্কলঙ্ক, তেমন পবিত্র সাধুচরিত্র আর কোথায় দেখিতে পাই কাকা! আমি কাঁদিব না। কিন্তু আমার প্রাণ নিতান্ত অস্থির হইতেছে। কাকা সে দিন বড় অস্থির হইয়াছিলাম। যোগের কথা, যাতনার কথা, পবিত্রতার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নে যাহা দেখিলাম—

কি দেখিলে?

কাকা! কাকা আমার বড় শুদ্ধ ছিলেন। যতক্ষণ সামর্থ ছিল ততক্ষণ কিছুতেই অপরিষ্কার হইলেন না। কিন্তু হায়! আর ত শেষে কিছুই রহিল না। সেই অবস্থাতেও তাঁর অন্তর্ব্বাসে যখন হাত দিতে গিয়াছিলাম, তখন কত বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। কাকা! তখনও তিনি আশা করিয়াছিলেন—ভাল হইয়া আবার সেই মালা, সেই বহির্ব্বাস, সেই পুস্তক সমস্তই ব্যবহার করিবেন। আজ তাঁর ব্যবহারের বস্ত্র কার হাতে যায় কাকা! আজ সে সব কাহাকে বিলাইয়া দিতে হয়। কতই বাঁচিতে সাধ ছিল। যে হরিদ্বার হইতে দারুণ ব্যাধি আনিলেন—সেই হরিদ্বারে আবার যাইবার জন্য কত সাধ ছিল। কাকা! এই আশা নিরাশার সংগ্রাম মানুষের হৃদয়ে কেন হয়?

কেন হয় বলিতেছি। কিন্তু স্বপ্নে কি দেখিলে?

স্বপ্নে দেখিলাম কাকা এক অতি সুন্দর স্থানে গিয়াছেন। চারিদিকে ফুলের গাছ। গাছে গাছে কত ফুল ফুটিয়া গন্ধে স্থানটিকে কত রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে চন্দ্রকলার আকারে গঙ্গা কুল কুল করিয়া কোন সীমা-শূন্য স্থানে যেন ছুটিয়াছে। কাকা আমার পুষ্পগুচ্ছ বেষ্টিত হইয়া অতি উজ্জ্বল মণিবেদিকায় বসিয়া আছেন। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন কাঁদিস্ কেন, দেখ দেখি আমি কত সুখে আছি।

দেহত্যাগের সময় যে কষ্ট পাইয়া আসিলাম তাহাত দেখিয়াছিস্। কি হইয়া গিয়াছিলাম। বল আর পাইলাম না। পাশ ফিরিতে পারিলাম না। সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিতে থাকিতে পার্শ্বে ঘা হইয়া গেল। সর্ব্বদা অশুচি মধ্যে থাকিতাম। শুইয়া শুইয়া আর যেন শুইয়া থাকিতে পারিতাম না। কত কাতর হইয়া বলিতাম একবার আমায় উঠাইয়া বসাইয়া দাও। হায়! কত কষ্ট করিয়া যদি বসাইয়া দিত, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইত প্রাণ বুঝি গেল। তৎক্ষণাৎ বলিতাম শুইয়াই দাও। সর্ব্বদা গাত্রদাহ হইত। সর্ব্বদা পিপাসায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। কত ঠাণ্ডা দ্রব্য আনিয়া দিত, কিছুতেই পিপাসা নিবৃত্তি হইত না। কত যাতনা—আমি যতদূর পারিতাম সহ্য করিতাম—যখন পারিতাম না তখন ভিতরে কত কাঁদিতাম। নীরব রোদন—চক্ষুজলে প্রকাশ হইত। সেই অকথ্য যাতনা আর এই সীমাশূন্য সুখ। দেখ্ দেখি কত মনোরম স্থান। আমি পার্থিব জীবনে বেশী তপস্যা করিতে পারি নাই, কিন্তু মন আমার পৃথিবীর কোন কিছুই চাহিত না। সর্ব্বদা ঠাকুরকে কিরূপে পাইব এই জন্য অস্থির থাকিত। তার জন্যই আমি তীর্থে তীর্থে কত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। সকল সময়ে বাড়ী হইতে ঠিক সময়ে টাকা পাইতাম না। যেখানে সেখানে সেই মোটা গামছা পাতিয়া পড়িয়া থাকিতাম। মন আমার কখন কলুষিত হয় নাই। তাই দেখ্ আমার অতি অসময়ে গীতা, রামায়ণ, শ্রীভগবানের নাম আমায় শুনান হইল। এখন আমার সুখ দেখ। শাস্ত্রবাক্য একটিও মিথ্যা নহে।

আমি এখন যেখানে আছি সেখানে আরও কে আছে দেখ্‌বি। আয় আমার সঙ্গে।

আমি কাকার সঙ্গে চলিলাম। আহা কি সুন্দর দেশ! কি সুন্দর স্থান। কি সুন্দর পুষ্পবাটিকা। কাকা আমার নিকটে আসিলেন। আহা! মৃত্যু-

সময়ে মুখে বড়ই দুর্গন্ধ হইয়াছিল—আর এখন! সর্ব্বশরীর হইতে কি সুমধুর গন্ধ বাহির হইতেছে। মনপ্রাণ যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কাকা আমাকে যাহা দেখাইলেন তাহাতে আমি আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। দেখিলাম সুন্দর অতি বিস্তীর্ণ এক বৃক্ষ। তাহার মূলে রত্নবেদিকা। রত্নবেদিকার উপরে এক পুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট। কাকা গিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কাকা বলিলেন এই পুরুষ সর্ব্বদা আমার ও তোমার ইষ্টমন্ত্র জপ করেন। ইঁহার উপাসনা প্রথমে না করিলে আমাদের ইষ্টদেবতাকে পাওয়া যায় না। আহা কি সুন্দর মূর্ত্তি! কত শান্ত, কত আনন্দময়! কাকা তাঁহাকে কি বলিলেন—তিনি সুন্দর এক কনকভবন দেখাইয়া দিলেন। আমি কাকার সঙ্গে কনকভবনে গিয়াছি——মন্দিরের পরদা উঠিয়া গেল। আমার পরিচিত—যাহারা কাকার পূর্ব্বে গিয়াছে তাহারা কত বিচিত্র পুষ্প, বিচিত্র মালা লইয়া পূজার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইঁহারা ৺কাশীলাভ করিয়াছিল। আমি তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ঠাকুরমাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা কাকাকে নিকটে আনিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন। কেহ কোন কথা কহিল না। আমি কাকার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতেছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন আমি মানসপূজার ধারণাভ্যাসী পর্য্যন্ত হইয়াছিলাম; তাই এখানে আসিয়াছি। ইহা সন্তানক লোক। ব্রহ্মলোকের উপরে ইহা। যতদিন সংসারে আছ প্রারব্ধ ভোগ কর আর ধারণাভ্যাসী হও। এখানে আসিতে পারিবে। কাকা এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম আমার ইষ্টদেবতার অঙ্গে সকলে মিলাইয়া গেল। আমি যেমন ব্যাকুল হইলাম অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কাকা এ সব কি সত্য।

হাঁ সমস্তই সত্য। বিশ্বাস কর,—করিয়া ধারণাভ্যাস। হও; অন্তে ঐ লোকে যাইতে পারিবে। গতজীবনে যাহা করিয়াছ তাহা ভাবিও না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইও না। উপস্থিত সময় কিছুতেই অপব্যয় করিও না। স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখিয়াছ তাহাই মানসপূজায় মিশাইয়া, ত্রিসন্ধ্যায় আপন কাজ কর এবং সর্ব্বদা প্রার্থনা, প্রণাম, প্রদক্ষিণসহ নাম জপ কর। শোক করিয়া কি হইবে। কেহ মরে না জানিও। ভাল লোক ভাল স্থানে যায়, মন্দ লোক নরকে যায়। শোক কেবল বৈরাগ্য জন্মাবার জন্য। বৈরাগ্য না

মিলে ভক্তি বা জ্ঞান কখন স্থায়ী হয় না, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা নাম জপ কর, সব মিলিবে।

অশ্বল ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সম্ভোগ সুখে এবং পারত্রিক স্বর্গীয় সুখে যাহার চিত্ত বিরক্ত হইয়াছে, এবং শম (অন্তঃকরণ নিগ্রহ), দম (বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ), উপরতি (উপদিষ্ট আত্ম-বিষয়ের প্রতিকূল বিষয় হইতে চিত্তের বিরতি) সমাধান (একাগ্রতা) এবং শ্রদ্ধা এই সমুদয় দ্বারা যাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং যিনি প্রণিহিত মনে বিচার করিয়া বুঝিয়াছেন যে, আমি দেহইন্দ্রিয় প্রভৃতি বন্ধনে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ, আমাকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাঁহারই বেদান্ত বিদ্যা গ্রহণে মুখ্য অধিকার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মচারি-মাত্রেরও বেদান্ত অধ্যয়ন শাস্ত্র-বিহিত।

মনু বলেন—তপো বিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা॥ (২।১৬৫)

অর্থাৎ—বিবিধ শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মচারী প্রতিপালনীয় তপস্যা এবং নানাবিধ ব্রত সম্পন্ন দ্বিজাতি ব্রহ্মচারী রহস্য উপনিষদ্ বিদ্যার সহিত সমগ্র বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে।

সুতরাং মুখ্যভাবে তোমার বেদান্ত-অধিকার না হইয়া থাকিলেও শ্রবণে তোমার অধিকার আছে। এই সাধারণ অধিকার লইয়াই তোমাকে আজ উপ-নিষদ্‌বিদ্যার উপদেশ করিব মনে করিয়াছি।

ব্রহ্ম] ভগবন্! তবে কখন্ আমার সেই মুখ্য অধিকার লাভ হইবে?

আচার্য্য] বৎস। আমি তোমাকে বেদান্ত-বিদ্যায় মুখ্য অধিকার লাভের ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর।

বৎস! বহুজন্মার্জ্জিত সংস্কার-পরম্পরায় জীব-হৃদয় পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে জীবের স্পৃহণীয় নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের অনুকূল সংস্কার-মালা ধর্ম্ম নামে এবং তৎপ্রতিকূল সংস্কার-মালা অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এই দেহ, এই জগৎ

ইহা অনিত্য, ইহা অশুচি, ইহা দুঃখে পরিপূর্ণ; কিন্তু অজ্ঞান-জনিত এই অধর্ম্ম স্বীয় আবরণ শক্তি দ্বারা এই তত্ত্ব আবরণ করিয়া জীবকে বুঝাইয়া দেয় —ইহা নিত্য, ইহা বড় পবিত্র, ইহা বড় সুখময়। মানবের চিত্ত সত্ত্বপ্রধান, কিন্তু তথাপি অধর্ম্ম আপন মলিনতায় ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া মলিন করে।

বৎস! প্রত্যেক জীবই তোমার মত এইরূপ মলিনীকৃত এক একটি চিত্ত লইয়া সংসারে আসিয়াছে। এই অবিদ্যা-বিলসিত অধর্ম্ম বা এই মলিনতা অতিক্রমের একরূপ ক্রম আছে। সোপানপরম্পরা সাহায্যে সৌধ-আরোহণের ন্যায় এই ক্রমপরম্পরা দ্বারা মানবের ধর্ম্মরাজ্যে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। এই ক্রমপরম্পরা লইয়াই ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের ক্রমিক অনুষ্ঠানে, ক্রমিক সত্ত্বশুদ্ধিকর ধর্ম্ম সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং যে পরিমাণ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে থাকে তৎপরিমাণ অধর্ম্ম অপসৃত হয়। এবং তৎ-পরিমিত ধর্ম্মের বা সত্ত্বগুণের প্রকাশে ক্রমে ক্রমে অধিকারীর বিশুদ্ধ-মানস প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়; তখন জীব এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা দেহাদি যে অনিত্য, অশুচি এবং দুঃখস্বরূপ তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। এই নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হইতেই দেহাদি-বিষয়ে বৈরাগ্য উদিত হয়। বৈরাগ্যের উদয় হইলে দেহ ও সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তৎপর কি উপায়ে ইহা পরিত্যাগ করিব অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার ফলে শাস্ত্র-বাক্য ও গুরুবাক্য হইতে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়; তৎপর এই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্য বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। ইহাই বেদান্ত জিজ্ঞাসা লাভের ক্রম। পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র শারীরক ভাষ্যের টীকায় (৩।৪।২৬ সূঃ) এই ক্রমের উদাহরণ করিয়াছেন।

যাহা হউক এখন তুমি তোমার বর্ত্তমান অধিকার বুঝিয়া লও।

উৎকৃষ্ট কাল দেশ ও পাত্রের সাময়িক সম্পর্কজাত চিত্তের সাময়িক উৎকর্ষ লইয়া অধিকার আলোচনা করা সঙ্গত নহে; কারণ উহা চিত্তের স্থায়িভাব নহে সঞ্চারি ভাব। প্রধানতঃ যে অবস্থা লইয়া যাহার চিত্ত অধিক সময় যাপন করে, তাহাই লইয়া এবং ধর্ম্মের ফলীভূত বিশুদ্ধমানস প্রত্যক্ষ ও অনুমানের তারতম্য লইয়াই অধিকার আলোচিত হয়। বৎস! তুমি এই সৎকথা ও আমার সামীপ্যবশতঃ সাময়িক যে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছ, উহাই দেখিয়া তোমার স্থায়ী অধিকার নির্ব্বাচিত হইতে পারে না, বা তুমি যদি ভক্তের বা

জ্ঞানীর কথাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ঐ হুস্পাচ্য তত্ত্ব-সমূহ উদ্গিরণ করিতে অভ্যস্ত হও, তাহাও তোমার উন্নত-অধিকারের পরিচায়ক নহে। জাতপক্ষ বিহঙ্গ-যেমন মাতৃকুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যে প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ অনুমান ও ধ্যানাভ্যাস বশতঃ আত্মীকৃত না হইয়াছে, তাহাও কিছুদিন জীবের কণ্ঠ-কুলায়ে বাস করিয়া চলিয়া যায়; তাহা আপনার নহে পরের। বর্ত্তমান-সময়ে লোক, পরের জ্ঞান ভাড়া করিয়া জ্ঞানীনাম গ্রহণ করে, গৈরিক দ্বারা বেদান্ত অধিকার সূচনা করে। ইহা যদৃচ্ছাচার, তুমি এরূপ যদৃচ্ছাচারী হইও না; আমি তোমার অধিকার প্রদর্শন করিতেছি। তুমি এখন ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন এখন তোমার পরম তপস্যা। মনু বলেন--

বেদমেব সদাভ্যস্যেৎ তপস্তপ্যন্ দ্বিজোত্তম।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥
(মনু—২।১৬৬)

এই তপস্যা, প্রণব, মহাব্যাহৃতি-ভূষিতা গায়ত্রীর নিয়মিত জপ এবং সর্ব্বদা প্রণব-পিঞ্জরবাসিনী জগদম্বার প্রীতির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাক। যিনি পঞ্চপ্রাণের সহিত সূর্য্য আদি পঞ্চদেবতাকে দৌবারিক করিয়া হৃদয়-রাজ্যে কমলাসনে রাজরাজেশ্বরী হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই প্রীতির জন্য তুমি অশন, বসন, শয়ন, গমন, বেদ-পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে থাক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। বিকর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপী অধর্ম্ম তোমার হৃদয়ের উপরে যে যবনিকা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সরাইতে সরাইতে স্বয়ং অপসৃত হইবে। হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এবং তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ-মানস প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান গায়ত্রীর অঙ্গজ্যোতিরূপে নির্গতহইবে। তোমার উন্নত অধিকার লাভ হইবে। প্রবাসাগত স্বতন্ত্রা প্রজ্ঞা * শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহা মুক্ত ফল-ভোগ বৈরাগ্য তোমাকে উপহার দিবেন, তাহারই নির্দ্দেশে তুমি মুমুক্ষু হইবে।

বৎস! ব্রহ্মচর্য্য, সন্ধ্যাবন্দনা, বেদ পাঠ ইত্যাদি প্রণিহিত মনে সেবিত হইলে, ইহারাই দূতের মত আত্ম-বিদ্যার সংবাদ আনয়ন করে। এইরূপ ত্রিভুবন ললাম-ভূমা আত্ম-বিদ্যার অলোকসামান্য প্রথমা শ্রবণ করিতে করিতে পক্ষান্তরে

* সাধন-সমাধিতে অভ্যস্ত হইয়া যে জ্ঞান প্রসাদ লাভ করেন, তাহাকেই স্বতন্ত্রা প্রজ্ঞা বলে।

আপনাকে অবিদ্যা-রাক্ষসীর করালগ্রাসে পতিত চিন্তা করিতে করিতে লোক জলিত-মস্তিষ্ক হয়, তখন তাহার হৃদয়ে বেদান্ত-জিজ্ঞাসা উদিত হয়েন। সুতরাং বৎস! তুমি পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুশীলন করিতে থাক—আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার শ্রেয়োলাভ ঘটিবে। অপাততঃ আমি তোমাকে উপনিষদ্-বিদ্যা মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ডের অখিল ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিব।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আমি আপনার অজ্ঞান সন্তান, সুতরাং আমি অজ্ঞানেরই মত জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই বিদ্যার নাম উপনিষদ্ কেন? বৃহদারণ্যক এই নামেরই বা অর্থ কি? উপনিষদের যে অংশ বলিতেছেন—যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত বলিয়াই বোধ হয় উহা যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড নামে অভিহিত, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ও অখিল কে? আর কোন্ ক্ষেত্রেই বা ইহা উপদিষ্ট হইয়াছিল?

আচার্য্য] বৎস! অবিদ্যা-কূপে নিমগ্ন আত্মাকে অদ্বয় ব্রহ্মভাবে উপনীত করিয়া যে বিদ্যা, অবিদ্যা ও তজ্জনিত জগৎ প্রপঞ্চ নষ্ট করে, তাহাই উপনিষদ্-বিদ্যা; বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন—

উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপ্যয়ত্বয়ং যতঃ।
নিহন্তা বিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ ভবেৎ॥

ইহাই উপনিষৎ শব্দের অর্থ! বক্তব্য উপনিষৎ বৃহদারণ্যক নামে অভিহিত হইবার কারণ ইহা পরিমাণতঃ অন্য উপনিষদ্ অপেক্ষা প্রাচুর, এইজন্য ইহা বৃহৎ এবং অরণ্যে ইহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত, এইজন্য ইহা আরণ্যক।

তদ্ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডরূপে পরিচিত হইবার কারণ এই—ইহা যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক প্রণীত; কিন্তু বৎস! মনে রাখিও, প্রণীত অর্থে মহাভারত অথবা কুমারসম্ভবাদির মত ইহা কাহারও কৃত নহে; পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সমাহিত হৃদয়ে অপরোক্ষরূপে যে উপনিষদ্-বিদ্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শুশ্রূষু ঋষিগণের নিকটে প্রকৃষ্টরূপে (অর্থাৎ শ্রোতার হৃদয়স্থিত রাগদ্বেষাদি মল অপসারণ করিয়া, ইহা নীত হইয়াছিল, এইজন্য ইহা যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত বলা যাইতে পারে। প্রণীত শব্দের এই অর্থ আমার স্ব-প্রতিভায় উদ্ভাবিত নহে। বেদান্তকল্পতরু নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অমলানন্দ শারীরক সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রের ভামতী ব্যাখ্যায় প্রণয়ন শব্দের এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক অতঃপর আমি তোমাকে যাজ্ঞবল্ক্য ও অশ্বলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিয়া, যে স্থানে এই উপনিষদের অনুবচন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর—

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম ঋষিসমাজে সুবিদিত। এই মহাপুরুষ মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য। বৈশম্পায়নের অনুমতিক্রমে এই মহাপুরুষ তৎপ্রদত্ত যজুর্ব্বেদ উদিগরণ করিয়া পুনরায় তপঃপ্রসাদিত ভগবান্ সূর্য্যদেবের নিকটে অপর যজুর্ব্বেদ লাভ করেন। এই যজুর্ব্বেদ শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতা নামে ও মাধ্যন্দিনীয় সংহিতা নামে সুপ্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন উপনিষদ্‌বিদ্যারও অধিকাংশ মূর্ত্তি যাজ্ঞবল্ক্য দৃষ্ট। ফলে কি মন্ত্রবিদ্যা কি উপনিষদ্-বিদ্যা সর্ব্বত্রই যাজ্ঞবল্ক্যের অপ্রতিহত প্রভাব, বিশেষতঃ শুক্ল-যজুঃসংহিতা বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থানীয় হইয়া এই মহাপুরুষের উৎকর্ষাতিশয় জ্ঞাপন করিতেছে। ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মহর্ষি অশ্বল, রাজর্ষি জনকের যজ্ঞের হোতৃনামক (ঋগ্‌বেদজ্ঞ) ঋত্বিক্। বৎস! আপাততঃ এই পর্য্যন্তই তুমি জানিয়া রাখ, পরে উপনিষদালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ইহাদের জ্ঞানগরিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বৎস! এখন তোমার জিজ্ঞাসিত শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর—

মিথিলাধিপতি জনকের বিস্তীর্ণ যজ্ঞবাটিকা। রাজর্ষি বৎসরাধিককাল পূর্ব্বেই যজ্ঞকার্য্যকুশল ধার্ম্মিক প্রাচীন স্থপতি ও শিল্পিগণ দ্বারা এই যজ্ঞ-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে নানারূপ কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথমতঃ যজ্ঞবাটিকার চারিদিকে বেষ্টনরূপে লতাকুঞ্জ ও বিচিত্র তোরণ বিভূষিত পুষ্পোদ্যান। তন্মধ্যে চতুষ্পার্শ্বব্যাপিনী বিচিত্র সৌধমালা। এক পার্শ্বে ঋষিগণের জন্য ফলপুষ্প সমলঙ্কৃত সুরম্য বহু আশ্রম। এই আশ্রম সমূহ ঋষি-কুলোচিত উপকরণ-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাদিগাগত মিত্র ও সামন্ত রাজ-গণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৌধাগার রাজ-ভোগ্য বিবিধ উপকরণে ও খাদ্য দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন সাধারণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ধার্ম্মিক শূদ্রগণের যথাযোগ্য আবাসগৃহ উপকল্পিত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যজ্ঞদর্শনার্থী পৌর ও জানপদগণের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন স্থান ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। এইরূপ পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত বিস্তীর্ণ যজ্ঞ বাটিকায় যথাসময়ে যজ্ঞভূমিতে ঋষিগণ, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ, রাজর্ষি-কুল, অন্যান্য রাজন্য-বৃন্দ, সাধারণ ক্ষত্রিয়কুল ধার্ম্মিক বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযোগ্য ভিন্ন আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্বেতচ্ছত্রতলে শ্বেতচামর বীজিত, হার, কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীটাদি সুশোভিত ঐ যে সুরম্য-মূর্ত্তি,—ইনি যজ্ঞদীক্ষিত রাজর্ষি জনক। ইঁহারই শুভাদৃষ্টের আকর্ষণে এই মহতী আর্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। আর ঐ তপস্তেজোব্রহ্মিতবপুঃ মহাপুরুষ—যাহার মস্তকে জটাভার, পরিধানে কৌপীন, দ্বিতীয় বল্কল, গলদেশে রুদ্রাক্ষ, ললাট-বিভূতি ভূষিত ইনিই সেই যাজ্ঞবল্ক্য। ঐ অদূরে অশ্বল শাকল্য

ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী ও অন্যান্য ঋষিগণ বর্ত্তমান। ঐ দেখ উহারা সকলেই তপস্যা লব্ধ ব্রহ্মবর্চ্চসে সুশোভিত।

যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইয়াছে, দেবতাগণ অগ্নিমুখে স্ব স্ব আহুতি লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি লোক-লোচনের অতীত স্ব স্ব রথে তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন, অদ্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতময় ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশে কৃতার্থ-করিবেন; দেবগণ এ সুযোগ ছাড়িতে পারেন না, তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন।

নিস্তব্ধ সভামণ্ডপ সহস্র কণ্ঠ-বাসিনী বাগ্‌দেবীও যেন ব্রহ্মবাদীর শ্রীমুখে ব্রহ্ম-কথা শ্রবণে একাগ্র হইয়া ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে অক্ষ-জ্ঞানাভিলাষী রাজর্ষি এই শুভ অবসর বৃথা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া প্রথম কথা উত্থাপন করিবেন মনে করিলেন তিনি দেখিলেন ইঁহারা সকলেই মহর্ষি, সুতরাং কাহার নিকট আমি জিজ্ঞাসু হইব। অতএব বিদ্যা পরীক্ষাচ্ছলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ রাখিয়া আমি সহস্রগোদান করিব। রাজর্ষি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মন্ত্রবিৎ ও ব্রহ্মবিৎ, তিনি জনককে জ্ঞান-দানে আসিয়াছেন, এইজন্য একটু প্রগল্‌ভতা হইলেও রাজর্ষির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিলেন। শিষ্য সামশ্রবাকে সহস্র গো গ্রহণে অনুমতি দিলেন। শিষ্য গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে মহর্ষি অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রাগল্‌ভ ব্যবহারে যেন কুপিত হইলেন। লৌকিকভাবে কোপও জিগীষার অভিনয় করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া একে একে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্ম] ঋষি অশ্বল যদি লৌকিকভাবে কোপ ও জিগীষা পরবশ হইয়া থাকেন, তবে তাহা অসঙ্গত কি? এইরূপ ক্ষেত্রে সহস্র গো গ্রহণ করা কি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ধৃষ্টতা প্রদর্শন নহে?

আচার্য্য] বৎস! যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বলাদি ঋষিগণ সকলেই ব্রহ্মবাদী, সকলেই কৃতার্থ; ইঁহাদের কার্য্য কেবল পরহিতার্থ। এই পরহিত সাধনের জন্য ইহারা লৌকিক নীতির মাত্রা লঙ্ঘন করিলেও তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত লিপ্ত হয় না। জলপূর্ণ মেঘমালা বিগলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ সিক্ত ও প্লাবিত করে—উহাতে কি আকাশ সিক্ত ও প্লাবিত হয়? বহ্নি সকল বস্তু পবিত্র করেন, কিন্তু বিষ্ঠাদি অমেধ্য-বস্তু-স্পর্শে কি অগ্নির পাবনতার ব্যাঘাত হয়? সুতরাং দুর্ব্বাসার ক্রোধ, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রগল্‌ভতা, অশ্বলের কোপ ও জিগীষা, এ সমুদয় লৌকিক-ধারণায় দুর্নীতি হইলেও, এরূপ ক্ষেত্রে উহা উদ্‌ঘাটনীয় নহে।

যাহা হউক বৎস! এইবার আমি উপনিষদ্ বলিতে আরম্ভ করিতেছি, তুমি ভাবস্থ হইয়া শ্রদ্ধালুহৃদয়ে শ্রবণ কর।

মহাত্মা প্রবোধচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (প্রাপ্ত)।

আজি কি শুনিলাম, —ঋষিবর প্রবোধচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। আর সে দেবমূর্ত্তি আমরা দেখিব না। আর তিনি সেই সুমধুর ধর্ম্মোপদেশে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন না। সহসা একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, এখনও যেন নয়নসম্মুখে সেই পুণ্যজ্যোতি প্রতিফলিত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, রজনীর গাঢ় তমিস্রা যখন তরল হইয়া আসিত, বিহগকুল তরুশাখায় অস্ফুট-কূজনে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের স্তোত্র গাহকরিত—প্রত্যহ শুনিতাম, সেই সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সুপবিত্রক্ষণে তিনিও ব্যাকুলকণ্ঠে সুরসংযোগে ডাকিতেন "সীতারাম, সীতারাম!" কর্ণে যেন এখনও সেই কণ্ঠ বাজিতেছে। আজ সীতারাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

কি পুণ্যময় তাঁহার চরিত্র ছিল। এজীবনে অমন দেবতার মত মানুষ আর দেখি নাই। কলিকাতায় যখন তাঁহার উদ্যোগে পুণ্যশীলা মাতাজী তপস্বিনী কাশীবাই দ্বারা বিধবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সময় আমি কয়েক মাস তাঁহাদিগের সুপবিত্র ছায়ায় বাস করিয়াছিলাম। মানুষ যাহাতে সকল প্রকার কলুষতা ত্যাগ করিয়া জগতে একমাত্র সত্য শ্রীভগবানের পথে যায়, সেজন্য সাধু ৺প্রবোধচন্দ্রের কত চেষ্টা ছিল। সংসারক্লেশদগ্ধ দুঃখী জীবের জন্য তিনি কত কাতর ছিলেন দেখিয়াছি। আজ যদি অন্য দেশ হইত, তাহা হইলে এই মহাত্মার যশঃসৌরভ শত সহস্রকণ্ঠে বিঘোষিত হইত। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ কত সাধুজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়া "অন্তে নারায়ণ" লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, কয়জন ধর্ম্মপিপাসু তাহা জানিবার সুযোগ পান?

চিরকুমার প্রবোধচন্দ্র আজীবন শুধু পরোপকার-ব্রতপালনে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা জানেন। দুঃখিনী ভারতমহিলার ধর্ম্মশিক্ষার দিকে তাঁহার প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইত। তাঁহার কত গুণ ছিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে এ অযোগ্য অক্ষম লেখনী সক্ষম নহে। আশা করি কোন সুযোগ্য লেখনী এ পূতচরিত্র

প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মজগতের উপকার সাধন করিবেন। শুধু শোকসন্তপ্তচিত্তে মহিমাময় সেই মহাত্মার স্মরণের জন্য কয়েক ছত্র লিখিলাম। পূজনীয় উৎসব-পরিচালক মহাশয় ইহা উৎসবে প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

হে মহাত্মন, তোমার উদ্দেশে আর কি লিখিব! শোকভারে লেখনী আর চলে না শুধু কবির ভাষায় বলি,—

গেলে চলি হে দেবতা, সেই পুণ্যদেশে
কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠে চিদানন্দবাসে,
দেববালা মালাদানে তুষিবে তোমারে,
গাবেন তোমার যশঃ দেবর্ষিরা সবে।
স্থাপিলে আদর্শপথ এ ভবমণ্ডলে,
পথভ্রান্ত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষিয়া
ঘোষাবে উচিৎ পন্থা ঘোষিবে কাননে
প্রভাতিকূজনে পাখী সুমধুরস্বরে,—
চিরধন্য এ চরিত্র, কলুষবর্জ্জিত,
প্রবোধের পুণ্যগাথা এ নরজগতে।

শ্রীসরোজিনী দেবী।
(খেতুপাড়া, পাবনা।)

সমালোচনা।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

১।	মানস প্রসূন	শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী	মূল্য ১৲
২।	সাধনা	ঐ	,, ৸৹
৩।	আহ্নিক কৃত্যম্ ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড	শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন	,, ৷৶৹
৪।	আহ্নিককৃত্যম্ ৪র্থ ৫ম খণ্ড	ঐ	,, ১৷৹
৫।	চণ্ডী	ঐ	,,
৬।	ভবসিন্ধু তরণী	শ্রীবিহারীলাল পাইন	,, ২৷৹

৭।	নীলাম্বরী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	মূল্য ৸০
৮।	লোকালোক	শ্রীজ্ঞাতশরণ কাব্যানন্দ এম, এ,	,, ১৲
৯।	ব্রহ্মচারী	শ্রীযতীশচন্দ্র সেন	,, ৷৷০
১০।	জ্যোতিঃ পথ ১ম খণ্ড	শ্রীকণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
১১।	জ্যোতিঃপথ ২য় খণ্ড	ঐ	,, ৸০
১২।	ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার —	কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	,,
১৩।	সাধনা	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	,, ১৲
১৪।	গো ব্রাহ্মণ-গায়ত্রী		

পুস্তকের সমালোচনা করিতে হইলে যতখানি অবসর আবশ্যক আমাদের সেরূপ অবসর নাই। আর বোধ হয় সেরূপ যোগ্যতাও নাই। কাজেই বলিতে হইতেছে ক্রমে ক্রমে অবসরমত হওয়া ভিন্ন আর আমাদের অন্য উপায় নাই। আমরা এবারে ১নং পুস্তকখানি সমালোচনা করিতেছি।

মানসপ্রসূন শ্রীমতীসুশীলাবালা দেবী।

এমন একদিন ছিল যখন স্ত্রীলোকের লেখা পাইলেই সমালোচকগণ ভাল বলিতেন। একজন বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছিলেন আমি নিম্নলিখিত ভাবের স্ত্রীলোকের লেখা কবিতাও পাইয়াছি :—

একে একে দুই হয় দুয়ে দুয়ে চারি
চারে চারে আট হয় আটে আটে ষোল।

তিনি বলিয়াছিলেন এরূপ কবিতা পাইয়াও বেয়াদব হইবার ভয়ে তাঁহাকে ভাল বলিতে হইয়াছিল। এখন কিন্তু সে দিন নাই। কি শিক্ষা, কি সাধনা, কি কবিত্ব সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক ও বাঙ্গালী পুরুষ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। মানসপ্রসূন কাব্যখানি তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রথমেই বলিয়া রাখিতে হয় পুস্তকখানির নামকরণটি ঠিক হয় নাই। পুস্তকের প্রধান বা আকর্ষণীয় চরিত্র ধরিয়া নাম করিলেই ভাল হইত। মায়াময়ী বা যোগমায়া নাম দিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

মানসপ্রসূন কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি হইয়াছি। দেবীসমক্ষে ছিলনকালে মায়ার আত্মবলিদান চিরদিন নূতন থাকিবে। ঘোষটা

খুলিয়া মায়ার মুখ দেখিতে পারিলে মায়া আর থাকেন না এই সনাতন সত্যটিকে কবিরভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। আমরা নবীন কবিদিগের মধ্যে এই ভাব আর কোথাও দেখি নাই। পুস্তকখানি শেষ করিলে এই চরিত্রের বল বহুক্ষণ ধরিয়া হৃদয়ে আধিপত্য করে এবং সাধকের অন্তরে অনেক নূতন সত্য ইহা প্রকাশ করে।

এই পুস্তকখানি শুধু সুন্দর নহে পুস্তকখানি পবিত্র। রমা মায়া শান্তি—যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ইহারা আপন আপন বিভাগে আদর্শ। এই পুস্তকে দর্শন শাস্ত্রের অতিশয় জটিল বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। এই পুস্তকের সমস্ত বিশেষত্ব দেখাইবার অবসর আমাদের নাই এজন্য আমরা কবির রচনা হইতে সুন্দর সুন্দর স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলি যে এই পুস্তকে কবি কোথাও শাস্ত্রশিক্ষাকে নিজ প্রতিভাবলে মনগড়া করেন নাই। সর্ব্বত্রই ঋষিদিগের শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কবি চরিত্র আঁকিয়াছেন। প্রণয়ের চিত্রে একটা জেলাসি না রাখিলে চরিত্র প্রস্ফুট হয় না—কবি কোথাও ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। ইহা হিন্দুসমাজে অস্বাভাবিক। কবিজীবনের দুঃখ কি তাহা দেখাইয়াছেন এবং দুঃখের প্রতীকার কিরূপে হয় তাহাই তিনি শাস্ত্রের রমণীয় উপদেশ মত চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই পুস্তকখানিকে আমরা সুন্দর ও পবিত্র বলিতেছিলাম।

আজকালকার সমালোচক হয় ত বলিবেন পৃষ্ঠায় পর পৃষ্ঠা ভরিয়া প্রকৃতির বর্ণনা কিছু কষ্টকল্পিত হইয়াছে. কিছু নীরস হইয়াছে। আমরা কিন্তু ওরূপ ভাবে সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নহি।

দাম্পত্যপ্রণয়ের মূল কোথায়? স্ত্রীদ্বারা স্বামীর চরিত্র কিরূপে সংশোধিত হয়? মনুষ্যজীবনের শোক শান্তি কিরূপে হয়? কবি দেখাইয়াছেন তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না। ভারতের যদি কোন বিশেষত্ব থাকে—এইটিই সেই বিশেষত্ব। সুন্দর গল্পে কবির ভাষায় গ্রন্থচরিত্রী তপস্যাই যে ভারতের নারীপুরুষের একমাত্র অবলম্বনের বিষয়—তাহা এই কাব্যে দেখাইয়াছেন। আজকাল বহু কৃতবিদ্যকে এই বিষয় ধরিতে দেখা যায় না। সেই জন্য আমরা একজন মনুষ্যেরই বিবিধ

চরিত্র দেখি। সভাক্ষেত্রে, উপাসনাগৃহে, ধর্ম্মব্যাখ্যা সময়ে, যাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে হয় তিনি ব্যবহারিক জগতে নিজের স্বার্থরক্ষা কালে শাস্ত্রশিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া শয়তানের মত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র লইয়া মানুষ যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। প্রতিনিয়ত অন্যায় করিতেছি আবার প্রত্যহ অনুতাপ করিতেছি ইহাতে অন্যায় করা কখনই শান্ত হইবে না। কবি দেখাইয়াছেন ধর্ম্ম জীবন লাভ না করা পর্য্যন্ত পাপ কখন নিবারিত হইবে না। সেই ধর্ম্ম জীবন লাভ জন্য শুধু নীতি অবলম্বনে ক্ষনিক শান্তি ভিন্ন কিছুই হইবে না। কিন্তু কঠোর তপস্যা দ্বারা মানুষ যখন ধর্ম্ম জীবন লাভ করে তখনই সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে যথার্থ মানুষ হইতে পারে।

আমরা স্কন্দপুরাণে পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা দেখিয়াছি। সেই তপঃ ক্লেশখিন্না পর্ব্বতরাজ দুহিতাকে মহাদেব বলিয়াছিলেন এখনও তোমার দেহ আমার দেহ স্পর্শ করিবার যোগ্য হয় নাই। তুমি আরও তপস্যা কর। তপস্যা দ্বারা নির্ম্মল হইলেই আমাকে পাইবে। আজকাল কার স্ত্রৈণিত ব্যক্তির মত কোথাও দুর্ব্বলতা শাস্ত্রে দেখা যায় না আর এই পুস্তকেও আমরা ইহা লক্ষ্য করি নাই। যথার্থ সাধক না হইলে দুর্ব্বলতা ত্যাগ করা যায় না।

এই পুস্তকের প্রধান প্রধান চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী যে সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন হিন্দু জাতির তাহাই যে এই দুর্দ্দিনে একমাত্র পথ, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। শান্তি চরিত্রে কবি দেখাইয়াছেন দুর্বৃত্ত স্বামীকে পাপ পথ হইতে ফিরাইতে হইলে তপস্যা দ্বারা দেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইবে—অন্য চেষ্টাও আবশ্যক কিন্তু তপস্যা ভিন্ন কোন চেষ্টাতে ইহা সফল হইবে না। যোগানন্দ, মায়া—সকল চরিত্রেই কবি এইটিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আমাদের স্থান ও নাই অবসরও নাই নতুবা দেখাইতাম যে সমস্ত জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া আজকাল বড় বড় সাধকও সম্প্রদায়িক ভাব আনিয়া শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই; নানা প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যাতে সমাজে নানা প্রকার অনিষ্টের বীজ বপন করিয়া ফেলেন। কবিতা গ্রন্থে সেই সমস্ত বিষয়ের সুন্দর মিমাংসা আছে। এই পুস্তকের রচয়িত্রী আপনার সাধনার ফলে এই পুস্তকে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান যোগের সম্বন্ধ যেরূপ দেখাইয়াছেন তাহা যথার্থই সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক। কবি দেখাইতেছেন ভক্তি ও জ্ঞানের

সাহায্যেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। আর নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অর্পণ করিতে অভ্যাস না করিলেও ভক্তি হয় না। ইহ ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষির শিক্ষা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ শিক্ষা আজ সমাজে বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

মানস প্রসূন পড়িয়া যদি কোন হিন্দু মহিলা ঋষির উপদেশ মত তপস্যা দ্বারাই যে সর্ব্ব প্রকার শোক শান্তি লাভ করা যায় ইহা ধারণা করিতে পারেন— এক জনও যদি এই পথে চলেন তাহা হইলেই গ্রন্থ রচনা সার্থক। তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পারিবারিক পবিত্রতাও লাভ হইতে পারে না ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

সাধনা ও একখানি কবিতা পুস্তক। আমরা ইহার সমালোচনা করিলাম না। কারণ এই পুস্তকের প্রশংসা অনেক হইয়াছে। বৃদ্ধ সমালোচকের পক্ষে বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। আমরা সর্ব্বশেষে এই আশীর্ব্বাদ করি যেন কবি আপন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং যাঁহার সম্পর্কে তিনি আসেন তাঁহাকেই যেন এই শিক্ষা দেন যে বিনা সাধনায় কাহারও সংসার পবিত্রভাবে চলিতে পারে না, আর বিনা সাধনায় কখনও শোকশান্তি হইতে পারে না। সাধনাটি বুঝিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ যেন তপস্যার জন্যই জীবন ধারণ করেন। ইতি।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অন্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।]　　১৩১৯ সাল, ফাল্গুন।　　[১১শ সংখ্যা।

শুভকথা।

১। ঈশ্বর এই সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন। যাহারা জগতের অনিষ্ট করে—সৃষ্টবস্তুর বিনাশ করে—তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। আর যাঁহারা ঈশ্বর পালিত এই জগৎ রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব লোকহিতকর কার্য্য করিবে। • মহানির্ব্বাণ।

২। ঔঁকারের তিনটি মাত্রা [অ উ ম] পৃথক ভাবে প্রয়োগ করিলে লোকে মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না। উক্ত মাত্রাত্রয় পরস্পর আসক্ত; ব্রহ্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত। বাহ্য অভ্যন্তর ও মধ্যম ক্রিয়াতে সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে, জ্ঞানীব্যক্তি বিচলিত হন না : প্রশ্নোপনিষদ্।

তিন মাত্রার ধ্যান সমকালে কিরূপ হইবে?

অ = ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। উ = বিষ্ণু পালনকর্ত্তা। ম = মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা। যেখানেই সৃষ্টি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্থিতি ও লয় ব্যাপার রহিয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জগৎ যেরূপে ও যে জন্য সৃষ্ট হইতেছে, লোকপালাদি দ্বারা যেরূপ ইহার রক্ষা হইতেছে, এবং অন্তে যেরূপে সমস্ত সৃষ্টি স্পন্দন মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া, সেই পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভুকে স্পর্শমাত্রে লয় হইয়া যাইতেছে, ইহা সমকালে চিন্তা করিতে পারিলে, ঔঁকারের ধ্যান হয়। পরম শান্ত চলন রহিত পরম

পদই পরব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই তাঁহার একদেশে মায়ার উদ্ভব হয়। মায়ার সহিত একপাদ মিলিত হইলেই ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম হয়েন। সগুণ ব্রহ্ম মায়াকে লইয়া সৃষ্টি করেন। মায়া বা শক্তির স্পন্দনেই সৃষ্টি। সূর্য্যদেব সমস্ত রশ্মিগুলি নিজের মধ্যে গুটাইয়া, যখন সূর্য্য ও দীধিতি এক হইয়া থাকেন—যখন শক্তিও শক্তিমান্ এক থাকেন, তখন সৃষ্টি নাই। প্রাতঃকালে সূর্য্য যখন আপন রশ্মি বিকীর্ণ করেন, যখন রশ্মিগুলি স্পন্দন করিতে করিতে বাহিরে আসিতে থাকে, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পরে সেই স্পন্দন ক্রমে স্থিতিভাব লাভ করে, আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্য আপন রশ্মি সংযত করিয়া যখন সমস্ত লয় করেন, তখন আবার সেই অন্ধকারে জগৎ প্রসুপ্ত হইয়া যায়। নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু ও ললাটে মহেশ্বর চিন্তা, এই জন্য ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া।

৩। তুমি দুঃখসাগর পার হইবার জন্য মহান্ পুণ্যরূপ মূল্য দিয়া, দেহরূপ নৌকা ক্রয় করিয়াছ, অতএব ইহা যাবৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, তাবৎ ইহা দ্বারা দুঃখ সাগর পার হইবার চেষ্টা কর! দুর্লভ মনুষ্য জন্ম এবং শরীরের অকৈবল্য লাভ করিয়াও যে নরাধম সংসার হইতে অপক্রান্ত না হয় সে আত্মঘাতী।

৪। এই সংসারে পরলোক হিত বিধানার্থ যতিগণ তপশ্চরণ করেন, যাজ্ঞিকগণ হোমানুষ্ঠান করেন, এবং দাতারা দান করিয়া থাকেন।

৫। দান ও তপস্যার মধ্যে দানই দুষ্কর। দান করিলে ধনক্ষয় হয় না; পরন্তু তাহা বৃদ্ধি পায়। মূর্খ মানব ইহজন্মে দরিদ্রতার আশঙ্কায় ধন দান করে না; কিন্তু প্রাজ্ঞব্যক্তি কালে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় ধন দান করিয়া থাকেন।

৬। যাহারা দান না করে তাহারাই জন্মান্তরে দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, মূর্খ ও পরাধীনরূপে বিবিধ দুঃখ ভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৭। ধনবান্ হইয়াও যদি দান না করে, এবং দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্যা না করে, তবে তাহাদিগকে কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত করা কর্ত্তব্য।

ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রং বা তপস্বিনম্।
উভাবপ্যুসি মৌক্তব্যৌ কণ্ঠে বদ্ধা মহাশিলাম্॥

মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকা খণ্ড। ১ম ২য় অধ্যায় হইতে।

বিবিধ কথা।

কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়] কত লোক তাঁহাকে পাইয়াছে, আমি কি পাইব না? আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত তুমিই বলিবে, তাই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আচ্ছা, তুমি একবার ভাবত, তিনি আমার সঙ্গে কথা কন, আর তোমার সঙ্গে কথা কন না কেন? আমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকি, গোপীরা যেমন "তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণানেবগায়ন্ত্যঃ নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ। কখন তন্মনা হইয়া, কখনও তাঁহার প্রসঙ্গ লইয়া, কখন লীলার অনুকরণ করিয়া, কখন তন্ময় হইয়া, কখনও তাঁহার গুণগানে লুব্ধ-মতি হইয়া থাকিতেন, এবং এই উৎসবে মজিয়া গৃহে যাইবার কথাও যেমন ভুলিয়া যাইতেন, আমিও সেইরূপ ছায়ার মত তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-প্রাণের অনুকরণ করি, তাই আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন, আর তুমি ইহার বিপরীতটি কর, তাই তুমি তাঁহার বহিরঙ্গ, তাই তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেন না, এস আমি তুমি এক হইয়া যাই, তুমি তাহাকে পাইবে।

তুমি ত তোমার সহিত এক হইতেই বল, কিন্তু আমি যে পারি না। আর যদি একেবারে এক হইতে নাই পার, তুমি আমার অনুকরণ কর। আমি যেমন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে আর তোমাকে ডাকি না, আমিই বলি এইরূপ তুমি তাঁহার সঙ্গে নিজেই কথা বল, তিনি শুনিবেন না, নাই বা শুনিলেন, তুমি বলিয়া যাও, এবং তিনি শুনিয়াছেন ভাবিয়া তার পর যাহা বলিবার তাহাও বলিতে থাক, এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি নিজেই তোমার কথার জবাব দিবেন। তাহা হইলেই তুমি তাঁহাকে পাইলে, ইহা হইলে আমি তাঁহাকে পাইলাম সত্য, কিন্তু তিনি কি আমাকে পাইবেন না? তবে কি "কবে আমি তাঁহাকে পাইব" অর্থে কবে তিনি আমাকে পাইবেন? হাঁ তাইত। আমার সাধ যায়, আমি যে ভাবি আছি সেই ভাবেই থাকিব, আর আমার 'সোণার সোহাগা হইবে' আমার সোণার সংসার তাঁহার সোহাগে লোকলোচনের নিকট লোভনীয় সুষমা লইয়া হাসিতে থাকিবে!

উঃ, তুমি বড় ভুল করিয়াছ এইজন্যই ত তুমি তাহাকে পাও না, তিনি বলিয়াছেন, সর্ব্বাশাঃ কিল সম্রাজ্য পদমেতদবাপ্যতে। সংসারের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলে তবে এই পরমপদ সেবনে অধিকার জন্মে। তুমি তাঁতে থেকে উন্নতি করিতে চাও, তাই কিছুই হয় না। তুমি এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর; তবে তাহাকে পাইবে। আচ্ছা তাহা হইলে কি তিনি আমাকে পাইবেন?

হাঁ, দেখনা তোমার যদি তোমা অপেক্ষা একজন বড় লোকের সহিত বন্ধুতা হয়, তবে প্রথম প্রথম তোমারই তাহাকে পাইয়া বসিতে হয়। তার পর তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে করিতে যখন তুমি তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া যাও, তখন তিনি তোমার বাড়ীতে আসেন। এখানেও সেইরূপ তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়িকা আর তুমি পথের কাঙ্গাল। তিনি তোমাকে পাইবেন দূরের কথা তুমি তাহাকে পাইবে কিসে আশা করিতে পার—তিনি দয়াময়ী তিনি স্নেহময়ী, প্রথম ইহাই কারণ। তার পর তোমার কার্য্য, তুমি কাঙ্গাল ইহা তুমি যদি বুঝিতে পার, তাহা দ্বিতীয় কারণ. তার পর তুমি তাহার গুণ-গান কর, লীলা চিন্তা কর, লোকসমক্ষে অকপট ভাবে তাহাই বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাও, কখন নির্জ্জনে তন্ময় হইয়া যাও, এইরূপ করিয়া করিয়া তাহার বিস্মতঃ প্রসারিত দৃষ্টিকে যখন তুমি বিশেষ ভাবে তোমার দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে পারিবে. তখন তুমি তাহার অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ হইয়া যাইবে, তখন তুমি তাহাকে পাইবে। ইহা হইলেই তুমি তাহার প্রিয়জন মধ্যে পরিগণিত হইলে 'ভাগ্যাধীনমতঃ পরম্' তার পর তোমার ভাগ্য তিনি বলেন মনুষ্যাণামপিসিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' যত্ন করিয়া যাহারা সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে সিদ্ধিও লাভ করেন তাঁহাদেরও সহস্রের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

তুমি ইহা শুনিয়াই নিরাশ হইও না। বিশুদ্ধ সত্ত্বই তাঁহার সর্ব্বস্ব, তুমি কর্ম্ম দ্বারা রজঃ তমঃ কাটিয়া সর্ব্বদা উপাসনাযোগে নিত্যসত্ত্বস্থ হও, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া দৃশ্যদর্শনে বিরত হও, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অবস্থায় উপ-নীত হইয়া তুমিই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া যাইবে, তখন তিনি তোমার গৃহে আসিবেন। তখন তিনি স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভাবে ভিতরে বাহিরে তোমার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

কিন্তু যতদিন না তিনি এই ভাবে আসিতেছেন, ততদিন তুমি খট্‌টারূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিও না, সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা-স্ফুটিতহৃদয়ে বলিতে থাক 'আয়াহি বরদে দেবি' বলিতে থাক "অজাত পক্ষাইব মাতরং খগাঃ। স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তা। প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যষিতং বিষণ্ণা। মনোহরবিন্দাক্ষদিদৃক্ষতে ত্বাম্"।

বলিতে থাক—হে অরবিন্দাক্ষ অজাত পক্ষ পক্ষি-শাবক যেমন জননীর দর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়, কখন তাহার স্নেহময়ী জননী আহার-ভার মন্থরগমনে তাহার তৃষ্ণার্ত্ত নয়নের পথে পতিত হইবে ভাবিয়া যেমন জননীর আশা-পথ চাহিয়া থাকে, ক্ষুধার্ত্ত বৎস যেমন মাতৃস্তন্যের দিকে লালায়িত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে বিষাদিনী বিরহিণী যেমন প্রবাসী প্রিয়তম দর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়, হে অরবিন্দাক্ষ চির-প্রলোভিত আমার এই হৃদয় তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

কখনও শ্রৌতভাষায় বল, ইন্দ্র বায়ু ইমেসুতাঃ উপপ্রয়োভিরাগতম্ ইন্দাবা বা মুশন্তিহি।

বল—হে ইন্দ্রবায়ুরূপিণী তোমার জন্য আমার এই (সমাধিষ্ঠিত) মানসী বৃত্তিগণ সুসংস্কৃত হইয়াছে, ইহারা তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তোমার আশা-পথে চাহিয়া আছে।

কখনও বল। ধেনু যেমন হাম্বারবে বৎসের নিকট উপস্থিত হয়, যুদ্ধ-কামী পুরুষ যেমন অশ্বের নিকট উপস্থিত হয়, স্বামী যেমন পতিব্রতার উৎকণ্ঠিত বিরহতপ্ত নয়ন পথে উপনীত হয়, তদ্রূপ হে রাজরাজেশ্বরি! তুমি —তুমি আমার এই চিরপিপাসিত নয়নের পথে উপনীত হও। তুমি এইরূপ বলিতে থাক, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সহঃ সম্পাদক।

অশান্তি।

আমি শত অপরাধে অপরাধী। তাই আমি শান্তি পাই না। তাই আমার একচিন্তা প্রবাহ থাকে না। দুই দিন এক নিয়মে চলিতে পারি না। তোমাকে ডাকা আমি কোন দিনই যথা সময়ে পারি না। আমি অনুভব করি শত শত অপরাধে আমি এখনও অপরাধী তাই সংসার আমার চাপিয়া ধরে। যথা সময়ে কাজ করিতে গেলে শত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন দিন শরীর

আমার নিয়ম ভঙ্গ করায়; কোন দিন মন নিয়ম ভাঙ্গে; কখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বা সংসার নিয়ম ভঙ্গ করায়। কখন বা জগতের হিত চিন্তা নিয়ম ভঙ্গ করায়।

জগতের হিত চিন্তা ভাল কিন্তু সে চিন্তারও সময় আছে। যথা সময়ে সে চিন্তা করিলে নিজেরও হিত হয়, জগতেরও হিত হয়। কিন্তু অসময়ে সে চিন্তায় অনিষ্টই হয়। একুল ওকুল. দুকুল যায়। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিতে ভাবিতে শ্যামও যায় কুলও যায়।

বলিতেছি শত অপরাধে অপরাধী। জীবন ধরিয়া অপরাধ করিতেছি। তাই আমার এই অশান্তি।

আমি এই অপরাধের প্রতীকার চাই। আমি তোমার চরণে নির্দ্দোষ হইতে চাই। আমি এই অশান্তির প্রতিবিধান করিতে চাই।

আমি চাই আমার সকল ভাবনার মূলে তুমি থাক, আমি চাই আমি সকল কর্ম্মের মূলে তোমায় দেখি, আমি চাই আমার মন আর অসম্বন্ধ প্রলাপ না তুলে, আমি চাই আমি এক করিতে আর করিয়া আর না ফেলি, আমি চাই আমি যথা সময়ে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করি, আমি চাই আমি মুখে এক আর মনের আর না করি, আমি চাই আমি কোন প্রকার কপটতা আর না করি, আমি চাই শত্রুমিত্র সকলের উপর অচঞ্চল হইয়া, শান্তভাবে ব্যবহার করি। এক কথায় আমি চাই আমি সর্ব্বত্র তোমার সত্তা দেখিয়া সকলের মধ্যে তুমি আছ ভাবিয়া নির্ভয়ে যখনকার যাহা তখন তাহা সম্পাদন করিয়া চাই।

উঠিবার ও বসিবার মুখে নিত্য অভ্যাস।

১। বৈরাগ্য অভ্যাস।

২। ভাবনা, বাক্য, কর্ম্মে স্মরণ অভ্যাস।

৩। আমি কর্ত্তা নই বুঝিয়া অভ্যাস।

কিসে অশান্তি দূর হইবে? কিরূপে সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকিব? কবে আমার সে দিন হইবে যখন গত জীবনের কোন কিছু আর মনে থাকিবে না, ভবিষ্যত জীবনে কি হইবে তাহার ভাবনাও থাকিবে না—যখন গত ও ভবিষ্যৎ মুছিয়া ফেলিয়া শুধু বর্ত্তমানে তোমায় লইয়া থাকিব?

আমার নিয়মে চল। মনের নিয়মে চলিও না।

তাইত করিতে চাই। নিত্য ক্রিয়ার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করি।

নিত্য ক্রিয়া তিন বেলায় ত করিবেই। কিন্তু নিত্যক্রিয়া করিতে বসিবার মুখে এবং নিত্যক্রিয়া করিয়া উঠিবার মুখে যাহা শিখাইয়া দিয়াছি তাহা নিত্য করা চাই; মনকে অগ্রে প্রস্তুত না করিয়া লইলে কাজ ঠিক হয় না। উঠিবার ও বসিবার মুখে নিত্য অভ্যাসটী নিত্য ক্রিয়ার সহিত যোগ করিয়া লও। হইবে।

আজ হইতেই তাহা হউক।

এইত রজনী শেষ হয় আর কেন আলস্যে লুটাও। উঠ। উঠিয়াই শয্যায় উপবেশন কর। পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন বা বীরাসন করিয়াই উপবেশন কর। করিয়া অন্য চিন্তা না করিয়াই তাঁরে ডাক। যার যাতে ডাকা অভ্যাস সে তাতেই ডাকুক। কেহ খালি জপে ডাকে, কেহ শ্বাসের জপে ডাকে। যতক্ষণ পার প্রথমেই ডাক। ডাকিয়া একটু শান্ত হইয়া প্রার্থনা কর। নিজের জন্য প্রার্থনা! সেত বহুদিন হইয়াছে। আজ একবার পরের জন্য ডাক। একবার দুঃখময় জগতের দুঃখী আর্ত্তজনের জন্য ডাক।

এ ডাকা বৈরাগ্য অভ্যাস জন্য। বল হে ঠাকুর! সংসারে যে বড় দুঃখ। আমি জীবনে কত দাগা পাইলাম, কত জ্বালায় জ্বলিলাম। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, এখনও আমার বৈরাগ্য হইল না। ভগবন্! সব ত গিয়াছে। মাতা গিয়াছেন, পিতা গিয়াছেন, ভ্রাতা গিয়াছেন, পুত্র গিয়াছে, কন্যা গিয়াছে আর ত কেহই নাই একরূপ। যখন এই সমস্ত বিয়োগ হয় তখন যেমন বিষয়ে রুচি থাকে না কৈ তার পর ত আর সে ভাব থাকে না। হৃদয়ে তাহাদের চিতা জাগাইয়া তোমায় ডাকিতে বস তাওত তখনকার মত রসের সহিত হয় না। পুত্র বিয়োগের পর, ভ্রাতার মৃত্যু সজ্জায়—তোমার জন্য যে কাতরতা হইয়াছিল সে কাতরতা ত সকল সময়ে থাকে না। সে ভোগে অরুচিত এখন নাই। তাই বলি প্রভু! আমার বৈরাগ্য স্থায়ী হইল না। এখন কি উপায় করিব?

তুমি কি তাই বলিতেছ অনেক দিন ত নিজের জন্য ডাকিয়াছ। স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা ভ্রাতা ইহারা নিজের জন। ইহারা গিয়াছে—কাতরতা কি তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহাতেও আমার হয় নাই, তাই পরের জন্য তোমায় ডাকিব।

দয়াময়! আমার মত কত লোক সংসারে দাগা পাইতেছে, কত জ্বালায়

জলিতেছে। এ শোকত নিত্যই আছে। আমার শোকই লোকে নিত্য ভোগ করিতেছে। পতিশোকে দুঃখ ভুলিয়া'ছ—সে পতি বহুদিন গিয়াছেন, পুত্রশোকে দাগা পাইয়াছি, কালে সে দাগা সে আবাও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কত লোকেরও পতি গেল, পুত্র গেল, কন্যা গেল, ভ্রাতা গেল। হায়! তাহারা আজ আমার মত লুটাইয়া লুটাইয়া কতই কাঁদিতেছে। হে ভগবান্ এক দিন আমি আমার শোকে ডাকিয়াছি আজ অন্যের শোককেও আমার শোক মনে করিয়া তাহাদের জন্য তোমায় ডাকিতেছি। প্রতিদিন এই ভাবে নিত্যক্রিয়ার পূর্ব্বে বৈরাগ্য আনিয়া কাতর হইয়া সবার জন্য তোমায় ডাকিব। হে দীননাথ! জগতের লোক বড় দুঃখী, শোকাতুর। তুমি একবার তাহাদের প্রাণ জুড়াইয়া দাও। তাহারা দুঃখে অধীর হইয়া, শোকে মোহে অধীর হইয়া, শুধুই হাহাকার করিতেছে। তোমায় ডাকিতে ভুলিয়া যাইতেছে তুমি একবার এই জগতের জ্বালা-যন্ত্রণাময় অধীর জীবের দিকে করুণাদৃষ্টি কর। শোকে কাতর করিয়াছ কর; কিন্তু যে জন্য এই শোক তাপ সেই বৈরাগ্য একবার জন্মাইয়া দিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া লও। আমাদিগের বৈরাগ্য সর্ব্বদা প্রবল রাখিয়া ভবভোগে অরুচি করাইয়া দাও। আহা! তোমা বিমুখ হইয়াই জীব বড় কষ্ট পায়।

করুণাসিন্ধো! দাও—একটু যথার্থ স্থায়ী বৈরাগ্য উদয় করিয়া দাও; যে বৈরাগ্যে "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে" হয় যে বৈরাগ্যে পৃথিবীর কোন কিছু ভোগই বিরস হইয়া যায় সেই বৈরাগ্য দাও। পৃথিবীর ভোগ বিরস হইলে তোমার রস ভোগ হইবে। তুমি যে রসময়। তোমাকে ডাকিলে রস কেন আসিবে না? রসময়কে ডাকিলেও যদি রস না আসে তবে ত ডাকা হয় নাই। তবে ত জিহ্বার জন্য রস থাকে বলিয়াই তোমার রস পাওয়া যায় না। শুকর সুখ ভোগ করিলে কি বিষয়-বিষ সুখ বলিয়া বোধ হইতে পারে? প্রভু কৃপা কর।

নিত্য ক্রিয়ায় বসিবার পূর্ব্বে পরের শোকে নিজের শোক জাগাইয়া প্রাণকে যথার্থ কাতর করিয়া পরের জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে ডাকাই বৈরাগ্য অভ্যাস। ঐরূপ ডাকায় পরের উপকার ত আছেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনও শ্রীভগবানের চরণ প্রান্তে উপনীত হইবেই। জগতের দুঃখের জন্য শ্রীভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়া, জগতের সমস্তই অসার, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী এই ভাবিয়া—জগতের ভোগ সুখকে অগ্রাহ্য করা; শরীর, দেহ, মন, জগৎ মায়িক ভাবিয়া শুধু তাঁহাকে লইয়া থাকিতে প্রয়াস করা—বিনা বৈরাগ্যে

এ সমস্ত হইবে না ; বিনা বৈরাগ্যে ধর্ম্ম জগতে উঠিতে পারা যাইবেই না। তাই সর্ব্ব প্রথমে প্রত্যহ পরের জন্য দুঃখ, পরের দুঃখ প্রতীকার জন্য শ্রীভগবানের প্রার্থনায় বৈরাগ্য অভ্যাসে মনকে কাতর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

২

দ্বিতীয় চিন্তা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ সর্ব্বকালে কার্য্যে করা।

ঠাকুর আর একটি প্রার্থনা তোমায় শুনাই। আর কার কাছে বলিব? তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে? কে আর শুনিবে? তুমি ভিন্ন অন্তরের জ্বালা আর কে জুড়াইতে পারে? তাই তোমাকেই বলিব। সবাইত ছাড়িয়া যায়। তুমি ত এক দণ্ডের তরেও ছাড়না। তুমি ছাড়িলে জীব ত একক্ষণও বাঁচে না। দয়াময় যাহা কিছু চিত্তে উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ যেন তাহা ধরিতে পারি, পারিয়া যেন তোমাকে জানাইতে পারি। সর্ব্বদাই ত চিত্তে কতকি উঠে—সবই যদি তোমাকে জানাইতে পারি তবে ত সর্ব্বক্ষণই তোমাকে স্মরণ হয়। ইহাই ত সর্ব্বকর্ম্মার্পণ! তুমিইত বলিয়াছ কর্ম্মের পূর্ব্ব অবস্থা বাক্য বাক্যের পূর্ব্বে ভাবনা। জীব যাহা কিছু ভাবিবে বলিবে বা করিবে সব যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করে—যদি তোমার অনুমতি, প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে, লইতে অভ্যাস করে তবে সেত তোমায় লইয়াই থাকে!

কিরূপে ইহা হইবে?

তোমার নামই জীবের একমাত্র অবলম্বন। তোমার নাম করাকে, যদি সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে তবে নাম করিতে গেলে যাহা অন্য ভাবনা উঠিবে তৎক্ষণাৎ তাহা তোমাকে জানান যায়। নামের বিঘ্ন অন্য ভাবনা, অন্য বাক্য, ব্যবহারিক কার্য্য। নাম লইয়া থাকিলেই বিঘ্ন ধরা যায় ধরিলেই বিঘ্ন উদয়ে জানান যায়। ইহাতে সর্ব্বদা তোমার স্মরণ হয়। তাই বলি জীব তোমার নাম করুক—আরও এক কর্ম্ম করুক। নাম করিতে করিতে প্রণামও অভ্যাস করুক। কোথায় নাই তুমি! তুমিই বলিয়াছ মাং নমস্কুরু। তুমি যখন সকলে—তখন তুমি মনে করিয়া, মনে মনেত সকলকে প্রণাম করা যায়। সর্ব্বত্র তোমায় দেখিতে পাওয়া যায় না—তা নাই হউক—কিন্তু সর্ব্বত্র ত তুমি আছ। ইহা বিশ্বাস করুক। জলে স্থলে, অনলে অনীলে, শশী তারকায়, মেঘমালায় পৃথিবীতে, ফুলে ফলে, বৃক্ষ পাতায়, মানুষে পশুতে, শত্রু মিত্রে, কীট পতঙ্গে কোথায় তুমি নাই? কোথায় তোমার অভাব? তুমি

সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই তুমি বিষ্ণু, তুমি মঙ্গলময় বলিয়াই তুমি শিব—তুমি পরিপূর্ণ। বিশ্বাস করুক, করিয়া, প্রতি নাম জপে, প্রতি মন্ত্র জপে তোমায় প্রণাম করা অভ্যাস করুক। ভুল ত হইবেই। নামকে ত সর্ব্বদার কার্য্য অভ্যাস করা হয় নাই। হউক না অভ্যাস। কিছু সময় লাগে। তা কোন্ শুভ কর্ম্ম অভ্যাসে সময় দিতে না হয়? তাই বলি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে নাম জপিতে জপিতে প্রণাম করুক। প্রদক্ষিণ করুক। নাম জপিতে জপিতে প্রণাম করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে—আবার নাম জপুক। বিঘ্ন উঠিলেই তাহাতে স্মরণ করিয়া কর্ম্মার্পণ করুক হে একমাত্র ভরসা! হে কাঙ্গালের হরি! হে দীনবন্ধু বিশ্বাসে তুমি সর্ব্বত্র আছ ভাবিয়া তোমার কথা মত মাং নমস্কুরু অভ্যাস চলুক।

নিত্য ক্রিয়ায় বসিবার পূর্ব্বে জগতের দুঃখীজীবের জন্য প্রার্থনা এবং প্রতি ভাবনায় প্রতি বাক্য উচ্চারণে এবং প্রতি কার্য্য করিবার প্রথমে তোমাকে জানান অভ্যাস ইহা স্মরণ করিয়া কার্য্যে বসিবার কথা বলা হইল। শেষ চিন্তা বাকী।

৩

আমি কর্ত্তা নহি বুঝিয়া সর্ব্ব বিষয়ে ইহা অভ্যাস।

হে প্রাণেশ্বর! আর যেন মানুষ কর্ত্তা না সাজে। আমি করি, আমি খাই, আমি চলি, আমি বলি—বেহস হইয়া "আমি "আমার" এই সব কথা ব্যবহার করিলেই কিন্তু কর্ত্তা সাজা হইল। আর ভিতরে যদি বেশ করিয়া বুঝিতে পারা যায় প্রকৃতিই সমস্ত করিতেছেন তাও পুরুষের চৈতন্যে চৈতন্যদীপ্তা হইয়া—পুরুষ কিছুই করেন না তিনি দ্রষ্টা মাত্র আর আমিটা পুরুষই, প্রকৃতি নহে এক্ষেত্রে—ভিতরে বোধ রহিল আমি করি না, চলি না, বলি না—কিন্তু বাহিরে আমি কথার ব্যবহারে একটা মৌখিক আমি বলা হইল মাত্র। এই মৌখিক আমি বলার ব্যবহারও যতদূর পারা যায় ত্যাগ করা উচিত। মৌখিক বলিতে বলিতে আবার সত্য সত্যই বলা হইয়া যায় তাই ব্যবহারিক জগতে আমির ব্যবহারও বড় সতর্ক হইয়া করা উচিত!

আমি চেতন, আমি পুরুষ, আমি কর্ত্তাও নহি, আমি ভোক্তাও নহি, আমি দ্রষ্টাও নহি, আমি শ্রোতাও নহি, আমি প্রকৃতির ব্যাপারে সাক্ষী পুরুষ—বহুকাল ধরিয়া এই ভাবে আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক রাখিতে হইবে; বহুকাল ধরিয়া পুরুষ যে নিঃসঙ্গ ইহা সর্ব্বদা ধারণার বিষয় করিতে হইবে, বহুকাল ধারণা

করিতে করিতে আমির ধ্যান হইবে—এই ধ্যানই আপনি আপনি ভাব। সর্ব্বদা আমাকে ইহার শ্রবণ চাই, মনন চাই এবং ধ্যান চাই—এই শ্রবণ মনন ধ্যান পরিপক্ক হইলে আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করা যায়। তাহা হইলেই জীবন্মুক্তি হয়।

এইরূপে জীবন্মুক্ত হওয়া বড় সহজ হইয়া গেল। না—যত সহজ ভাবিতেছ তত সহজ নহে। যখন খাওয়ার আস্বাদন টের পাওয়া যাইবে না; যখন রৌদ্র অগ্নিতে উত্তাপ বোধ হইবে না, যখন শীতেও কোন বোধ থাকিবে না, যখন সুখ ও দুঃখ, ঘৃণা লজ্জা, কিছুই বোধ হইবে না; তখন সত্য সত্যই আমি অখণ্ড চৈতন্য হইয়াছে। যতক্ষণ সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা এ সমস্ত বোধ হয় ততদিন কিন্তু দেহে বা প্রকৃতিতে আমি স্থাপিত হইয়া আছে। ততদিন সোঽহং মুখে বলিলে সোঽহং হওয়া হইল না। সোঽহং হওয়া হইল—প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া আপনি আপন ভাবে স্থিতি। মুক্ত পুরুষেরা কখন জড়ের মত থাকেন কখন মূক হয়েন কখন বা উন্মত্ত পিশাচ মত বাহিরে কর্ত্তা সাজেন ভিতরে কিন্তু অকর্ত্তা। যাঁহারা ততদূর হইতে পারেন নাই কিন্তু জ্ঞানানুষ্ঠানে রুচি আছে তাঁহারা সর্ব্বদা আত্মা ও অনাত্মার বিচার লইয়া থাকিবেন এবং ব্যবহারিক জগতে "আমি" কথার ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হইবেন। আমি কথা ব্যবহার না করিলে কথা কওয়া সহজে হয় না—তাই জানিয়া শুনিয়া পাকে প্রকারে ব্যবহার করা হয়, ভিতরে আমি কর্ত্তা নহি এ বোধ রাখা যায়। ইহা অপেক্ষাও কঠিন সুখ ও দুঃখ অনুভব করা বা শীত গ্রীষ্ম অনুভব করা। দেহে আত্মবোধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহা অনুভব হয়। এ সমস্ত স্থানেও এই নিশ্চয় করিতে হইবে যে মূঢ় হইয়া, আত্ম বিচার শূন্য হইয়া প্রকৃতির ব্যাপারে অহং আরোপ হইয়া গিয়াছে সেই জন্য পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে বাস্তবিক কিন্তু আমার আহারও নাই, নিদ্রাও নাই, ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই, জীবনও নাই, মৃত্যুও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই আমি সাক্ষী চৈতন্য, আমি নিঃসঙ্গ, আমি আপনি আপনি।

নিত্যক্রিয়ায় বসিবার পূর্ব্বে এবং নিত্যক্রিয়া হইতে উঠিবার সময়ে যদি তিন বেলা এই অভ্যাস গুলি করা যায় তবে কি হয় না? বহু দিন লাগিতে পারে—তা লাগিলেই বা। যদি নিশ্চয় ইহা উপায়েই হইবে তবে যবে কেন হউক না তাহাতে ক্ষতি কি? অভ্যাস কি করিবে?

শেষ খেলা।

গিয়াছে মা বেলা, হ'য়েছে মা খেলা
আমায় নিয়ে চল ঘরে।
গিয়াছে মা সাঝী, হ'লো যে মা রাতি
রেখো না গো আর আঁধারে॥
নতুন নতুন পুতুল দিয়ারে
ভুলায়ে রাখিছ আমারে।
(আমি) ভুলিবার মেয়ে নই মা তোমার।
ছাড়ব না আর তোমারে॥
অনেক খেল্‌না দিয়াছ আমায়
সাজায়ে সংসার ভিতরে।
মাগো—শেষ খেলার এবার হার হ'ল আমার
(তাই) কাঁদি কাতর অন্তরে॥

(গিরিডি)

৺প্রবোধচন্দ্রের স্মৃতি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

নারায়ণ! নারায়ণ! বলিতে বলিতে যে তনুত্যাগ করে তাহার গতি যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। তার পর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ৺কাশী যাইবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল; বাড়ীর সকলকে, সাধুমহাত্মাকে এবং ডাক্তার বাবুদিগকে যে ভাবে তুমি ৺কাশী পাঠাইবার জন্য ভেদ করিয়াছিলে—যদিও তোমার বাসনা আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে এবং সাধুবাক্যে জানিতেছি তোমার ৺কাশীলাভই হইয়াছে। এত পবিত্র তুমি ছিলে, এত সাধুহৃদয় তোমার ছিল। তাহাতে মনে হয় যেখানে তুমি থাকিতে সেই স্থানই ৺কাশী।

তোমার পূর্ব্বে হিরণ্যকুমার ৺কাশীলাভ করিয়াছে, তাহারও পূর্ব্বে সনৎকুমার ৺কাশী পাইয়াছে, তাহারও পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী ৺কাশী প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন। এতদ্ভিন্ন যশোমতী ; সর্ব্বগুণাধার আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ৺নীলকণ্ঠ, জ্যেষ্ঠ সহোদরা ৺ব্রজেশ্বরী ; কনিষ্ঠ ৺অতুলকৃষ্ণ, অগ্রজের বালকপৌত্র ইহারা গঙ্গাতীরে গিয়াছেন। ইহাদের সকলের কথা বলিব না—বলিতে পারা যায় না—তোমার কথা বলি অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ হইয়াও শ্রীভগবানের সঙ্গী ৺কাশী প্রাপ্ত তোমাদের কাছে প্রার্থনা হয় তোমরা আমার গতি করিও। নিজে অলস হইয়া থাকিয়া তোমাদিগের নিকট যে সাহায্য চাই তাহা নহে আপন চেষ্টায় যাহা পারি তাহাত করিতেছি তথাপি শ্রীভগবানে মিলিত তোমাদিগকে সময় থাকিতে জানাইয়া রাখিতেছি যেন আমার হইয়া তোমরা তাঁহাকে একটু জানাইয়া রাখিও। স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় তোমরা—তোমরা ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিলিয়াছ দুর্ব্বল আমরা আমাদের আবদ্ধী তোমাদের দ্বারা তাঁহার নিকট করা রহিল। আর অধিক কি বলিব।

সাধুমহাত্মার নিকটেও শুনিলাম—তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন তোমার সদ্গতি সম্বন্ধে তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস। তথাপি তোমার স্মৃতি রাখিবার বাসনা হয় কেন ?

তুমি এই জগৎ অরণ্যে নীরবে ফুটিয়াছিলে। নীরবে ফুটিয়া, নীরবে গন্ধ বিতরণ করিয়া এই দারুণ সংসার নিঃশব্দে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। কোন আড়ম্বর ছিল না, কত সুন্দর তুমি ছিলে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশের চেষ্টা ছিল না, যাহাদের সঙ্গ করিয়াছিলে তাহারাই তোমাকে জানিয়াছিল। তুমি যাহা করিতে, যাহা তোমার সাধ ছিল তাহা তোমার দৈনন্দিন কর্ম্ম-তালিকার খাতায় তুমি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ। কত সুন্দর তোমার সংগ্রহ, কত মনোহর তোমার হৃদয়ের ভাব। তুমি কখন তোমার কোন লেখা প্রকাশ কর নাই। দুই একটি প্রবন্ধ যাহা তুমি ৺হরিদ্বারে লিখিয়াছিলে তাহাও এখন দেখিতেছি। ১৩১০ সালের চৈত্রএকাদশী হইতে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কতক বিবরণ তুমি রাখিয়া গিয়াছ। ইহার পরে তুমি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলে আর কিছুই লিখিতে পার নাই। ইহাই তোমার স্মৃতিস্বরূপ থাকিবে। যতদূর পারি এই স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে ইচ্ছা হয়। এমন অনেক বস্তু তুমি রাখিয়া গিয়াছ যাহাতে দুঃখী মানুষের অনেক উপকার হইতে পারে। তুমি ৺হরিদ্বারে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলে তাহাই অগ্রে প্রকাশ করিতেছি।

হরিদ্বার ২৯ মে ১৯১২ অথবা ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ সাল চন্দ্রকলা চতুর্দ্দশী।

"হরিদ্বারের যেখানে আমরা আপাততঃ আছি তাহা হরিদ্বারের মধ্যে উত্তম স্থান। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এখান হইতে বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পর্ব্বতের কোলেই গঙ্গা আর কলকল নিনাদ এবং সাগরে সঙ্গত হইবার জন্য উন্মত্ত বেগ! সবই অতি হৃদয়াকর্ষক। পর্ব্বতের নাম চণ্ডীর পাহাড়। মা দক্ষ-যজ্ঞের সময় হিমালয় দিয়া আসিবার মুখে এই পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। মার আগমনের আর কোন চিহ্ন এখানে আছে কি না আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পর্ব্বতটি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত মার পদধূলি লইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত যেন সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া আছে এবং আগন্তুক পথিকদিগকে তাহার অংশ বিতরণ করিতেছে। যে দিন প্রথম আমি চণ্ডীর পাহাড়ে উঠি সে দিন সঙ্গে আরও ৩।৪ জন লোক ছিল। পর্ব্বতে উঠিবার দুইটি করিয়া রাস্তা আছে। একটি পুরাতন কিন্তু দুরারোহ। একটি নূতন ইংরাজ বাহাদুরদের সুতরাং সুগম। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এবং মা চণ্ডীর সংস্পর্শে বল পাইয়া সেই দুরারোহ পথ দিয়া সর্ব্বাগ্রে উঠিয়াছিলাম। পর্ব্বতাগ্রে উঠিয়াই এমন একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করিলাম—সেই সময়ে এত আনন্দ এবং প্রার্থনা প্রাণে জাগিয়া উঠিল যে আমি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই শব্দ পর্ব্বতের বহু স্থানে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার প্রার্থনা চারিদিকে বিঘোষিত করিল। আমি যেন একটু বল পাইলাম। মনে হইল মা যেন আমার প্রার্থনা শুনিলেন। পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-গুলি কত সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই সেই স্থানে মা গঙ্গার শতধারে প্রবাহিত হইয়া যাওয়া বড়ই সুন্দর। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভক্তের হৃদয় আরও সুন্দর—যে হৃদয়ে ভগবান্ বিরাজ করেন,—যে হৃদয় ভগবানের বসিবার জন্য সর্ব্বদাই—"

ইহা এই পর্য্যন্তই লেখা। ইহার পরের লেখাটিও আমরা দিতেছি। চণ্ডীর পাহাড় হইতে ভম্‌পার মঠে কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া ইহা লেখা হয়। পূর্ব্বের লেখার সহিত শেষের লেখার সম্বন্ধ আছে।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাবন্দনার সময় ব্রহ্মচারীর বেশ পরা ও সন্ধ্যা করা।

কি সাধ হয়? সাধ হয় ভীষ্মের মত ব্রহ্মচারী হইতে, প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীমাতার ধ্যানে বিভোর হইতে, ব্রহ্মচারীর প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপ মনের সহিত করিতে—আর সাধ হয় মনে যেন অতি ক্ষুদ্র, ব্রহ্মচারীর বিরোধী কোন চিন্তা বা কল্পনা না আইসে—সর্ব্বদা যেন ভর্গো দেবস্য ধীমহি লইয়া থাকি।

আর সাধ হয় সেবাধর্ম্মটি যথাযথ ভাবে শিক্ষা করিতে—তাঁকে সেবা করিয়া সেবা শিখিতে—তাঁকে নিষ্কাম ভাবে সেবা করিয়া ভগবৎসেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে। আর মনে হয় জগতে কেহ যদি কোন কাজের মত কাজ লইতে পারে, তবে তাহাতে যোগ দিতে। আর সাধ হয় প্রাণ যখন সর্ব্বত্র সেই আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিবে সেই অবস্থায় উত্তর কাশী অথবা আরও উপরে মায়ের কলনিনাদ শ্রবণ করিয়া বিভোর হইতে।

শঙ্কর! তুমি ত দয়ার সাগর। অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হও। আমার এই সাধ পূর্ণ করিবে কি? কতদিন ত গেল। অবশিষ্ট গোটা কয়েক দিন মানুষের মত কাটাই, নতুবা যেমন তেমনে কাটিবে—আবার আসিব আবার তোমার পূজা করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া মনোভিলষিত বর তপস্যা দ্বারা প্রার্থনা করিয়া লইব। কেন শঙ্কর! এ জন্মে আমার উপর সন্তুষ্ট হইবে না? আমি কি কৃপার অযোগ্য? শঙ্কর! তোমার কৃপার অযোগ্য কি জগতে কেহ আছে? শঙ্কর! আমি ত শুনিয়াছি যে তোমায় চায় সেই তোমাকে পাইয়া থাকে। তবে আমার সময় কি অন্য নিয়ম হইবে?

মা চণ্ডি! সেই দিন সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া যে তোমায় ডাকিয়াছিলাম, শক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি শোন নাই? আমার সেই চীৎকারে পর্ব্বতস্থ পশুপক্ষী—তোমার সেখানকার সর্ব্বজীবই ত শুনিয়াছিল আর কেবল তুমিই উহা শোন নাই তাহা ত নয় মা! তুমি যদি না শুনিবে তবে আজ আমার প্রাণে কে এই মহৎভাবের বীজ রোপণ করিল? আমি ত স্রোতেই চলিয়াছিলাম—কে আমায় ফিরাইল? কে আমার প্রাণে ব্রহ্মচারীর সৌন্দর্য্য জাগাইয়াছিল মা? এসব ত মা তোমারই কৃপা। জয় বিশ্বজননি! জয় বিশ্বজননি! তোমার আশীর্ব্বাদ আমার শিরে বর্ষিত হইয়াছে। আমার যত অশুভ সব কাঁটিয়াছে। আমি তোমায় মা বলিতে পারিয়াছি। এজন্মে আমার ইহাই

শান্তি। পরজন্মেও শান্তি। আর আমি জগতের লোকের দিকে তাকাইব না। আর আমি কাহারও মন যোগাইবার জন্য কোন চেষ্টা করিব না। আমার সকল চেষ্টা তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতেই কাটাইব। তোমার সাড়া পাইলে তোমার কোলে বিশ্রামলাভ করিব। যত আবদার তোমায় জানাইব তুমি যাহা ভাল করিবে। প্রাণে তোমায় ছাড়া, তোমায় পূজা ছাড়া, তোমার ধ্যান ছাড়া, তোমার সেবাশিক্ষা ছাড়া তোমার নিকট যাইবার রাস্তা ছাড়া— অন্য কিছুরই বাসনা আর থাকিবে না। মা আমার উপর প্রসন্ন হইয়া একবার তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দাও। হরিদ্বার।

ইহাই প্রবোধের শেষ লেখা। যে ভাবে দেহত্যাগ করিয়া গেল তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় বুঝি তাহার সেই দেহে তাহার সাধ এই দুরন্ত-কালে পূর্ণ হয় না। তাই তাঁহার নিকটে সাধ পূর্ণ করিতে যাইতে পারিল।

ক্রমশঃ—

পথভ্রান্ত।

পথের ভিখারী ফিরে দুয়ারে।
বৃথা কি হারাবে বেলা শুধুই ঘুরে?
দুর্গম কান্তার এল হারাল দিশি।
ঘনায়ে এল পথে অন্ধ নিশি॥
কে তারে শুধায়—কে যায় সুদূর পারে?
হারিয়ে বুকভাসে, নয়ন ধারে॥
আলসে গেল বহি দীর্ঘ তরুণ বেলা।
এখন মিটেছে সাধ ফুরাল খেলা॥
আর কেন মিছে ডাকা, মিছে রাখা ধ'রে
বিদেশী ফিরিতে চায় আপন ঘরে॥
কোন্ সে সুদূরে কাহার বিজন বাসে।
মিলন ব্যাকুল স্বদেশ, স্বজন আসে॥
তোমরা পথিক কে যাও উজল রথে?
কনক কিরণ রাশি ছড়ায়ে পথে।
ভিখারী প্রবাসী তারে নেবে কি সাথে?
পাথেয় তাহার নাই কিছুই হাতে।
যোগ্যতা কিছুই নাই তবু যেতে চায়
স্থান যদি নাহি মিলে ক্ষতি নাহি তায়॥
তারে দিও ঠাঁই সবার চরণ তলে।
দিও না ফিরায়ে তারে নয়নের জলে॥

মৃ (ভবানীপুর)

অন্বেষণ।

কেন মিছে খুঁজ খুঁজে মর ওরে মন।
হৃদয় মাঝারে পাবে হৃদয় রতন॥
প্রেম চক্ষু উন্মীলন কর একবার।
তাহ'লে তাহাতে পূর্ণ দেখিবে সংসার॥
পিতা মাতা হৃদয়েতে কর অন্বেষণ।
স্নেহরূপে স্নেহময়ে পাবে দরশন॥
সতীর পবিত্র মুখ পানে দেখ চেয়ে।
প্রেমের দেবতা রূপে পাবে প্রেমময়ে॥
শিশুর পবিত্র মুখ দেখ একবার।
সদানন্দ রূপে তথা করেন বিহার॥
সুধাংশুর সুধা তিনি ফুলের সৌরভ।
জীবের জীবন তিনি গুনীর গৌরব॥
উদ্ভিদ চেতন আর জড় আদি করি।
সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজেন হরি॥
পাপীর হৃদয় ছাড়া আর সব স্থানে।
প্রেম চক্ষে নেহারিলে পাবে নারায়ণে॥
সর্ব্বব্যাপী কিন্তু তাঁরে না খুঁজিলে নয়।
হৃদি মাঝে অন্বেষণ কর সাধনায়॥

কি (কলিকাতা)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ড।

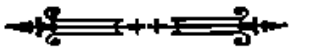

অশ্বল ব্রাহ্মণ।

বিদেহ-রাজ্যে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহু দক্ষিণা-সম্পন্ন অশ্বমেধ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে বহু দেশদেশান্তরে পণ্ডিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হয়েন। কুরু এবং পাঞ্চালদেশ হইতেও, এই সভায় বহু ব্রাহ্মণ বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। বিদেহাধিপতি জনকের আগ্রহে এবং কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণের সুব্যবস্থায় সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলী যথাবিধি সৎকৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন।

বিদেহাধিপতি আপন যজ্ঞসভায় সেই মহতী বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ দেখিয়া পুলকিত হইলেন, এবং ভাবিলেন ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্, কিন্তু কে এই ব্রাহ্মণ-সমাজে বিদ্যায় সমধিক শ্রেষ্ঠ? তিনি ইহা জানিতে নিতান্ত কৌতূহলপরবশ হইলেন, এবং কি উপায়ে ইহা জানা যাইবে মনে করিয়া তরুণবয়স্ক সহস্র গো. গোষ্ঠে অবরুদ্ধ করিলেন, এবং প্রতি গোর উভয় শৃঙ্গে কুড়ি তোলা করিয়া সুবর্ণ আবদ্ধ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, যিনি আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) তিনি এই গোষ্ঠে আবদ্ধ গোসমূহ গ্রহণ করুন। রাজর্ষি এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহই আপনাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে সাহসী হইলেন না।

অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্যকে বলিলেন,—বৎস সামশ্রবাঃ! এই গোসমূহ আমাদের গৃহে লইয়া যাও। আদেশপ্রাপ্ত শিষ্য, গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলেন।

এদিকে সমবেত ব্রাহ্মণগণ যখন দেখিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য কার্য্যতঃ আপনাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন সকলেই সবিশেষ কুপিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠতায় সমকক্ষ, তথাপি

যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া আপন শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতেছেন? জনকের হোতা অশ্বলও এই ব্রাহ্মণগণের অন্যতম। অশ্বল রাজপুরোহিত, রাজার আশ্রিত; আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা তাঁহার স্বাভাবিক! তিনি এই অভিমান ও তদুপযুক্ত ধৃষ্টতা লইয়া পরুষবাক্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—কেমন হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি নাকি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিৎ, সর্ব্বদা চন্দ্রকোটি সুশীতল পরমপদস্পর্শে যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় আপ্যায়িত, শান্ত। যাজ্ঞবল্ক্য বিনীত বচনে বলিলেন,—ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা শত শত প্রণাম করি। আমি ব্রহ্মিষ্ঠ নহি, প্রয়োজন ছিল, এই জন্যই আমি এই গোসমূহ গ্রহণ করিয়াছি।

হোতা অশ্বলের রোষকষায়িত হৃদয় এই অনুদ্ধত বচনেও প্রসন্ন হইল না। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠজন-লভ্য সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রশ্নোত্তরে আপন শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিতে বাধ্য মনে করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিবেন সংকল্প করিলেন *।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! ঋত্বিক্ অগ্নি প্রভৃতি যে সমুদয় উপকরণ লইয়া যজমান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই মৃত্যুকবলিত এবং মৃত্যুবশীকৃত—কেননা সাধ্য যজ্ঞ এবং তৎসাধন ঋত্বিক্ প্রভৃতি, এমন কি, যজমানের বাক্য, মন, চক্ষু, প্রাণ ইত্যাদি সমস্তই ত প্রতিক্ষণ মৃত্যুদ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে। জীব সুখপ্রয়াসী, সুখ-সাধন তাহার আবশ্যক, অথচ মৃত্যু এই সুখের বিরোধী। অনুভূয়মান বিষয়সমূহ রূপান্তরিত করিয়া, অনুভবের উপকরণ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শক্তি হ্রাস করিয়া, মানসিক রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া—এই পরিবর্ত্তন স্বরূপ মৃত্যু অশেষ প্রকারে জীবের অশেষ যাতনা উপস্থিত করিতেছে। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য! বল দেখি কি উপায়ে যজমান বহু দংষ্ট্রা সমন্বিত এই মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিবে? মৃত্যুবশীকৃত যজমান কি উপায়ে নির্মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে?

যাজ্ঞবল্ক্য] যজমান হোতৃনামক ঋত্বিক্ এবং বাক্য দ্বারা মৃত্যুগ্রাস হইতে

---

* বলা বাহুল্য যাজ্ঞবল্ক্যের গো গ্রহণে ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও অশ্বলের কোপ, পরুষবাদিতা এতৎসমুদয় ব্রহ্মবাদিগণের বশীকৃত মায়া দ্বারা লোক-ব্যবহারের অনুকরণ বা অভিনয়মাত্র।

মুক্তিলাভ করিবে। বিরাট্ যজ্ঞপুরুষের মুখস্থানীয় অগ্নিদেব আধ্যাত্মিক ভাবে যজমানের বাগিন্দ্রিয়রূপে এবং অধিযজ্ঞস্বরূপে তিনিই হোতৃরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যজমানের বিরাট্ আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি এবং ক্ষুদ্র ভাবনাই এই ক্ষুদ্রতা লাভের কারণ। ক্ষুদ্রতাই জন্মমরণ-বাহুল্যরূপ দুঃখ-বাহুল্যের কারণ। মানব যদি অনবরত আপনাকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা ভাবনা করে তবে সে ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইয়া যাইতে পারে এবং মানবীয় পরমায়ু কালকে পিপীলিকা রাজ্যের মৌহূর্ত্তিক জন্মমরণ কাল দ্বারা সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক মরণ দুঃখকে সহস্র সহস্র মরণ দুঃখে পরিণত করিতে পারে। পক্ষান্তরে মানব আপন বিরাট্ স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিরাট্ রূপে উপনীত হইতে পারিলে মানবীয় পরমায়ু শতবৎসরকে দ্বিপরার্দ্ধবৎসররূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, মানব-ভোগ্য লক্ষ লক্ষ জন্মমরণদুঃখের গ্রাস হইতে মুক্তিও লাভ করিতে পারে।

মলিনচেতা ব্যক্তি, এই শুভ ভাবনা করিবার অনধিকারী। যজ্ঞ, দান, তপস্যা-রূপ কর্ম্ম করিতে করিতে এই অধিকার লাভ হয়। জনক বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া চিত্ত-বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, জনক বিশুদ্ধ-চিত্ত যজমান, উপনিষদ্দেবী তাঁহার উদাহরণে মুমুক্ষুজীবকে চিত্তবিশুদ্ধির উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অথর্ব যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদরূপে ভাবনাশুদ্ধির উপদেশ করিতেছেন—যজমানকে যাজ্ঞিকজনলভ্য বিরাট্ আত্মস্বরূপে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যরূপে বলিতেছেন—এই যে যজমানের বাক্, ইহাই অধিযজ্ঞে হোতা, কেননা এই যে যজমানের বাগিন্দ্রিয় ইহাই অগ্নি এবং এই যে অগ্নি ইনিই যজ্ঞভূমিতে হোতৃরূপী। ইহাই মুক্তি এবং অতিমুক্তি অর্থাৎ এক অগ্নিই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধি-দৈবিক মূর্ত্তিতে অবভাসমান। যে অগ্নি তত্ত্বতঃ ব্রহ্মস্বরূপ তিনি আধিদৈবিক ভাবে হিরণ্যগর্ভরূপী এবং তিনি হিরণ্যগর্ভের মুখস্বরূপ অগ্নি, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে যজমানের বাগিন্দ্রিয়রূপে অধিযজ্ঞভাবে হোতৃরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যজ্ঞাবসানে যজমান যদি আপন বাগিন্দ্রিয়কে এবং হোতৃনামক ঋত্বিক্‌কে হিরণ্যগর্ভরূপী আপনস্বরূপের মুখরূপধারী অগ্নিরূপে ভাবনা করেন তবে তাহাই মুক্তি এবং এই ভাবনার ফলে যজমানের বাগিন্দ্রিয় এবং হোতৃ-পুরুষের যে অগ্নিভাব লাভ তাহাই অতিমুক্তি।

স্বাভাবিক অজ্ঞানজনিত কর্ম্মসংস্কাররূপ মৃত্যু দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই মৃত্যু আত্মসহচরী স্মৃতির সাহায্যে

বাহিরে নানারূপ ত্রিগুণময় বিষয়রজ্জু রচনা করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীবকে বন্ধন করিয়া লইতেছে, অবশেষে পরমাণুশেষে সমষ্টি মৃত্যুর নিকট ইহাকে বলির ন্যায় উপহার দিতেছে। উপনিষদ্‌দেবী এই কর্ম্মসংস্কাররূপ মৃত্যুর গ্রাস হইতে যজমানকে মুক্ত করিবার জন্য ক্ষুদ্র সংস্কার-সহচরী ক্ষুদ্র স্মৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া বিরাট্ আত্মস্মৃতি আনয়নের জন্য, প্রথম হিরণ্যগর্ভস্বরূপ সূত্রাত্মার মুখাবয়ব নির্দ্দেশ করিলেন।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ম্মরূপ মৃত্যুর গ্রাস হইতে অতিমুক্তি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিলেন দেখিয়া হোতা অশ্বল পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুর আশ্রয়স্থানীয় সকাম দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞের পরিণাম হেতু যে কাল তাহাও কর্ম্মেরই মত বস্তুপরিবর্ত্তনকারী মৃত্যুস্বরূপ সুতরাং তাহার গ্রাস হইতেও যজমানের অতিমুক্তি আবশ্যক মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! আমার আরও প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের সাধন বস্তু সমূহ ত সকলই অহোরাত্ররূপী কালের গ্রাসে পতিত, এবং কালবশীকৃত। কি উপায়ে যজমান এই অহোরাত্ররূপী কালের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতে পারে? এই যে কালবশে যজমানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অক্ষমরূপ হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম-অসমর্থ হইয়া পড়ে; এই যে—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্
দশন-বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।

হইয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য! কি উপায়ে জীব এই কালকবল হইতে অব্যাহতি পাইবে?

যাজ্ঞ] অধ্বর্য্যু নামক যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ দ্বারা এবং আদিত্যস্বরূপ চক্ষু দ্বারা যজমান এই কালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে।

এই যে যজমানের চক্ষু ইহাই অধ্বর্য্যু, কেননা এই চক্ষুই আদিত্য এবং আদিত্যই অধ্বর্য্যু। যজমানের চক্ষু এবং অধ্বর্য্যু যজ্ঞের এই উপকরণদ্বয় মুখাবয়বের ন্যায় যজমানের ভাবনার ক্ষুদ্রতায় আধ্যাত্মিক ও আধিযজ্ঞিকরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া আছে তাহাই যজমানের ভাবনা বিশালতায় আধিদৈবিক সূর্য্যরূপে ভাবিত হইয়া যজমানের মুক্তির কারণ হয়। এই ভাবনাই মুক্তি এবং এই আদিত্য-ভাবনার ফলে যজমানের চক্ষু ও অধ্বর্য্যুর যে আদিত্য-ভাব-প্রাপ্তি তাহাই কালগ্রাস হইতে অতিমুক্তি। সর্ব্বদা প্রকাশময় সূর্য্যদেবের যেমন

অহোরাত্ররূপ কালগ্রাসে পতিত হইবার আশঙ্কা নাই, তদ্রূপ সূর্য্যভাবাপন্ন-দৃষ্টি যজমানও ভাবনাফলে কালগ্রাস হইতে অতিমুক্ত হইয়া অমরলাভ করেন।

কাল দ্বিবিধ—অহোরাত্র স্বরূপ এবং তিথ্যাদিরূপ। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসাগুরুরূপ অহোরাত্রস্বরূপ কালের গ্রাস হইতে যজমানের অতিমুক্তির যথাযথ ব্যাখ্যা করিলেন, দেখিয়া অশ্বল পুনরপি তিথ্যাদি স্বরূপ কালের গ্রাস হইতে যজমানের অতিমুক্তির উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! এই যজ্ঞের উপকরণ স্বরূপ যাবতীয় পদার্থ শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষরূপ তিথি সমূহ দ্বারা কবলিত, এবং তিথি বশীকৃত, যজমান কি উপায়ে এই তিথিরূপ কালের মুখ হইতে মুক্তিলাভ করে?

যাজ্ঞ] উদ্গাতা (সমবেদজ্ঞ ঋত্বিক্) এবং আপন প্রাণ সাহায্যে যজমান তিথিরূপ কালের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে। যজমানের প্রাণই যজ্ঞভূমিতে উদ্গাতা, কেননা এই প্রাণই আধিদৈবিকরূপে হিরণ্যগর্ভের প্রাণবায়ু, আবার এই হিরণ্যগর্ভের প্রাণবায়ুই যজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য উদ্গাতামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যখন যজমান ভাবনার প্রসাদে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করেন, যখন আপন প্রাণবায়ুকে এবং যজ্ঞের ঋত্বিক্‌বিশেষ উদ্গাতাকে হিরণ্যগর্ভ প্রাণস্বরূপ বায়ুরূপে ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হন, তখন তাহাই তিথ্যাদিরূপ কালগ্রাস হইতে মুক্তি এবং এই ভাবনার ফলে যজমানের প্রাণ-বায়ু এবং উদ্গাতার যে হিরণ্যগর্ভ-প্রাণরূপে পরিণতি, তাহাই অতিমুক্তি।

যদিও চন্দ্রকলার উপচয়াপচয় হইতে তিথিরূপ কাল নির্গত হয়, এবং তজ্জন্য অহোরাত্ররূপ কালের গ্রাস হইতে মুক্তির জন্য যেমন সূর্য্যভাব প্রাপ্তি আবশ্যক, তদ্রূপ তিথিরূপ কালগ্রাস হইতে মুক্তির জন্য চন্দ্রভাব প্রাপ্তি আবশ্যক * তথাপি মনের কার্য্য প্রাণবৃত্তি পূর্ব্বক, অতএব হিরণ্যগর্ভের মনোরূপী চন্দ্রের কার্য্যস্বরূপ তিথি প্রভৃতি হিরণ্যগর্ভের প্রাণস্বরূপ বায়ুরই কার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অতিমুক্তির জন্যও বায়ুভাবনাই গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক যাজ্ঞবল্ক্য তিথিরূপ কালের গ্রাস হইতেও অতিমুক্তি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া ফেলিলেন দেখিয়া অশ্বল পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—

---

* মাধ্যন্দিনীয় শাখায় প্রাণে এবং উদ্গাতায় চন্দ্রভাবনার ফলে তিথিরূপ কালের কবল হইতে অতিমুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাঃ ভাঃ

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! যজমান মৃত্যুমুখ হইতে অতিমুক্ত হইয়া কাহার আশ্রয়ে ফলপ্রাপ্ত হয়? কারণ, এই যে আকাশ, ইহা যেন মনে হয়, নিরালম্বন। যজমান তাহাকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবেন এবং অতিমুক্তি ফল-ভোগ করিবেন?

যাজ্ঞবল্ক্য] ব্রহ্মা (অথর্ব্ববেদজ্ঞ ঋত্বিক্)। এবং আপন মনকে চন্দ্ররূপে ভাবনা করিয়া যজমান স্বর্গলোক লাভ করেন, এবং অতিমুক্তি ফল ভোগ করেন। যজমানের মনই ব্রহ্মা, কেননা মনই আধিদৈবিকরূপে চন্দ্র এবং এই চন্দ্রই যজ্ঞভূমিতে ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্। যদি যজমান ব্রহ্মা এবং আপন মনকে চন্দ্র-স্বরূপের ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হয়েন তবে সেই ভাবনাই যজমানের মনের মুক্তি এবং এই মুক্তির ফলে যজমানের মন ও ব্রহ্মার যে চন্দ্রভাবপ্রাপ্তি তাহাই অতিমুক্তি।

হোতৃবর! অশ্বল! এই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদত্ত হইল; সম্প্রতি আপনার অজিজ্ঞাসিত হইলেও আমি পূর্ব্বোক্ত ভাবনার অঙ্গ বলিয়া কতিপয় সম্পদের বর্ণনা করিব।

অশ্বল] সম্পদ কি?

যাজ্ঞ] যথাশক্তি অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে (কোনরূপ সাম্য লইয়া) যে অশ্বমেধাদি ভাবনা এবং তদ্দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ন্যায় ফল সম্পাদন, তাহাকেই সম্পদ্ বলে। উদাহরণে এই লক্ষণের অর্থ স্পষ্টতররূপে উপলব্ধ হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে কর্ম্মের যে ফল শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, কেবল ঐ কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠানেই তৎফলসিদ্ধি যুক্তিযুক্ত মনে হয়, ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া পক্ষান্তরে অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুধু ভাবনারূপ সম্পদে কি ঐ ফলের সিদ্ধিসঙ্গত? তদুত্তরে বক্তব্য এই—রাজসূয়, অশ্বমেধ পুরুষমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি কতিপয় যজ্ঞে সকল বর্ণের অধিকার নাই অথচ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞসমূহ যে যে শ্রুতির প্রতিপাদ্য তৎসমুদয় পাঠে দ্বিজাতি মাত্রেরই সমান অধিকার রহিয়াছে, এরূপ স্থলে অপর বর্ণের পক্ষে ঐ শ্রুতিভাগের অধ্যয়ন অনর্থক হয়, এই অন্য শ্রৌতসিদ্ধান্ত এই—পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে অনধিকারী দ্বিজাতিগণও আপন অধিকারভুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে বা অন্য শ্রৌতকর্ম্মে অশ্বমেধাদি ভাবনারূপ সম্পদের সাহায্যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবেন।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! এই যজ্ঞে হোতা কতটি ঋক্ দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন?

যাজ্ঞ] হোতা তিনটী ঋক্ দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন।

অশ্বল] কি সেই তিনটী ঋক্?

যাজ্ঞ] পুরোহনুবাক্যা প্রথম, যাজ্যা দ্বিতীয় এবং শস্যাই ইহাদের তৃতীয়। (যে জাতীয় ঋক্ যজ্ঞকালের পূর্ব্বে স্তুতিরূপে প্রযুক্ত হয় উহা পুরোহনুবাক্যা, আর যজ্ঞকালে যজ্ঞনির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহাই যাজ্যা এবং অগ্রের যে ঋগ্‌জাতি স্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাই শস্যা। যত প্রকারের ঋক আছে, তৎসমুদয়ই এই ত্রিজাতির অন্তর্ভূত।

অশ্বল] এই ত্রিবিধ ঋক্‌দ্বারা যজমান কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন?

যাজ্ঞ] যাহা কিছু প্রাণিপুঞ্জ আছে, তৎসমুদয় অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ (যাজ্ঞিক নিজের প্রযুক্ত ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা) এই ত্রিভুবন জয় করেন। কেননা (ঋত্বিক্ ত্রিজাতীয় ঋক্ যজ্ঞে ব্যবহার করেন, তদ্দ্বারা ত্রিভুবন জয় করা হয়)। এখানে ঋক্ ও তিন লোক ও তিন এই সংখ্যা সাম্য লইয়া ঋত্বিক্ আপন ভাবনাবলে প্রযুক্ত মন্ত্রত্রয়কে ত্রিলোকীত্রয়ের কারণরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, এই জন্য ইহা সম্পদ্।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে ত্রিলোকী জয় করিতে হইলে যে সমুদয় উপকরণ আবশ্যক, তাহার কিছু নাই অথচ মনে মনে ভাবনা করিলাম—এই আমি ত্রৈলোক্য জয় করিলাম তাহাতেই ত্রৈলোক্য জয় হইয়া গেল ইহা ব্যর্থ কল্পনামাত্র।

তদুত্তরে বক্তব্য এই, যতদিন আত্মা সত্যসঙ্কল্প থাকেন বা যখন পুনরায় সংসার-মলনাশে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া অত্যধিক সত্যসংকল্প হন, ততদিন বা তখন ভাবনা ও কল্পনা শব্দের অর্থ এক, ততদিন বা তখন কল্পনামাত্রেই উহা সত্য হইয়া যায়। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আপন মনে 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' পূর্ব্ব-সৃষ্টির ন্যায় বস্তুসমূহ কল্পনা করিতে লাগিলেন, আর এদিকে বস্তুসমূহের সৃষ্টি হইল। মহর্ষি গাধি অন্তর্জ্জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ ভাবনা হইল—আমি মৃত্যুনাম্নী শারিত, এই মহিলাম, এই আমার ব্যাঘপল্লীতে পুনর্জ্জন্ম, এই আমার বিবাহ, এই রাজহস্তীর শুণ্ডাকর্ষণে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ, এই রাজা

হইলাম, ইত্যাদি যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইয়া গেল ইত্যাদি উদাহরণ নিভৃত-হৃদয়ে আলোচনা করিলে আর এ সংশয় থাকে না।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্) এই যজ্ঞে কতটি আহুতি দ্বারা হোম করেন?

যাজ্ঞ] তিনটী।

অশ্বল] কি সেই তিনটী?

যাজ্ঞ] সমিৎ্ ঘৃত প্রভৃতি যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, এবং মাংসাদি যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া অতীব শব্দ করে এবং দুগ্ধ সোমরস প্রভৃতি যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলগত হয় এই সেই তিনটী আহুতি।

অশ্বল] এই ত্রিবিধ আহুতি দ্বারা যজমান কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন?

যাজ্ঞ] এই ত্রিবিধ আহুতি মধ্যে যে আহুতিসমূহ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, তাহা দ্বারা যজমান আহুতিরই মত উজ্জ্বল স্থান দেবলোক লাভ করেন। এবং যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া অতীব কুৎসিত শব্দ করে, যজমান তাহা দ্বারা পিতৃলোক জয় করেন। কেননা পিতৃলোকসংবদ্ধ সংযমনী নামক যমপুরীতে জীবগণ অসহনীয় যম-যাতনায় কাতর হইয়া "ছাড়, ছাড়, মরিলাম, মরিলাম" ইত্যাদি উৎকট শব্দ করিয়া থাকে, এই উৎকট শব্দসাম্য আছে বলিয়া উৎকট শব্দকারী আহুতির ফলে যজমান পিতৃলোক জয় করেন। অর্থাৎ আহুত মাংসাদি দ্রব্যের উৎকট শব্দ শ্রবণে এই আমি পিতৃলোক জয় করিলাম এই ভাবনাফলে ঐ আহুতিই পিতৃলোক জয়ের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে যে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলগত হয়, তাহা দ্বারা যজমান মনুষ্য-লোক জয় করিয়া থাকেন। কেননা মনুষ্যগণ - ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, আহুতিও প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে অধিশয়িত হইতেছে দেখিয়া ভূতল-স্থিতি-সাদৃশ্যে এই আমি মনুষ্যলোক জয় করিলাম এই ভাবনায় মনুষ্য-লোক জিত হইয়া যায়।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! যজ্ঞকালে-ব্রহ্মা দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কতটি দেবতার সাহায্যে যজ্ঞ রক্ষা করেন?

যাজ্ঞ] একটী মাত্র দেবতার সাহায্যে ব্রহ্মা যজ্ঞ রক্ষা করেন।

অশ্বল] কে এই একটী দেবতা?

ক্রমশঃ

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অস্তৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৭ম বর্ষ।] ১৩১৯ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

প্রীতি-ভিক্ষা।

আঘাতিয়া মর্ম্মবীণা হে প্রিয় আমার!
যে সুর তুলেছ বক্ষে, ঝঙ্কারে তাহার
গোপন হৃদয় ব্যথা গলিয়া ঝরিয়া
উৎস রূপে বক্ষভরি আসিছে যে নামি—
তোমার চরণ প্রান্তে পড়িতে লুটিয়া,
বল মোরে সেকি ভাল লাগিয়াছে স্বামি?
বিজন বিপিনে কোথা তোমারি উদ্দেশে
বনফুল ঝ'রে পড়ে নিস্তব্ধ নিশায়,—
নিবেদিয়া যাহা কিছু সর্ব্বস্ব তাহার,
সে ক্ষুদ্র মরণ তার সে কি বৃথা যায়?
পল্লব অঞ্চল প্রান্তে লুকায়ে দোয়েল
তোমারে শুনায় তার মুগ্ধ কণ্ঠ বাণী,
ক্ষুদ্র বিহগের সেই ক্ষণিক সাধনা—
সে তৃপ্তি কি বিন্দু তৃপ্তি দেয় তোমা আনি?
বিশ্বের আরতি মাঝে ক্ষুদ্র জ্যোতি কণা
অনুরাগ দীপ্ত নেত্রে চেয়ে থাকে তারা
তোমার সন্তোষ তার প্রাণের কামনা
মিটায়ে ঢালোকি সেথা করুণার ধারা?
এ ব্যথা নহে গো শুধু আঘাত বেদনা
তব প্রীতি মাগিবারে উন্মুক্ত ঝরণা।
তোমার কঠোর প্রেম দেছে শান্তি সুধা,
সে তৃষ্ণা মিটেছে নাথ! নাহি আর ক্ষুধা।
যে চাহে অনন্ত প্রেম নিত্য ভালবাসা
তার কাছে শত তুচ্ছ মরতের আশা॥

মৃঃ—(ভবানীপুর)

প্রার্থনা।

হে প্রণত প্রিয়! হে ত্রিলোক মঙ্গল! হে আত্মন্! কি আর জানাইব? তোমাকে জানিয়া—অন্ততঃ বিশ্বাসেও জানিয়া যাহাতে আমরা তোমার ভজনা করিতে পারি তুমি সেইরূপ অনুগ্রহ কর। স্বামী শ্রীধর শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যায় একস্থানে বলিয়াছেন—যস্তবং যোগমায়য়া গুপৈ সহ যো যোগস্তেন মোহিতম্। অতো বিশ্বস্য মঙ্গলং বিধেহি যথা স্বামচিন্ত্যানন্তশক্তিং জ্ঞাত্বা ভজেৎ তথানুগৃহানেত্যর্থঃ। সত্য কথা ভাবনায়, বাক্যে এবং কর্ম্মে—তোমাকে জানাইয়া সমস্ত করাই নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ। ইহা বুঝি। তোমাকে গোপন করিয়া—না জানাইয়া কিছু করাই ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী হওয়া ইহাও বুঝি। ভক্ত হইতে চাই, সতী হইতে চাই, পবিত্র হইতে চাই ইহাও সত্য। তথাপি যে তোমাকে জানাইয়া সব করিতে পারি না ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। হে প্রভু! বেশ বুঝিতেছি তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের কোন সাধ্য নাই যাহাতে তোমার আজ্ঞা আমরা পালন করিতে পারি। কেননা অতি সহজ করিয়া—যাহাতে সকলে পারে এরূপ করিয়া তুমি তোমার আজ্ঞা আমাদিগকে জানাইতেছ তথাপি আমরা তোমায় জানাইয়া সকল কর্ম্ম করিতে পারি না। দেহের ও মনের সকল অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া সুখ দুঃখ সমস্ত সহ্য করিতে তুমি বল। আমরা তাহাও পারি না। দেহে আত্ম বোধ করিয়া দেহের ও মনের দুঃখকে আমার দুঃখ মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়ি। হে সকল মঙ্গলাধার! তুমি প্রসন্ন হইলে আর কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। তুমি অনুগ্রহ করিলে অসাধ্য সাধনে বাধা কি?

তোমার অনুগ্রহ যে সর্ব্বদা আছে তাহা কে বুঝিতে পারে? যে সাধক প্রাণপণে চেষ্টা করে—শতবার বিফল মনোরথ হইয়াও চেষ্টা ছাড়ে না সেই তোমার অনুগ্রহ কি তাহা বুঝিতে পারে।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবের উপরে সর্ব্বদা অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছেন। মেঘ সমান ভাবে কণ্টকবৃক্ষে ও পুষ্পবৃক্ষে বারিবর্ষণ করে। কাঁটাগাছ বলিয়া তাহার প্রতি কৃপণতা করে না। শ্রীভগবানত একজনের কৃপার মালিক নহেন যে একস্থানে কৃপা করিলেই তাঁহার কৃপা ফুরাইয়া যাইবে? তাঁহার অপার করুণা। করুণাময়ের অপার করুণা সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবেই বর্ষিত হইতেছে।

তবু কেন আমরা তাঁহার অনুগ্রহ ধরিতে পারি না? এই টুকু বুঝিবার জন্য কিছু আয়োজন করা চাই। তুমি গো-গাড়ীতে কোথাও যাইতেছ। রাস্তার কর্দ্দমে গাড়ীর চাকা বসিয়া গেল। গাড়ী আর চলে না। তুমি তখন গাড়ী হইতে নাঁবিয়া গুড়ুক সাজিয়া আলবোলায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিলে। আর রাস্তা দিয়া যে লোক যাইতেছে তাহাকেই বলিতে লাগিলে ভাই! আমার গাড়ীর চাকাটা ঠেলিয়া দিয়া যাওনা! রাস্তার পথিক তখন তোমায় কি বলিবে? বলিবে না কি লোকটা কি বেয়াদব। বাবু নবাব। আপনি বসিয়া গুড়ুক খাইতেছেন আর আমরা যেন উঁহার খানসামা আমরা উঁহার চাকা ঠেলিব! কেহই তোমার সাহায্য করিবে না। কিন্তু তুমি যদি কোমরে কাপড় বাঁধিয়া আপনি চাকা ঠেলিতে প্রাণপণ কর তবে যে পথিক ইহা দেখিবে সেই তোমার ক্লেশ দেখিয়া বলিবে বাবু লোকটি বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। এস আমরা ইঁহার চাকা ঠেলিয়া দি। তুমি চেষ্টা কর। পুনঃ পুনঃ কর। শত শত লোক তোমার সাহায্যার্থ আসিবে। সমস্তদেবতা এমন কি শ্রীভগবানও গোপনে থাকিয়া তোমার সহায় হইবেন। তাই বলি ভাল হইতে চেষ্টা কর শ্রীভগবানের অনুগ্রহ তিনিই বুঝাইয়া দিবেন। যে চেষ্টা হীন কেহই তাহাকে অনুগ্রহ করিতে রাজী নহেন। প্রবল পুরুষার্থ কর। তাহাতেও হইবে না। তখন কাতর ভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর! বল ঠাকুর! যতদূর সাধ্য তাহা ত করিতেছি কিন্তু আমার দ্বারাত কিছুই হয় না। তুমি প্রণতপ্রিয়! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমায় কৃপা কর। সর্ব্বপুরুষার্থ করিয়াও কাতর ভাবে যখন প্রার্থনা করিবে তখন তাঁহার অনুগ্রহ বুঝিবে।

হে দয়াময়! আমার আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। হে অগতির গতি! হে দীনবন্ধু! হে জগন্নাথ! এই যে আমরা কত কার্য্য করিতেছি এই কার্য্যে কি তুমি আমাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছ? এই সমস্ত কার্য্য কি তুমি আমাদিগকে করাইতেছ? ঠিক ইহা বুঝিলাম প্রভু! তুমি যে তোমার অনভিপ্রায়ে গাছের পাতাটি অবধি নড়িতে পারে না। কিন্তু আমি যে এত কার্য্যে স্পন্দিত হইতেছি, সে যে তোমার অভিপ্রায়ে তাহা আমি বুঝিলাম ঠিক? যদি বুঝিতাম তবে কি বলিতাম এসব কর্ম্ম আমার কবে ছুটিয়া যাইবে? ভালকর্ম্ম, মন্দকর্ম্ম যে যাহা করিতেছে সে কি তোমার ইচ্ছায়? জন্ম, মৃত্যু, যম যাতনা যাহা হইতেছে সেওকি তোমার ইচ্ছায়? বিরোধ, বিবাদ, মতভেদ, কাটাকাটি, মারামারি,

রক্তারক্তি যাহা হইতেছে সে কি তোমার ইচ্ছায়? কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির কার্য্যত আমাদেরও ভাল লাগে না। আর তোমার? পরম প্রেমময় তুমি, কাম তোমার ভাল লাগিবে? পরম শান্ত তুমি! ক্রোধ তোমার ভাল লাগিবে? সুখময় তুমি! অপার দুঃখ যে আত্মহত্যা তাও তোমার ইচ্ছায় ঘটিবে? এ সব কি তোমার ইচ্ছায় হইতেছে? ইহাত প্রভু! বুঝিতে পারি না। আমি স্থূলবুদ্ধি! আমি মূর্খ! ইহাত আমি বুঝিতে পারি না। ব্যাখ্যাত অনেক শুনি—কিন্তু তাহাতে ত হৃদয় জুড়াইয়া যায় না। তাই বলি যে রাজ্যে ঐ সমস্ত ব্যভিচার, কু বিষয়ের সমর্থনা সেটি তোমার রাজ্য নহে। তোমার রাজ্যে কোথাও পাপ তাপ নাই। আমার মনে হয় যাহা কিছু মন্দ যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু গোপন, যাহা কিছু কপটতা, যাহা কিছু ক্লেশজনক তাহা তোমার রাজ্যে নাই; আছে অজ্ঞানের রাজ্যে, আছে মায়ার রাজ্যে। আর যাহা পবিত্র, যাহা ভাল, যাহা সৎ তাহা আছে তোমার রাজ্যে। তুমি মন্দ কাজে মানুষকে স্পন্দিত কর না। মানুষ মন্দ কাজে স্পন্দিত হয় অজ্ঞানে। ঠাকুর! এই অজ্ঞানের সৃষ্টি কর্ত্তাও কি তুমি?

নানা তাহাও হইতে পারে না। অজ্ঞানটা মিথ্যা। অজ্ঞানটা মায়া। অজ্ঞানটা ইন্দ্রজাল। তুমিই আছ! অজ্ঞান নাই। অজ্ঞানটা বস্তুও নহে, অবস্তুও নহে। অজ্ঞানটা কল্পিত বস্তু। এটা মায়া কল্পিত। রজ্জু আছে সর্প নাই। ইহাও সত্য কথা। মানুষ! তুমি ইচ্ছা করিয়া রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখিতে পার আবার নাও পার। এই টুকুই মানুষের স্বাধীনতা। এই ইচ্ছার স্বাধীনতা তুমি মানুষকে দিয়াছ। নতুবা মানুষ মানুষ থাকিত না, জড় বস্তু হইয়া যাইত। মানুষ ইচ্ছা করিয়া আপন শক্তির অপব্যবহার করিতে করিতে আপনার সত্য সঙ্কল্পতা যখন হারাইয়া ফেলে তখন মানুষের পতন হয়। মানুষ শক্তির ব্যবহার করিতে করিতেই সত্যসঙ্কল্পতা লাভ করে। আবার যখন অপব্যবহার দ্বারা ঐ সত্যসঙ্কল্পতা হারায় তখন শতবার যদি ইচ্ছা করে আমার পাপ যাউক, আমি ভাল হইয়া যাই, আমার অজ্ঞান দূর হউক, আমার শরীর নীরোগ হউক—সেই অসত্য সঙ্কল্প অবস্থায় পড়িয়া সব হারাইয়া মানুষের আর কোন প্রার্থনা সফল হয় না। মানুষ তোমার কাছে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অশুদ্ধ মানুষের অভিলাষ তুমি পূর্ণ কর না। তাই মানুষকে সত্যসঙ্কল্পতার সাধনা জন্য পবিত্র হইতে হয়।

কোন্ সাধনায় সত্য সঙ্কল্প হওয়া যায় ?

যদি স্ত্রীলোক হও তবে সতী হও, যদি পুরুষ হও তবে পবিত্র হও। এতদ্ভিন্ন সত্যসঙ্কল্প হওয়ার অন্য উপায় নাই। নিষ্কাম ধর্ম্মই পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায়। প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য, প্রতি কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া করিতে প্রাণপণ কর—সতী হইতে পারিবে, পবিত্র হইয়া মুক্ত হইয়া যাইবে। প্রভু এই যুক্তি কি ঠিক ?

পূর্ব্বস্মৃতি।

১

এতই আঁধার যদি মানব জীবন হায়।
ক্ষণেকের তরে কেন প্রেমচন্দ্র উঠে তায় ?
দেখেছিনু হৃদাকাশে সেই পূর্ণিমার জ্যোতি।
এবেত পাইনা প্রভু কিছুতে সেরূপ প্রীতি।
সে আলোকে যতসুখ ছিল এহৃদয় ভ'রে।
খুঁজিয়া তুলনা তার পাইনাত এসংসারে।
সেই শত-মন্দাকিনী বহিত হৃদয় মাঝে।
সহসা শুকায়ে যাবে স্বপনে ভাবিনি তাহে।
মনে ভেবে ছিনু আমি এসুখ তোমারই দান।
এসুখে বঞ্চিত কভু হবেনাক মম প্রাণ।
আমারি সে ভুল প্রভু সে সুখ ধরার নয়।
অমূল্য সে প্রেমধন তোমাতেই শোভা পায়।
আমার সংসার তরে যেইজন বাঁচে মরে।
তোমার পবিত্র প্রেম কেন দিয়াছিলে তারে ?
কতবার কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে মোর।
ডাকিছ আমারে তবু ভাঙ্গেনা যে ঘুম ঘোর।
মোহের মদিরা পানে এমনি অলস প্রাণ।
জাগি জাগি করি সদা রহি তবু ত্রিয়মান।
সে ঘুম কোথায় আজ যাতে প্রাণ ডুবে ছিল :
অকস্মাৎ কেশে ধরে কে আমারে উঠাইল ?

(পিরিতি) ক্রমশঃ—

মাতৃভাবে তত্ত্ব করা।

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাচভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবার কথা শ্রীবৈষ্ণবেরা উল্লেখ করেন। মাতৃভাবে তত্ত্ব করার কথা তাঁহারা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। মাতৃভাবে উপাসনার কথা শাস্ত্রে পাই। শ্রীরামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি ইঁহারা মাতৃভাবের সাধক। শ্রীরামপ্রসাদ মাতৃভাবে তত্ত্ব করার সম্বন্ধে বলেন:—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে
শেষে চাতারে কি ভাঙ্গব হাঁড়ী বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে।

মাতৃভাবে তত্ত্ব করার মধ্যে এমন কি রহস্য আছে যাহা ভাঙ্গিতে গেলে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা হইয়া যায়? রামপ্রসাদ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন সকলকে বলিবার কথা ইহা নহে। বলিতে গেলে পাছে চাতারে হাঁড়ী ভাঙ্গা হইয়া যায় তাই আপন মনকে ঠারে ঠোরে বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন।

প্রসাদ ত রাজী ছিলেন না কিন্তু আজ কাল কি সেই কথা সবাই বলে? এখন সব কথাই প্রকাশ করিতে হইবে ইহাই নব বিধান। আমরা ইহারই একটু আলোচনা করিব।

শ্রীভগবান যখন ভাবের বিষয়—অভাবে যখন তাঁহাকে ধরা যায় না তখন কোন একটি ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে ইহা সাধু মহাত্মারা বলিয়া থাকেন। একটি ভাবকে মুখ্য রাখিয়া অন্য সকল ভাবেই তাঁহাকে ডাকা যায়। শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়, সাধু জীবনেও ইহা দেখা যায়। সাধু মহাত্মাগণ আরও বলেন যিনি গুরু তিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে সাধকের কি সম্বন্ধ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সাধনার উপায়গুলি বলিয়া দিবেন। সম্বন্ধ নির্দ্দেশটি সাধক জীবনে প্রধান আবশ্যকীয় বস্তু। এইটি ধরা না হইলে সাধনায় রস আইসে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাতৃভাবের সাধনাকেই আজকালকার অসংযমী মানুষের অবলম্বনীয় ইহা বলিতেন এবং নিজে আচরণ করিয়া জীব শিক্ষার জন্য তাহাই দেখাইয়াছেন। মাতৃভাবের সাধনা কেন আজকালকার দিনে সকল সাধকের প্রথম প্রয়োজনীয় তাহাই এখানে আলোচ্য।

মাতৃভাবে তত্ত্ব করা কি প্রথমে তাহাই দেখা যাউক।

আজকাল বিপদ যেরূপ সুলভ আর জীবন যেরূপ বিপদসঙ্কুল তাহাতে যিনি আমাদের রক্ষা করেন তিনিই যে সর্ব্বপ্রথমে উপাস্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবানই রক্ষা করেন সত্য কিন্তু আমরা কয়জনে তাঁহার রক্ষার ভাবটি ধরিতে পারি? রক্ষার ভাবটি যেখানে অধিক পরিমাণে আমাদের অনুভবে আইসে সেই বস্তুটিই আমাদের অবলম্বনীয়। মাতৃভাবে উপাসনা করার অর্থ এই রক্ষাভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপাসনা করা।

মা নামে রক্ষা এবং পবিত্রতা যেন জড়িত। বিনাশ হইতে পরিত্রাণ করার নাম রক্ষা। বিনাশের মূল কোথায়? কামনাই মানুষকে বিনাশ করে। কামই জীবের বিনাশক। কাম পদার্থটি প্রেমেরই বিকার। কাম বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। কামনা অজ্ঞান হইতেই জন্মে। শোভনাধ্যাসই কামের জনক। পরমপুরুষই সুন্দর। আর কিছুই সুন্দর নাই। মণির ঝলক উঠার মত স্বভাবতঃ তাহা হইলে যে আত্মমায়া উঠে সেই আত্মমায়াকে সুন্দর দেখাই শোভনাধ্যাস। অধ্যাস বা আরোপ দ্বারাই অসুন্দরকে সুন্দর দেখা হয়। রজ্জুর উপরে যেমন অজ্ঞানে মিথ্যা সর্পভাসে সেইরূপ প্রেমের উপরেই কামভাসে। স্থিতি ভিন্ন যেমন গতি হয় না সেইরূপ মূলে প্রেম না থাকিলে কাম তাহার উপরে ভাসে না। তাই বলা হয় কামটা অজ্ঞানেই দেখা হয়। প্রেমকেই অজ্ঞানে কামভাবে দেখা হইয়া যায়। অজ্ঞান কাটাইতে পারিলেই কাম থাকে না। কামই প্রেম হইয়া যায়। যে যত অজ্ঞানী সে তত কামুক। উপস্থিত সময়ে অজ্ঞানের প্রসার অত্যন্ত অধিক। এ জন্য কামেই মানুষ সুখ পায় মনে করে। সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য কাম ত্যাগ করিয়া প্রেমের মুখ দেখা। কামটা প্রেমের অজ্ঞানজ আবরণ। এই আবরণ সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই প্রেম মেঘমুক্ত সূর্য্যের সমান প্রকাশ পান। প্রেমিক হইলেই মুক্তি।

কামের আবরণ দূর করিবার দুইটি পথ। একটি জ্ঞানমার্গ একটি ভক্তিমার্গ। বস্তুবিচার দ্বারা কাম নিরস্ত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গ। আমরা ভক্তিমার্গে কাম দূর করিবার কথা বলিতেছি।

স্ত্রীলোক কোথায় নাই? চিত্ত কলুষিত হইলে স্ত্রীলোককে কুভাবে দেখা হইয়া যায়। কিন্তু মাও স্ত্রীলোক বটেন। কেবল ঐ স্থানে কাম কিছুই করিতে পারে না। পশুদিগের মধ্যেই ইহাও দেখা যায় বটে। ভক্তগণ বলেন স্ত্রীলোক

দেখিলে যখন চঞ্চলতা আইসে তখন কতক্ষণ ধরিয়া মা মা মা মা করিতে থাক। এইরূপ করিলে যখন মার মুখ মনে পড়িবে, মার রক্ষার ভাব মনে পড়িবে, মার পবিত্রতা জাগিবে তখন আর কামভাবে স্ত্রীলোক দেখা যাইবে না। তখন এক পবিত্র আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যাইবে। কামভাব দূর হইবে আসিবে প্রেম। কামভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বিনাশ পথে মানুষ ছুটে। মা মা করিতে করিতে যখন মাতৃভাব জাগে তখন কামই প্রেম রূপে অমরত্ব দেখাইয়া দেয়। দুই একদিনের চেষ্টায় ইহা হয় না; বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে প্রকৃত অবস্থা লাভ হয়। ইহা কথায় হয় না ইহা নিত্য অভ্যাসের সাধনা।

এখন রামপ্রসাদের চাতারে হাঁড়ী ভাঙ্গার কথা বলিয়া শেষ করা যাউক।

মাতৃভাবে তাঁকে ডাক করা চাই। মাতৃভাবটি সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতে হইবে। কোন একটি স্থানেও ইহা বাদ দিলে চলিবে না। বালকের ইহাতে আপত্তি নাই। বালিকারও নাই। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহাদেরও আপত্তি নাই। যত আপত্তি মধ্য বয়সে। লোকে একস্থানে ইহা বাদ দিতে চায়। রামপ্রসাদ বলিতেছেন যাহারা ভাল লোক এবং সাধক তাঁহারা অন্য সকল স্থানেইত মাতৃভাব আনিবেন, কিন্তু যে স্থানটিতে বাদ দিতে চাহেন সেই স্থানটিতেই জ্ঞানের প্রবল শত্রু যে কাম তাহার বিনাশ তাঁহাদের হয় না। আর বলিতে কি সেই একটি স্থানই জীবের প্রধান শত্রু! সকলকে ইহা বলিতে গেলে চাতারে হাঁড়ী ভাঙ্গা হয়।

দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া বলিয়াছিলেন মহারাজ! আপনি জানিবেন আমি সন্তানের জননী। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ ইহাও আপনি জানিবেন যে আমাকে শুধু এক ভাবে দেখিলে চলিবে না। মহাভারতে ইহা আছে।

আর আছে তন্ত্রে। দেবাদিদেব পর্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন গুরুস্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অহমেব প্রকাশকঃ। তুমিই সর্ব্বশাস্ত্রের গুরু। আমি মাত্র প্রকাশক আবার বলিয়াছেন কথং ত্বং জননীভূত্বা বধূত্বং মম দেহিনাং। উরু। চোরু। ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে।

ইহাই বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে।

আমরা উপসংহারে বলি—ফুল দেখিতেই ভাল লাগুক বা কোকিলের স্বরই ভাল লাগুক, বা বসন্তে প্রকৃতি দেখিতেই ভাল লাগুক, বা চন্দ্রনক্ষত্রশালিনী

আকাশ দেখিতেই ভাল লাগুক, বা স্ত্রীলোক দেখিতেই ভাল লাগুক বা গান শুনিতেই ভাল লাগুক—যাহা ভাল লাগে, যাহাতে আসক্তি যায় সেই খানে মা মা মা মা জপ করিতে করিতে যদি মাতৃভাব আনিতে পার তবে বড় উৎকৃষ্ট সাধনা হয়। অভ্যাস কর—হয় কি না বুঝিবে। ইতি—

সাধ।

একাকী এসেছি নাথ একাই যাইব চ'লে।
জানিনা কোথায় যাব কেবা পথ দিবে ব'লে॥
কেনবা এসেছি হেথা কি কার্য্য সাধিতে তব।
কবে কাজ সারা হবে কতদিন হেথা রব॥
কিছুই জানিনা হরি। অজ্ঞান রমণী আমি।
যা কিছু কর্ত্তব্য সব শিখাইয়া দিও তুমি॥
একাকী এসেচি যদি একাই যাইতে হবে।
সংসারের মায়া জালে কেন বদ্ধ হই তবে?
মহামোহ অন্ধকারে কেন অন্ধ আমি তারা?
ভুলিয়া সে পুণ্য জ্যোতি কেন হই দিশে হারা?
ভুলি নাই দয়াময় তোমার সে প্রেমাননে।
বিশ্বাস নয়নে করি হৃদিমাঝে দরশন॥
মাঝে মাঝে ভুলে যাই সংসারের কলরবে।
তোমারি সংসার—আমি একথা বুঝিব কবে?
কৃপা করি বুঝাইয়ে দাও হরি দয়াময়।
নিস্বার্থ সংসারী হ'লে তুমি অসন্তোষ নও॥
কতদিনে দিব আমি স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন।
তব ইচ্ছা পালনেতে রব রত সর্ব্বক্ষণ॥
ক্ষুদ্র হৃদি মিশে যাবে তব পুণ্য শ্রীচরণে।
তুমি আমি মিলামিশি হ'য়ে যাব দুই জনে॥
মনসুখে হেঁসে খেলে কাজ সেরে চ'লে যাব।
একা যদি ভয় পাই তোমাকেই সঙ্গী পাব॥

কি— (কলিকাতা)

৺প্রবোধের স্মৃতি

তৃতীয় প্রবন্ধ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

(প্রবোধচন্দ্রের লেখা)

[(১) আগে স্বদেশের কাজ কর, নিজের কাজ হয় বা না হয় সে জন্য ভাবিও না। আজ কালকার বিকৃত চিন্তা ইহা।

(২) সন্ধ্যা আহ্নিক লইয়াই থাক লোকের ভাল হউক বা মন্দ হউক সে দিকে দৃষ্টি রাখিও না। আশ্রম ধর্ম্মের যে শিক্ষা তাহারই বিকৃত ইহা।

(৩) প্রকৃত শিক্ষা তাহাই যেখানে স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের সেবা সমকালে চলে। স্বধর্ম্ম হইতেছে আত্মকর্ম্ম। ইহাই প্রথম হইতে অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা করিতে মানুষ রস পায় না বলিয়া স্বজাতিসেবা দ্বারা স্বধর্ম্মের রস আনিতে হয়। কিন্তু স্বধর্ম্ম বাদ দিয়া যে স্বজাতি সেবা বা স্বদেশ সেবা তাহাতে জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। কারণ মনুষ্য যে জীবন প্রাপ্ত হয় তাহা অনন্ত সুখস্বরূপ যে ভগবান্ তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য। যতদিন জরামরণরূপ দুঃখ তোমার আছে ততদিন তুমি তাঁহাকে পাও নাই। জরা মরণ সকলেরই হয় ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না, এই শিক্ষাই আধুনিক সময়ের কুশিক্ষা। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া কেবল জরা মরণ হইতে রক্ষা পাওয়া জন্য। "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য" ইত্যাদি ভগবানই শিক্ষা দিয়াছেন। আত্মরক্ষা ও জগৎরক্ষা সমকালে করা চাই ইহাই আর্য্যশিক্ষা। অন্য শিক্ষা বিকৃতি। প্রবোধচন্দ্রের প্রবন্ধ কোন প্রকারের চিন্তা তাহার বিচার পাঠকের উপর। যদি এই চিন্তাটি অবিকৃত চিন্তা হয় তবে সংযম এবং সৎসঙ্গ দ্বারাই যে মনুষ্য সৎগতি লাভ করে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।]

"দেশের লোক, দেশের সব আমার বড়ই আদরের। মা আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন সেরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা জগতে কোথাও দেখি নাই। আমি জননীর সেই স্নেহের প্রতিদান কিছুই করিতে পারি নাই। আমি তখন বজমূর্খ ছিলাম। সেবাধর্ম্ম জানিতাম না। মাতৃপূজা জানিতাম না। মাকে আমার কোন সেবাই করিতে পারি নাই। যে দেশে মা আমার ছিলেন, যে

সকল লোকেদের মধ্যে যা আমায় বেড়াইতেন এখন যদি উহাদের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে কতকটা সেবা হইবে।

হাক দাদার বাগানে একটু ছোট ঘর থাকিবে ১২ হাত লম্বা ৮হাত চওড়া। এই ঘর পূজার জন্য। আর একখানি ছোট ঘর থাকিবে আহারের জন্য। বাগানে ত অনেক ফল ফুলের গাছ আছে, রামনামে সেই সকল ফল ফুলের বৃক্ষ সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিবে। বাগানটি ঋষিআশ্রম বিশেষ করিব। নদীতেই স্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা নদীতটেই হইবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা উদ্যানে হইবে। সায়ংসন্ধ্যা নদীতটে। আহারাদি প্রস্তুত স্বহস্তেই করা যাইবে।

আহার্য্যসামগ্রী এই—আতপ, মুগের ডাল, সামান্য ঘৃত, কাঁচাকলা রোজ। রাত্রে দুগ্ধ।

আহার প্রস্তুত হইলে প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগত বালক বা অন্য দীনদুঃখী এবং গোসেবা জন্য—রন্ধনের তিন ভাগ রাখা। এক ভাগ নিজে সেবা করা—ইহাই ব্যবস্থা।

আহারের পর শাস্ত্র দেখা—যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্মরামায়ণ, পঞ্চদশী, গীতা ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি। পরে সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ। ঐকালে ব্রহ্মচারীর বেশ থাকিবে।

আর এক কার্য্য হইবে ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা। ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা বড় পিতলের হাঁড়া ও একটি ছোট পিতলের হাঁড়ী। একটা ডালের হাঁড়ী, একটা পিতলের কড়া, একটা পিতলের হাতা, একটা ছান্না, একটা সরা।

ছেলেদের সন্ধ্যাবন্দনা জন্য পঞ্চপাত্র, কুশী, ছোট রেকাব চারি জোড়া। কুশাসন ১০খানা। রুদ্রাক্ষমালা ৪টা গোমুখী—চন্দনকাষ্ঠ—সাজী।

গুরুদেবের জন্য মৃগাপুরের আসন।

[উপস্থিত জীবনে তোমার এ সঙ্কল্প কখনই সিদ্ধ হইত না। তুমি যে রাজ্যে গিয়াছ সেখানে হইবে। এই প্রবন্ধ এই পর্য্যন্তই শেষ] ৺প্রবোধের লেখা ও সংগ্রহ নানাস্থানে আছে দেখিতেছি। এই প্রবন্ধে কতক কতক দিয়া যে বংশে ৺প্রবোধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহারই আধুনিক অবস্থা দেখাইবার জন্য আমরা ঐ বংশের একটি তালিকা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই প্রাচীনবংশ অতি অল্প দিনেই নিঃশেষ হইবার পথে যেন চলিতেছে।

বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট। যে স্থান পূর্ব্বে বালকবালিকা দ্বারা মুখরিত থাকিত আজ অধিকাংশ গৃহের প্রাঙ্গন, রন্ধনশালা, পুষ্করিণীর পাড়, ঠাকুরদালান প্রভৃতি সমস্তই বনাবৃক্ষে পূর্ণ হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। যে বৎসর হইতে কংসাবতী নদীর আনিকেট বাঁধা হইল সেই বৎসর হইতেই এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম—এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামও মৃত্যুমুখে ছুটিবার পথে আসিল। যে বৎসর কেনেলের বাঁধ শেষ হইয়া গেল সেই বৎসর হইতেই ম্যালেরিয়া সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের বেশ মনে আছে বালককালে আমরা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় কংসাবতীর জল বাড়িতে দেখিয়া আসিতাম শেষ রাত্রে চারিদিকে জলকল্লোল শুনিতাম। প্রভাতে দেখিতাম চারিদিক জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন কেনেলের বাঁধ ছিল না—তখনকার দিনে আমরা দেখিয়াছি এক দিনেই জল নিকাশ হইয়া গেল। পুকুরের পুরাতন জল গিয়া নূতন জল হইল। গ্রামের সমস্ত আবর্জ্জনা জলে ভাসিয়া গেল। তখন মানুষের স্বাস্থ্য বড় সুন্দর ছিল। আর এখন? এখনও বন্যা হয়। কিন্তু বন্যার জল বাহির হইতে পায় না। কেনেলের বাঁধে ঠেক খায়। গ্রামের ভিতরে বহুদিন জল জমিয়া সব পচাইয়া তুলে। যে গ্রাম পূর্ব্বে বড়ই স্বাস্থ্যকর ছিল কেনেল হইবার কিছুদিন পরে দেখা গিয়াছিল দোতলার উপর পর্য্যন্ত সেঁতসেঁতে হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই জনার্দ্দনপুর গ্রাম, পাতরাগ্রাম, তুতিয়া মুনিবগড়, চকলপুর, কুমারডোবা, লছমাপুর প্রভৃতি স্থান সকল প্রায় শ্মশান হইয়া আসিল। প্রাচীন-কীর্ত্তি এখনও আছে। দোল দুর্গোৎসব অতিথিসেবা সবই একরূপ চলে কিন্তু মানুষ নাই বলিলেই হয়। প্রাচীন পুষ্করিণী গ্রামের চারিধারে, কিন্তু পঙ্কোদ্ধার নাই। পুরাতন বাড়ী, পুরাতন দেবমন্দির, প্রভৃতির আধুনিক অবস্থা দেখিলে এবং জনার্দ্দনপুর ও পাথরা গ্রামের সমৃদ্ধির সহিত এখনকার অবশিষ্ট বালক ও স্ত্রীলোকের অবস্থার তুলনা করিলে চক্ষে জল পড়ে না, জলের পরিবর্ত্তে রক্তধারা বাহির হইতে চায়।

যে প্রাচীনবংশ স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য চিরদিন বিখ্যাত ছিল, যে বংশ কুলীনের কুলমর্য্যাদা রক্ষাজন্য এখনও প্রশংসিত, যে বংশ নীলকণ্ঠের মত রত্ন প্রসব করে, সেই বংশেই প্রবোধচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

আমরা প্রবোধের লেখা ও সংগ্রহ হইতে আরও কিছু উদ্ধার করিয়া ঐ বংশের তালিকা দিতেছি।

পারের আয়োজন ফেব্রুয়ারি ৫ই ১৯০৮। পারের জন্ত কি আয়োজন করিয়াছি? পারঘাটের রাস্তায় পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ করি নাই। কত দেখিলাম, কত কষ্টভোগ করিলাম, কিন্তু চৈতন্ত হইল না। শরীর মন ইন্দ্রিয়াদি লইয়া এই ৪০ বৎসর কাটাইলাম তথাপি মোহ ঘুচিল না। যাহা অস্থায়ী নশ্বর তাহার তৃপ্তিতেই অনবরত ৪০ বৎসর কাটাইলাম। মোহনিদ্রা এখনও ভাঙ্গে নাই। কবে ভগবানের দিকে তাকাইতে পারিব? কবে তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিব? কবে আমার সুদিন আসিবে?

২। কেন মিছা ভাব আর, রাম ময় এ সংসার, সুখ দুঃখ তাঁহারই ঘটনা।

৩। ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় বোধ করিয়া তাহাতে প্রীতিলাভ করিবেন না। এবং অপমানকে সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন।

৪। বৈষয়িক সুখভোগে বিষবুদ্ধি না হইলে মুক্তি চেষ্টা হইবে না।

৫। তোমাতে আমাতে এবং অন্যত্র সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজমান; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কি জন্ত কোপ করিতেছ? সর্ব্বত্র ভেদ জ্ঞান ত্যাগ কর।

৬। সূর্য্য অস্ত গেলে তিল সংযুক্ত কোন দ্রব্য ভোজন করিও না। উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবে। ভোজন উত্তর মুখে।

মানসপূজা ৩০ আশ্বিন ১৩১২ সাল—মনটিকে বেশ পরিষ্কার পূর্ব্বক অর্থাৎ মনের ময়লা দূরে ফেলিয়া তাহাতে একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত আসন বিছাইয়া তাহার উপর একটি সিংহাসন বসাইয়া তাহাতে আপন ইষ্টদেবতাকে বসাইবে। স্বয়ং একটি উত্তম গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্তম পুষ্পসহ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিবে। স্বীয় কামনা জানাইয়া বর প্রার্থনা করিবে। প্রণাম করিবে। তৎপরে ঠাকুরকে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার চরণামৃত পান করিবে। তৎপরে উত্তম পুরাণাদি পাঠ করিবে। তৎপরে ভোজনাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া একটি নির্জ্জনঘরে একাকী তাঁহার ভাবনা করিবে। এই সমস্ত মন দ্বারা করিবে। যদ্যপি এই মতে চলি তবে কোন দুঃখ থাকিবে না।

৩০ আশ্বিন ১৩১৬। মানসতীর্থ সত্য, দয়া, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়জয়, আর্জ্জব (সরলতা), দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং তপস্যা প্রত্যেকেই এক একটি তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য একটি পরম তীর্থ। চিত্ত শুদ্ধিই তীর্থেরও তীর্থ। মাত্র জলে দেহ ডুবানার নাম স্নান নহে। বাহেন্দ্রিয় দমনরূপ স্নান যে করিয়াছে সেই স্নাত। যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে সেই পবিত্র। দাম্ভিক এবং বিষয়ান্ধ সর্ব্ব তীর্থে সুস্নাত হইলেও সে বাকি পাপী এবং মলিন।

মানস তীর্থগুলি প্রতিদিন ভ্রমণ করিব।

১৩১৬ পূর্ণিমা দোল যাত্রা। কিসের পেছুনে ছুটিতেছি। মরীচিকা ভ্রমমিথ্যা। অন্ত হইতে নিদ্রা দূর চউক ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

মৃগ যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় মরে আমরাও তেমনি ভ্রমের পাছু পাছু ছুটিতেছি। ইহার ফল কি? ফল মৃত্যু—পুনরপি জননং পুনরপি মরণম্।

১৩১৬।৮ই চৈত্র মঙ্গলবার নূতন বৎসরের জন্ত নিয়ম। রাত্রে লঘু আহার। নিয়মিত নিদ্রা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত। রাত্রি ৪টায় জাগরণ। ৪ হইতে ৫ ক্রিয়া। পরে শৌচাদি। পরে স্নান: স্নানের পর সন্ধ্যা। গায়ত্রী জপ নাম জপ। গায়ত্রী প্রত্যহ তিনবারে ২১০৮। নাম জপ প্রত্যহ ১০,০০০। বৈকালে পাঠ। কত সময়ে কত জপ তাহার হিসাব। সন্ধ্যায় সন্ধ্যা করিয়া আবার জপ।

শুভবৎসর। পুণ্যবৎসর। ১৩১৭। (১) যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট (২) সর্ব্বজীবে ভগবানের স্বরূপ বোধ। ৩) একান্তে তাঁহার সেবা (৪) পুণ্যকর্ম্ম।

৮জগন্নাথধাম শ্রাবণ ১৩১৮ শুক্রবার ২১,৭,১১। প্রার্থনা আমি পতিত আমায় উদ্ধার কর। আমি অবসন্ন, আমায় রক্ষা কর। আমি পাপী আমায় পরিত্রাণ কর। আমি তাপী আমায় শীতল কর। আমি অনাথ আমায় আশ্রয় দান কর। আমি দীন হীন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল আমার সহায় হও।

আমরা এবারে আর অধিক দিব না। শেষে একটি হিন্দি পদ ও একটি ধ্যান দিয়া এবার কার মত ক্ষান্ত রহিলাম।

২৩।৩।১২। অযোধ্যা—রামনবমী। সরযূ মাতার নিকট রামভক্তি প্রার্থনা। আত্মীয় কুটুম্বগণের জন্ত মঙ্গল প্রার্থনা। নয়ন, মনও বচন দ্বারা কাহাকেও দূষিত করিও না। কাহারও প্রত্যক্ষ দোষ বা পরোক্ষদোষ কাহারও নিকট

উল্লেখ করিও না। ধৈর্য্য রক্ষাই পরমার্থ। তীব্র বৈরাগ্য কর। [illegible] উচ্চ হবে উচ্চ মন্দ বৈরাগ্য।

পদ—গুরু কৃপাঞ্জন পাও মেরা ভাই।
রাম বিনা কুছু সুচতো নাহি॥
অন্দর রাম বাহার রাম।
যা দেখো তা রামই রাম॥
জাগত রাম শোওত রাম।
স্বপতা দেখো তা রামই রাম॥
একো জনার্দ্দনী ভাবহি নীকো।
জিতে দেখো উতে রাম সরিখো॥

ধ্যানম্—ধ্যায়েদাজানুবাহুং ধৃতশরধনুষং বদ্ধপদ্মাসনস্থং।
পীতং বাসোবসানং নব কমলদলস্পর্দ্ধি নেত্রং প্রসন্নম্।
বামাঙ্কারূঢ়সীতামুখকমল মিলল্লোচনং নীরদাভং
নানালঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামণ্ডনং রামচন্দ্রম্।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৺প্রবোধ চন্দ্রের সংগ্রহ ও নিজ উক্তি অনেক। ঐ বারে আমরা এই পর্য্যন্ত দিলাম। যে বংশে ৺প্রবোধ চন্দ্র জন্মিয়াছিল সেই বংশের মজুমদার মহাশয়গণের এবং তাঁহাদের দৌহিত্রগণের বংশ বিবরণ শ্রীযুক্ত হারাণ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সংগ্রহ হইতে বংশ বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

মজুমদার বংশের বিবরণ।

কংসাবতী নদীর (কাঁসাই) উত্তর কূলে পাথরা গ্রাম, দক্ষিণ কূলে বেড়জনার্দ্দন-পুর। এই বংশের আদিবাস পাথরা। ইঁহাদের আদি পুরুষ ছান্দড়। ইঁহারা ঘোষাল। পশোর সন্তান। বাৎস্য গোত্র। পশোর পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম। সুরভি—সাগর—মনোরম—বিশ্বামিত্র—জীতমিত্র—ভগবান—পিঙ্গল—শিরো—উদ্ধব—কোঁচ—আভো—পশো। পশোর পরে হিঙ্গল—মাই—গোবর্দ্ধন—মুরারি—সর্ব্বেশ্বর—শ্রীনাথ—সর্ব্বানন্দ—শ্রীগর্ভ—(ভঙ্গকুল)—বনমালী—রাঘব-রাম ঘোষাল। ইঁহারা কলিকাতার ঘোষাল। রাঘবরাম হইতে বংশ বিবরণ আরম্ভ।

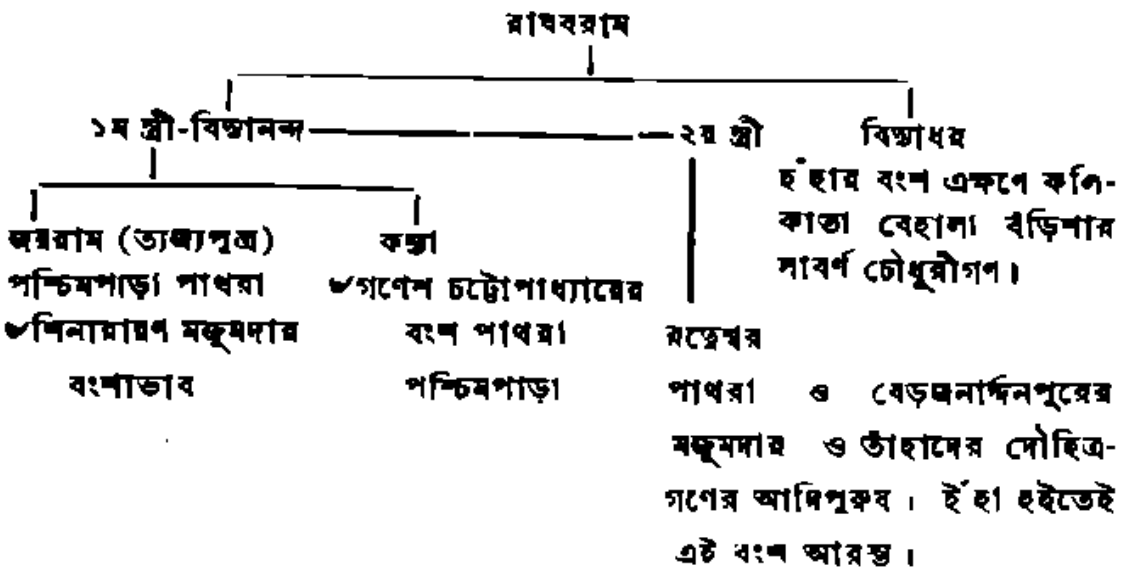

রাঘবরাম, ঘোষাল ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিদ্যানন্দ নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন এবং মজুমদার উপাধি পান। তিনি বহু অর্থ ভাঙ্গতি করায় মুরশিদাবাদের নবাব উঁহাকে ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যানন্দ, জয়রাম ও রত্নেশ্বর এই দুই পুত্র সঙ্গে নৌকা করিয়া মুরশিদাবাদে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে একদিন ইনি ভট্টপল্লীর (ভাটপাড়ার) গঙ্গাতটে সন্ধ্যা করিবার জন্য নৌকা লাগান। গঙ্গাতীরে ঐ সময়ে তিনি এক ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের দর্শন পান। ঐ তেজস্বী ব্রাহ্মণের নিকট তিনি আপন অবস্থা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যানন্দকে অভয় দেন। বলেন আমি তিনদিন এই ঘাটে তোমার জন্য তপস্যা করিব। তুমি এই তিনদিনের মধ্যেই খালাস পাইয়া আমার নিকট আসিবে। তাহাই হয়। বিদ্যানন্দ খালাস পাইয়া গঙ্গাতীরে দণ্ডিমান করিয়া ঐ মহাপুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। মহাপুরুষ অর্থাদি কিছুই গ্রহণ না করিয়া বিদ্যানন্দ বংশের সকলে যেন তাঁহার বংশের শিষ্য হয় এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন। তখন হইতে ভাটপাড়ার বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মজুমদার বংশের গুরুকুল।

বিদ্যানন্দ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলে তাঁহার বিচার হয়। ঐ বিচারে বিদ্যানন্দকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিবার হুকুম হয়। বিদ্যানন্দ কাতর হইয়া এক দিনের জন্য তপস্যা করিবার হুকুম প্রার্থনা করেন। হুকুম মঞ্জুর হয়। বিদ্যানন্দ বেলা দুই প্রহরের সময় ভয়ানক রৌদ্রে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া পঞ্চতপা হয়েন। ঐ সময়ে নবাব-পত্নী বিদ্যানন্দের মস্তক হইতে অগ্নি বাহির

হইতেছে দেখিতে পান। নবাব পত্নী তখন নবাবকে বলেন "মুল্লুক জল যায়েগা—ওস্‌কো ছোড় দেনা"। ইহাতেই বিদ্যানন্দ মুক্ত হয়েন।

যেদিন বিদ্যানন্দকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার হুকুম হয় সেইদিন তাঁহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র জয়রাম পাথরা মোকামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এগারশ দিনে তিনি যখন পিতার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছিলেন সেই সময়ে বিদ্যানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রত্নেশ্বরকে লইয়া বাটীতে আগমন করেন। পিতা পুত্রের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। এখনও পশ্চিম পাড়ায় গোলবারাণ্ডা যুক্ত নাটমন্দির বর্ত্তমান আছে। নাটমন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ এখনও পূর্ব্বের মত শিল্পকার্য্যের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। এখন ঐ মন্দির ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে ও মন্দিরের বহু স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আরও প্রবাদ আছে নবাব পত্নীর অনুরোধ সত্ত্বেও বিদ্যানন্দকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলা হয়। তিনবার চেষ্টা করা হয় কোন বারেই হস্তী পা তুলে নাই। তাহা হইতেই পা-তরা নাম। পাতরা হইতে পাথরা নাম হইয়াছে।

বিদ্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে রত্নেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পাথরা ও বেড়গনার্দ্দনপুর গ্রামস্থ মজুমদার ও তাঁহাদের দৌহিত্র সন্তানদিগের আদিপুরুষ। ইঁহা হইতে বংশ বিস্তার দেখান হইতেছে।

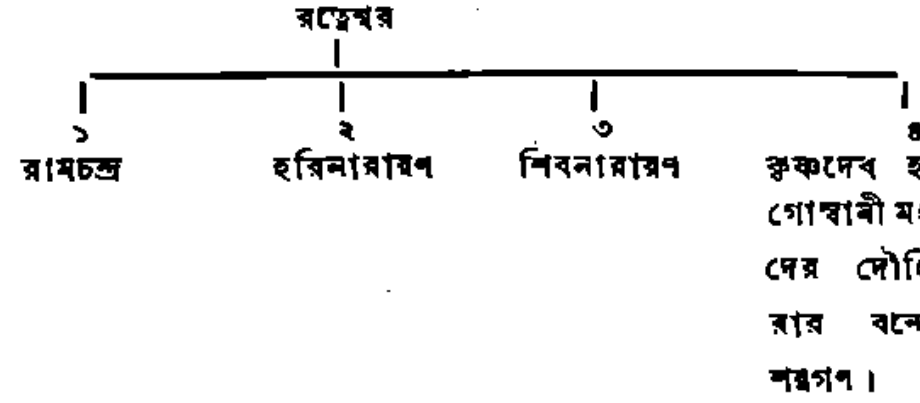

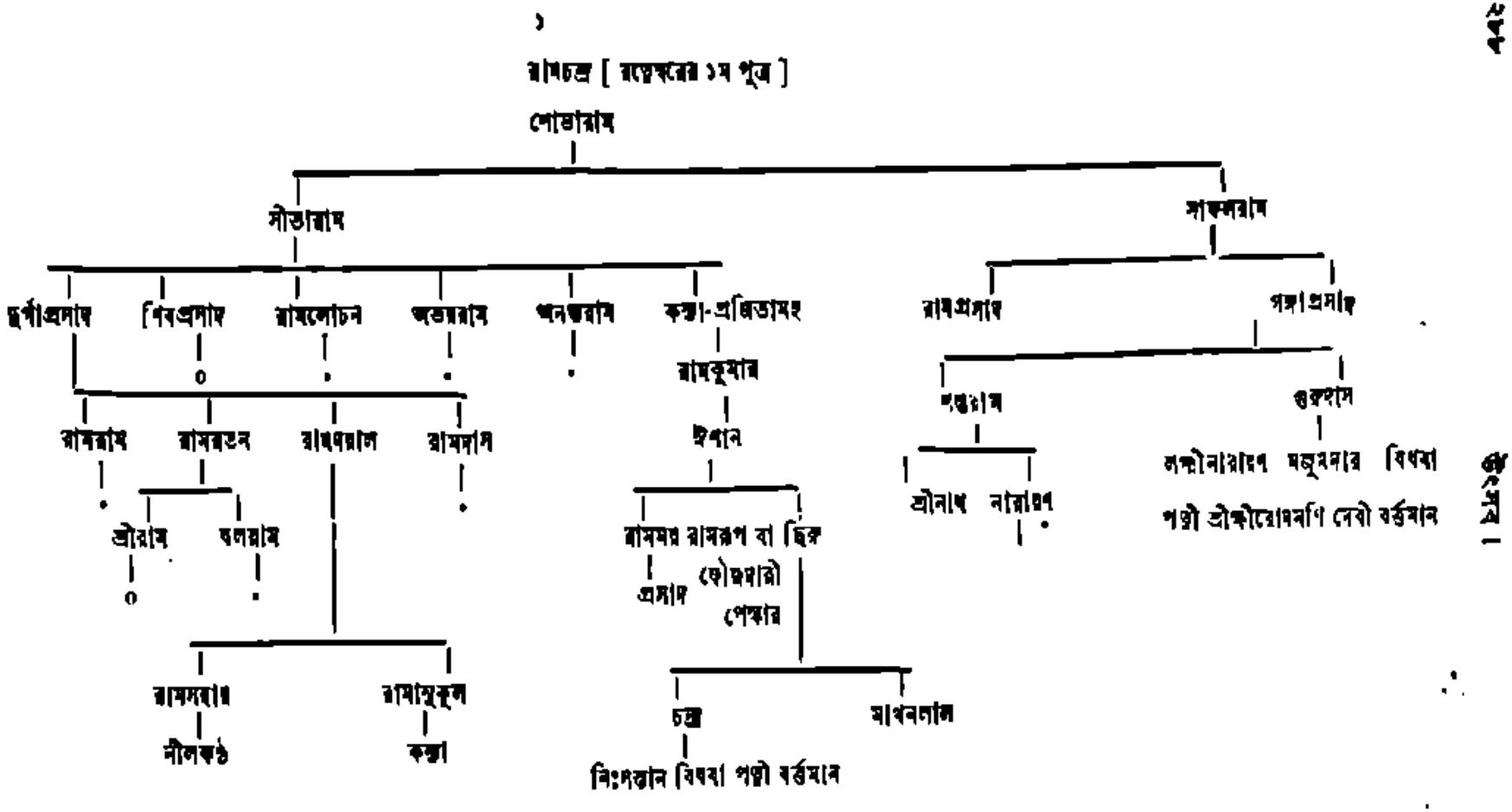
১
রামচন্দ্র [রত্নেশ্বরের ১ম পুত্র]
গোত্তারাম
সীতারাম
সাকলরাম
দুর্গাপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ
রামলোচন
অভয়রাম
ধনঞ্জয়রাম
কন্যা-প্রতিতামহ
রামপ্রসাদ
গঙ্গাপ্রসাদ
রামকুমার
শঙ্করাম
গুরুদাস
ঈশান
শ্রীনাথ
নারায়ণ
লক্ষীনারায়ণ মজুমদার বিধবা
পত্নী শ্রীক্ষীরোদমণি দেবী বর্ত্তমান
রামরাম
রামরতন
রামধনলাল
রামদাস
শ্রীরাম
বলরাম
রামময় রামরূপ বা ছিরু
প্রসাদ
চৌধুরী
পেস্কার
রামসহায়
রামানুকূল
নীলকণ্ঠ
কন্যা
চন্দ্র
মাখনলাল
নিঃসন্তান বিধবা পত্নী বর্ত্তমান

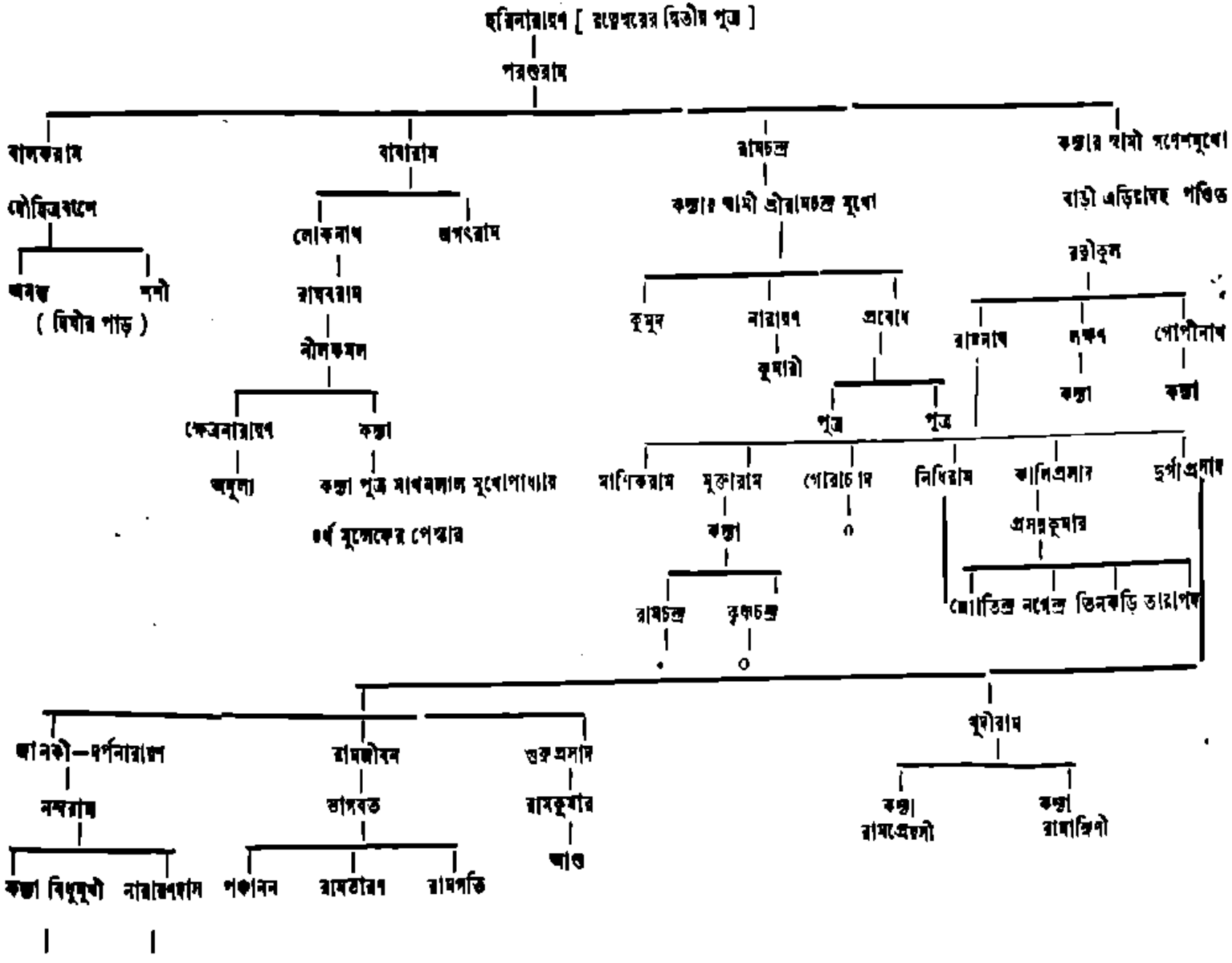
হরিনারায়ণ [রত্নেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র]
পরশুরাম
বালকরাম
মৌদ্গল্যগণে
অনন্ত
(দিঘীর পাড়)
শশী
বাবারাম
লোকনাথ
জগৎরাম
রাঘবরাম
নীলকমল
ক্ষেত্রনারায়ণ
কন্যা
অমূল্য
কন্যা পুত্র মাধবলাল মুখোপাধ্যায়
৪র্থ মুন্সেফের পেস্কার
রামচন্দ্র
কন্যার স্বামী শ্রীরামচন্দ্র মুখো
কুমুদ
নারায়ণ
কুমারী
প্রবোধ
পুত্র
পুত্র
মাণিকরাম
মুক্তারাম
কন্যা
রামচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র
গোরাচাঁদ
০
নিধিরাম
কন্যার স্বামী গণেশমুখো
বাড়ী এড়িয়াদহ পণ্ডিত
রত্নকুল
রাজনাথ
নফর
কন্যা
গোপীনাথ
কন্যা
কালিপ্রসাদ
প্রসন্নকুমার
জ্যোতিন্দ্র নগেন্দ্র তিনকড়ি তারাপদ
দুর্গাপ্রসাদ
জানকী—দর্পনারায়ণ
নন্দরাম
কন্যা বিধুমুখী
নারায়ণদাস
রামজীবন
ভাগবত
পঞ্চানন
রামতারণ
রামপতি
গুরুপ্রসাদ
রামকুমার
আও
খুদীরাম
কন্যা
রামপ্রেয়সী
কন্যা
রাধারিণী

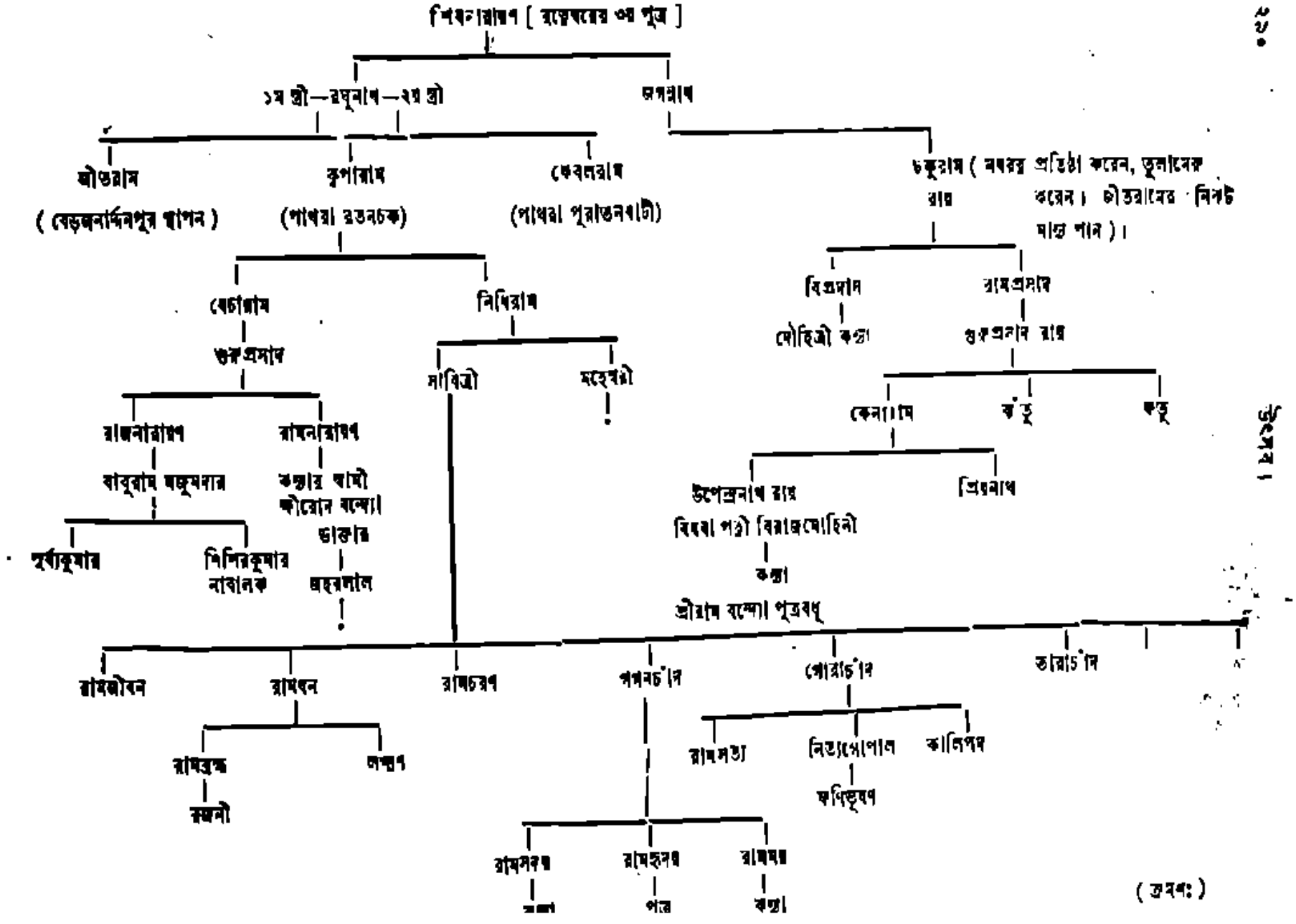
শিবনারায়ণ [রত্নেশ্বরের ৩য় পুত্র]
১ম স্ত্রী—রঘুনাথ—২য় স্ত্রী
জগন্নাথ
জীউরাম
(বেড়জনার্দ্দনপুর স্থাপন)
কৃপারাম
(পাথরা রতনচক)
কেবলরাম
(পাথরা পুরাতনবাটী)
ঠকুরাম (মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তুলাদেন করেন। জীউরামের নিকট মান্য পান)।
রায়
বিপ্রদাস
মৌহিত্রী কন্যা
রামপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ রায়
কেনারাম
বঁটু
কটু
উপেন্দ্রনাথ রায়
বিধবা পত্নী বিরাজমোহিনী
কন্যা
প্রীরাম বন্দ্যো পুত্রবধূ
প্রিয়নাথ
বেচারাম
গুরুপ্রসাদ
রাজনারায়ণ
বাবুরাম মজুমদার
সূর্য্যকুমার
শিশিরকুমার নাবালক
রামনারায়ণ
কন্যার স্বামী ক্ষীরোদ বন্দ্যো।
ডাক্তার
জহরলাল
নিধিরাম
সাবিত্রী
মহেশ্বরী
রামজীবন
রামধন
রামব্রহ্ম
রজনী
লক্ষ্মণ
রামচরণ
গগনচাঁদ
রামসত্য
নিত্যগোপাল
ফণিভূষণ
কালিপদ
গোরাচাঁদ
তারাচাঁদ
রামসদয়
রামদুলাল
রামময়
পুত্র
কন্যা

(ক্রমশঃ)

১৩২০ বর্ষ-সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক ও লেখিকা
	অ	
অন্বেষণ	৮৩	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
অবস্থা-মম মাতা ভবতারা	১৬৩	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
অতৃপ্ত সংসার	১৭৯	(কলিকাতা)
অবস্থাত্রয় বা চতুষ্টয়	১৮৭	সম্পাদক
অনুরোধ	২৩২	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
	আ	
আর একবৎসর	২৯	সম্পাদক
আমি কি ভণ্ড	৩৪	ঐ
আমি তোমার	৪৪	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমি তোমার	২৬৩	সম্পাদক
আশীর্ব্বাদ	১১০	ঐ
আমার গতি	১৬৭	(গৌহাটী আসাম)
আবাহন-ধ্যান-মন্ত্রজপ	১৪২	সম্পাদক
আশ্বাস	চৈত্র	ঐ
	ঈ	
ঈশ্বরানুসন্ধান	৮২	সম্পাদক
	উ	
উৎপাত নিবারণ	৬৯	সম্পাদক
উচ্ছ্বাস	৮২	শ্রীমতীসরোজিনী দেবী
	ঋ	
ঋষিগণের পদানুসরণ	১, ৩৬, ৯০, ১২৯, ১৯০	সম্পাদক
ঋগ্বেদ সংহিতা	৫৩, ৬১, ৬৯	শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যাদিতীর্থ সঃ সম্পাদক
	ক	
কবিত্ব	৬২, ১১৬	সম্পাদক

কাবেরীদর্শনে	১৭২	শ্রীমতীভবতারিণী দেবী
করিয়া চল	১৭১	সম্পাদক
কুন্তী	২৫০	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত
কারে ডাকি	২৫৯	সম্পাদক
কি চাই	২৬৮	ঐ

গ

গীতা	৬৫৩, ৬৫৭, ৬৬১, ৬৬৫, ৬৭৩	সম্পাদক

চ

চিত্তসমাধান		সম্পাদক

জ

জিজ্ঞাসা	৯	শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়
জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মা	৯	সম্পাদক

ড

ডাকা	১০৯	সম্পাদক

ত

তোমার কথা	৬৪	সম্পাদক
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি	৮৪	ঐ
তোমার ভাবনা	৮৭	শ্রীমতীরাজবালা দাসী
তোমার রূপ-ভূমিকা	২৭২	সম্পাদক
তিথি ফলাফল বর্ণন	২৮০	শ্রীগৌড়েন্দ্র ব্রহ্মর্ষিজী
তুমি আমার কে	২৫৫	সম্পাদক
তবে দেখা পাবি তাঁর	২২২	(কলিকাতা)

দ

দোলযাত্রা	৩১৮	শ্রী.....(কুমারখালি)

প

পরিবর্ত্তন		সম্পাদক
পূর্ব্বস্মৃতি	১৭	শ্রীমতীভবতারিণী দেবী
প্রয়োজন সিদ্ধির পথে	১৯	সম্পাদক
প্রার্থনা	৩৩	শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়
পিয়াসী ফটিক জল	৬১	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
পাণপ্রয়াণোৎসব	১২৩	শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যাদিতীর্থ

ভ

ভাগবত	১৭, ২৪, ২৯	সম্পাদক

ম

মজুমদার বংশের তালিকা	৪৮, ৭৭, ১৪৯	শ্রীচারাণচন্দ্র মজুমদার
মৃত্যুর পরে	৭৩	সম্পাদক
মা	৮১	শ্রীমতীভবতারিণী দেবী
মা ও মধুর ভাব	২০১	সম্পাদক
মন ও মন্ত্রের বিবাদ	২২৫	ঐ
মনোযোগ	২৩৮, ২৪৬	ঐ
মেনকার প্রতি উমা	১৩৯	৺গোবিন্দ চৌধুরীর গান

ল

লক্ষ্মীরাণী	১৫২	সম্পাদক

ব

ব্যক্তবাসনা	১১	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন	১২, ৫৫, ১০১, ১৪৮, ১৭৬, ২৪৭	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত
বন্ধন ও মুক্তি	৬৬	সম্পাদক
বন্দনা	চৈত্র	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
বংশীরব	১২২	সম্পাদক
বিজয়া	১৫৯	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিবিধ	১৮২	সংগ্রহ
বেদবাক্য	১৮৩	সম্পাদক
ব্রহ্মগীতি	১৯৯	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম	১৬১, ২৮৬	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৺বৈদ্যনাথ	২৮৭	ঐ

শ

শান্তি	৪১	সম্পাদক
শরণাগত	৮০	ঐ
শান্তিনিকেতন	২৭১	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্লোক ও শব্দ নির্ঘণ্ট	৯৩, ১০১, ১০৯, ১১৩, ১২১, ১২৫	সম্পাদক

শ্রীগুরুর শরণাপত্তি	১০৫	ঐ
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী	১৩৫	শ্রীমতীরাজবালা দাসী
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী	১৩৬	সম্পাদক
৺শারদীয়া পূজায় মায়ের উক্তি	১৪৫	ঐ
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী	২০৪	ঐ

স

স্মৃতি সঙ্কলন	১৮	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সমালোচনা	২৭, ১৫৭	সম্পাদক
৺ প্রবোধচন্দ্রের স্মৃতি	৫১	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সংসার সঙ্গে	১৩৫	সম্পাদক
সাধনার ধন	১১৪	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
সুপ্তিভঙ্গে আত্মনিবেদন	১৬২	ঐ
সেবাধর্ম্ম	২০০	সম্পাদক
সতী-স্ত্রী	২০৩	ঐ
সময়ে কাজ	২৪০	ঐ
সমুদ্র মন্থন	২৫০	শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সখা	২৭৬	শ্রীগুরু [৺কাশীধাম]
সাধ	২৭৬	শ্রীমতীমৃণালিনী দেবী
সামবেদীয় সন্ধ্যা অনুশীলন	২৭৭	শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়
যো মাংপশ্যতি সর্ব্বত্র	২১৫	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগবাশিষ্ঠ	১১৩, ১১৭, ১২১, ১২৯, ১৩৭, ১৪৫	সম্পাদক